# সখা

প্রথম ভাগ।

১৮৮৩।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

শ্রীপ্রমদাচরণ সেন-কর্ত্তৃক
সম্পাদিত।

"THE CHILD IS FATHER OF THE MAN"

৫০, সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট, "সখা" কার্য্যালয় হইতে
প্রকাশিত।

কলিকাতা,
৮১ নং বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে,
শ্রীমণিমোহন রক্ষিত দ্বারা মুদ্রিত।
১৮৮৪।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাগার
কলিকাতা

# সূচি-পত্র ।


| বিষয় | লেখক বা লেখিকার নাম | |
|---|---|---|
| ঃছেড়ে দাওনা (সচিত্র পদ্য।) | সম্পাদক ... | ... |
| খ্যানমালা। ... | কুমারী হেমলতা দেবী ... | .. |
| মার কপাল মন্দ। ... | বিপিন বিহারী সেন ... | ... |
| মার সাধের বিড়াল (সচিত্র পদ্য।) | সম্পাদক ... | ... |
| লোকমঞ্চ (সচিত্র।) ... | সম্পাদক ... | ... |
| যা (পদ্য।) ... | সম্পাদক ... | ... |
| কটী অন্ধসীলের কথা। ... | উপেন্দ্রকিশোর রায় ... | ... |
| কটী আশার কথা। ... | সম্পাদক ... | ... |
| কটী আশার কথা, আর। ... | সম্পাদক ... | ... |
| রে আমার পায়রামণি (সচিত্র পদ্য।) | শ্রীনিঃ, শিলং ... | ... |
| লিকাতার অন্তর্জাতিক প্রদর্শনী। | সম্পাদক ... | ... |
| স্ত্রীয় উষা (সচিত্র।) .. | সম্পাদক ... | ... |
| বড়লোক? ... | কুমারী হেমলতা দেবী | ... |
| দ্র জিনিশ। ... | সম্পাদক ... | ... |
| লা। ... | সম্পাদক ... | ... |
| লোভাটীর ফল। ... | সম্পাদক ... | .. |
| কীন্ডের জীবন চরিত (সচিত্র।) | সম্পাদক ... | ... |
| কীন্ডের বাল্যকালের ছুটী গল্প। | সম্পাদক ... | ... |
| ফয় সাহেবের অদ্ভুদ্ সমুদ্র যাত্রা। | উপেন্দ্রকিশোর রায় ... | ... |
| রদাদার গল্প (সচিত্র।) ... | মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় ... | ৯১,১০৮,১২২,১৩৪, |
| ভিড্ লিভিংষ্টোন সাহেব (সচিত্র।) | সম্পাদক ... | ... |
| পূজা (পদ্য।) ... | সম্পাদক ... | ... |
| বাবা! কেমন বাছুর! (সচিত্র।) | সম্পাদক ... | ... |
| । ... | | ১৫,৩১,৪৭,৬৪,৭৯,৯৬,১১২, |
| পান। ... | উপেন্দ্রকিশোর রায় এবং সম্পাদক | ... |
| র্থ (সচিত্র।) ... | সম্পাদক ... | ... |
| নের স্বর্গদর্শন। ... | "সহচরী" হইতে গৃহীত ... | ... |
| আমি প্রতারণা করিব না। ... | মন্মনাথ মুখোপাধ্যায় ... | ... |
| ম এবং অনিয়ম; বাধ্যতা এবং অবাধ্যতা। | উপেন্দ্রকিশোর রায় ... | ... |
| বৎসরের সুখবর। ... | সম্পাদক ... | ... |
| প্রেরকের প্রতি। ... | ... ... | ৩০,৪৭,৬৩,৭৮,৯৪,১১২, |
| চোর কি? ... | মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ... | .. |
| তর এই (পদ্য।) ... | মনোরঞ্জন গুহ ... | ... |
| না। ... | সম্পাদক ... ... | .. |

| বিষয় | লেখক বা লেখিকার নাম | পত্রা[illegible] |
|---|---|---|
| প্রেরিত পত্র। | ... ... ... | ৩০,১১৯,১২১,[illegible] |
| ফুঁদিয়ে প্রদীপ নিভাইওনা। | মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় | ... |
| বানর (সচিত্র।) | উপেন্দ্রকিশোর রায় | ... |
| বাবুগিরি। | সম্পাদক | ... |
| বালিকাদিগের বিশেষ পৃষ্ঠা— | | |
| (১) চন্দ্রপুলি প্রস্তুত করিবার নিয়ম। | জনৈক মহিলার সাহয্যে সম্পাদক | ... |
| (২) পোষাক। | সম্পাদক | ... |
| (৩) লজ্জা ও নম্রতা। | মন্মথনাথ মুখোপধ্যায় | ... |
| বিবিধ প্রসঙ্গ। | সম্পাদক | ... |
| বিলাতের পত্র। | কুমারী টিশিমেকার, লণ্ডন | ... |
| বীরেন্দ্রসিংহের রত্নলাভ। | শ্রীমতী * * দেবী | ... |
| বৃষ্টি। | সম্পাদক | ... |
| ভাই বোনের দোলনা (পদ্য।) | কুমারী হিরণ্ময়ী দেবী | ... |
| ভীমের কপাল। | সম্পাদক | ২,২১,৩৯,৬০,৬৬,৮১,৯৭,১১৩,১২৯,[illegible] |
| [illegible]ণিরামের কাহিনী (সচিত্র।) | সম্পাদক | ... |
| ময়ূর (সচিত্র।) | সম্পাদক | ... |
| মাকড়শা (সচিত্র।) | উপেন্দ্রকিশোর রায় | [illegible] |
| মাছি (সচিত্র।) | উপেন্দ্রকিশোর রায় | ... |
| মেয়েরা আমাদের কে? | সম্পাদক | ... |
| রামায়ণের উপদেশ। | সম্পাদক | ৩৩,৩৬,৫[illegible] |
| রেলের গাড়ী (সচিত্র।) | সম্পাদক | ... |
| শরদের নিশি (পদ্য।) | রজনীকান্ত চৌধুরী | ... |
| শিশু-স্বাস্থ্যরক্ষা। | প্যারীশঙ্কর দাস গুপ্ত এল্‌ এম্‌ এস্‌ | ৮৫,১০০,১১৬,১৪[illegible] |
| সতীশ এবং তাহার সঙ্গী (সচিত্র।) | সম্পাদক | ... |
| সম্পাদকের নিবেদন। | সম্পাদক | ... |
| সমালোচনা ও প্রাপ্তিস্বীকার। | সম্পাদক | ৩১,৪৭,১৫৯,[illegible] |
| সর্প (সচিত্র।) | সম্পাদক | ... |
| সর্পের ঔষধ (সচিত্র।) | সম্পাদক | ... |
| সর্ব্বোত্তম ছাত্রী। | কুমারী হেমলতা দেবী | ... |
| সাধুতার দ্বারা অসাধুকে জয় করিবে। | কালীকৃষ্ণ দত্ত | ... |
| সিংহ ও মাতাল (সচিত্র।) | সম্পাদক | ... |
| [illegible] বাবুর কারাবাস। | বিপিনচন্দ্র পাল | ... |
| [illegible]রান। | সম্পাদক | ... |
| [illegible]াহেব (সচিত্র।) | সম্পাদক | ... |
| [illegible]হেবের গল্প। | সম্পাদক | ... |





[১]ম ভাগ। ১লা জানুয়ারি, ১৮৮৩ সোমবার। ১ম সংখ্যা।

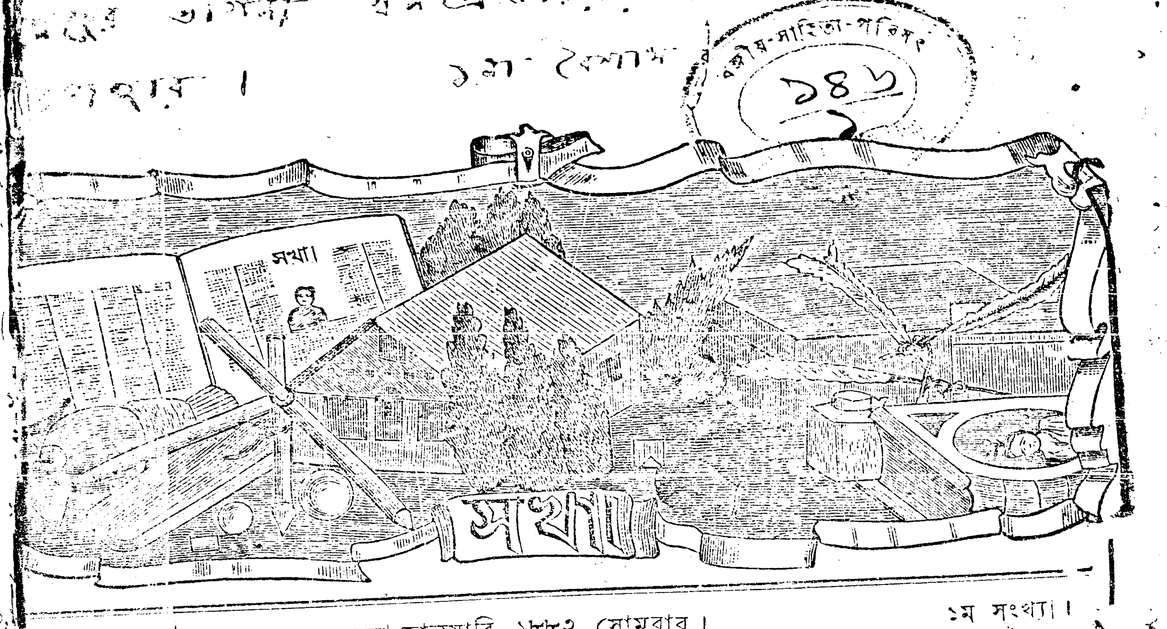

## প্রস্তাবনা।



আমাদিগের দেশে একটী বড় সুন্দর নিয়ম অতি পূর্ব্বকাল হইতে অদ্য পর্য্যন্ত প্রচলিত রহিয়াছে;— আমাদের দেশে কোনও কার্য্য আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে দেবতার নাম করা হইয়া [illegible] বাস্তবিক কোন কার্য্য করিবার পূর্ব্বে [illegible] নাম লইলে যেন মনে বল বাড়ে, [illegible] যেন সে কার্য্য সফল হইবে, এবং আর [illegible] ভয় থাকে না। আমরা এই জন্যই আজ [illegible] পরমপিতা পরমেশ্বরের নাম স্মরণ [illegible]ছি, তিনি দয়া করিয়া আমাদিগের এই [illegible] সহায় হউন।

[illegible]দিন পরে "সখা" প্রকাশিত হইতে চলিল। [illegible] পত্রিকা আমাদিগের দেশে নাই বলিয়াই [illegible] এই পত্রিকাখানি প্রকাশ করিবার ইচ্ছা [illegible]ছিলাম। আমাদিগের হতভাগ্য দেশে বালকবালিকাদিগের জ্ঞানের ও চরিত্রের উন্নতি[illegible] জন্য অধিক লোক চিন্তা করেন না; অথ[illegible] [illegible]বার অবকাশ হয় না, এই জন্যই "সখা" [illegible] হইল। "সখা" পিতামাতার উপদেশ এবং শিক্ষকের শিক্ষা দুইই প্রদান করিবে। যাহাতে বালকবালিকারা বাস্তবিক মানুষ হইতে পারেন, তজ্জন্য "সখা"র লেখক ও লেখিকাগণ প্রাণপণে চেষ্টা করিবেন—ফলতঃ যাহাতে পত্রিকাখানির 'সখা' এই নাম সার্থক হয়, সে দিকে সকলেরই দৃষ্টি থাকিবে।

কিন্তু এই সুবৃহৎ ব্যাপারে দেশের সমস্ত শিক্ষিত পুরুষ এবং শিক্ষিতা রমণীদিগের সাহায্য আবশ্যক হইবে। শিক্ষিত পিতামাতাদিগের নিকট আমাদের সানুনয় নিবেদন এই যে তাঁহারা যেন আপন আপন বালকবালিকাকে শিক্ষা দিবার সময় অনুগ্রহপূর্ব্বক, আমাদিগকে তাঁহাদের সাহায্যকারী বলিয়া মনে করেন। এই পত্রিকায় [illegible] গল্প প্রভৃতির দ্বারা বালকবালিকাদিগের চরিত্রের বিকাশ এবং জ্ঞানের বিস্তার করাই আমাদিগের লক্ষ্য, সুতরাং যদি তাঁহারা দেখেন এই লক্ষ্যের

বহির্ভূত কোনও বিষয় পত্রিকায় লিখিত হইতেছে, তখন যেন দয়া করিয়া আমাদিগকে তাহা জানান, এবং যে প্রণালীতে লেখা হইতেছে, তৎসম্বন্ধে যাহাতে উন্নতি হইতে পারে, অনুগ্রহপূর্ব্বক সে বিষয়েও পরামর্শ দেন। বালকবালিকাদিগের সকলের মনের গতি সমান নহে, সুতরাং একই উপদেশ যে সকলের পক্ষে সমান কার্য্যকর হইবে, এরূপ আশা করা যায় না। অভিভাবকগণ যদি অনুগ্রহপূর্ব্বক পত্রদ্বারা আমাদিগকে আপন আপন সন্তানদিগের চরিত্র বিষয়ে জানান, তাহা হইলে আমরা বিশেষ বিশেষ চরিত্রের উপযোগী গল্পময় প্রস্তাব সকলেরও অবতারণা করিতে পারি।

বালকবালিকাদিগের নিকটেও আমাদের একটী নিবেদন আছে; তাঁহারা যদি তাঁহাদের যখন যে কোন বিষয়ে জানিবার ইচ্ছা হয়, আমাদিগকে চিঠি করিয়া পাঠান, তাহা হইলে আমরা ... বিষয়ে যতদূর সম্ভব সদুত্তর দিতে চেষ্টা করিব। ইহাতে বালকবালিকাদিগের উপকার হইবার সম্ভাবনা। তাঁহাদের নিকট আরও একটী কথা এই যে, তাঁহাদের রচনাশক্তি এবং চিন্তাশক্তি বাড়াইবার জন্য আগামী মাস হইতে এই পত্রিকার মধ্যে খানিকটা স্থান নির্দ্দিষ্ট থাকিবে; তাঁহারা ইচ্ছা করিলে যে কোন বিষয়ে আলোচনা করিতে পারিবেন। একটী দৃষ্টান্ত দিলে বিষয়টী পরিষ্কার হইয়া যাইবে; মনে করুন, চাষার ছেলেদিগের লেখাপড়া শিক্ষা করা উচিত কি না, এই বিষয়ে আলোচনা হইল। একজন লিখিলেন 'শিক্ষা হওয়া উচিত' এবং কেন উচিত তাহা লিখিলেন; পরের মাসে অপর কেহ তাহা উচিত নয় বলিয়া কারণ দেখাইলেন;—এইরূপে আলোচনা চলিতে থাকিল; শেষে যথেষ্ট আলোচনা হইলে যে মত ঠিক তাহা প্রকাশিত হইল।

আমাদিগের আর অধিক বলিবার নাই। ভবিষ্যতের ফলাফল ঈশ্বরের হস্তে রাখিয়া আমরা যথাসাধ্য কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইলাম; এখ-
কার জীবন এবং উন্নতি পাঠকপাঠিক...
স্নেহ-দৃষ্টির উপর নির্ভর করে।

---

## ভীমের কপাল।

### ১ম অধ্যায়।

একদিন শরৎকালের সন্ধ্যা...
দৌলতপুরের বাজারে দুটী ...
বসিয়া কি আলাপ করিতেছি...
আকাশে একটুকুও মেঘ দেখা ...
তেছে না;—পরিষ্কার চাঁদ আকাশে উঠিয়া ...
করিয়া নিকটবর্ত্তী নদীর জলে ছুটিয়া ছুটিয়া ...
করিতেছে, মাঝিরা কেমন করিয়া স্রোতে ...
ছাড়িয়া দিয়া কেহ বা রান্না করিতেছে, কেহ ...
গলা কাঁপাইয়া গান করিতেছে, দুটী বালক দো...
নের বারাণ্ডায় বসিয়া তাহাই দেখিতেছিল, ...
আলাপ করিতেছিল। এই দুটী বালকের ...
এক জনের বয়স ১৭, নাম বিপিন; আর এক...
বয়স ১৫, নাম ভীমেন্দ্র। বিপিন ও ভীমেতে ...
কাল হইতেই বেশ ভাব—সর্ব্বদা একসঙ্গে বেড়...
কিন্তু দুই জনের চরিত্রে অত্যন্ত ভেদ। বি...
স্থির, শান্ত, বিনয়ী; ভীম নামে যেমন ...
তেমনি,—একগুঁয়ে, গোঁয়ার, উদ্ধত। এইরূ...
প্রকৃতির লোক হইলেও ইহাদের মধ্যে বেশ ...
ছিল, ইহা খুব আশ্চর্যের বিষয়। ইহাদের ম...
আরও একটু ভিন্নতা ছিল—বিপিনের বাড়ী বা...
গঞ্জ, ভীমের বাড়ী কলিকাতা। কলিকা...
ছেলেরা যে প্রকার পূর্ব্বদেশের ছেলেদের ...
করিয়া থাকেন, তাহাতে ভীম ও বিপিনের ...
বাসার কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য বোধ হয়। ...
কখনও বিপিনকে 'বাঙ্গাল' বলিয়া ঘৃণা ক...
নাই—ঘৃণা করা দূরে থাকুক, 'বাঙ্গাল' ব...



...নে কিছু মাত্র বিরক্তির ভাবও উদয় হয়
...কলিকাতার ছেলেরা যেমন পূর্ব্বদেশের
...দের দেখিলে তাহাদের তিন পুরুষের দোষের
...লিয়া নিজেদের যে সব ভাল, তাহাই ঠিক
...রসেন—ভীম গোঁয়ার হইলে কি হয়, তাহার
...বু ছিল না।

...ন্ধ্যাবেলা অত্যন্ত গরম হওয়াতে ভীমেন্দ্র ও
... দুজনে বেড়াইতে বেড়াইতে নদীর ধারে
...য়া বসিয়াছিল এবং নানা বিষয়ে আলাপ
...ছিল। আজ হঠাৎ "পশ্চিমের ছেলেরা ভাল
...দের ছেলেরা ভাল," এই বিষয়ে কথা উঠিল।
...উঠিবার সূচনা এই;—বিপিন ও ভীমেন্দ্র
...ায় পড়িত—দুজনেই হেয়ার সাহেবের
...ড়িত, বিপিন এণ্ট্রান্স ক্ল্যাশে ও ভীমেন্দ্র
... শ্রেণীতে। উভয়েরই মামার বাড়ী
...রের নিকট। পূজার ছুটিতে দুজনে মামার
...বে, ঠিক করিয়া তাহারা হেদো দীঘির
... কি জিনিশ ক্রয় করিতে আসিল; এমন
...তে পাইল, একটা বড় ঘরে অনেক
... জমিয়াছে। তাহারাও ব্যাপারটা কি
...তে গেল। গিয়া দেখিল জনৈক সুবিখ্যাত
বক্তৃতা করিতেছেন। তাহারা শুনিতে পাইল
বলিতেছেন যে পূর্ব্বদেশের ছেলেদের স্বাভা-
...দ্ধি কম, আর পশ্চিম দেশের ছেলেরা ভূমিষ্ঠ
...মান হয়। ভীমেন্দ্র একেত কলি-
...সিত, কলিকাতা ছাড়িয়া
...ত না, তাহাতে এই বক্তৃতা
... আর "...লদের দেশে" যাইতে চাহিল
কিন্তু বিপিনের সম্বন্ধে তাহার ভালবাসা ইহাতে
...না। অবশেষে তাহার মাতার কথায় সে
...র বাড়ীতে গেল বটে, কিন্তু 'বাঙ্গালদের'
... যেটুকু ভালবাসা ছিল,—বাবুর বক্তৃতা
...য় তাহার অর্দ্ধেকও রহিল না। আজ নদীর
বসিয়া বিপিন বলিতেছিল—"দেখ, এই সময়ে

সকলে একেবারে চুপ করিয়া ...
বেলা পৃথিবী যেন বোবা হইয়া ...
সময় যদি কেহ চীৎকার করিয়া ...
আমাদের দুঃখের কথা আমাদে...
তবে কেমন হয়?" ভীমেন্দ্র ব...
মত বক্তা হ'লে তবে হয়; তিনি ...
কার বক্তৃতা করেন!"

বিপিন।—তিনি বক্তৃতা করে...
তিনি বাঙ্গালদের ঘৃণা করেন—এটা ...
বিষয়।

ভীমেন্দ্র।—উচিত কথা বল্লেইতে...
হল—না? বাঙ্গালদের মধ্যে রামে...
রামগোপাল ঘোষ, বিদ্যাসাগর ...
একটা লোক দেখাও ত। বিপিন এই ...
চুপ করিয়া রহিল "ঈশ্বরের রাজ্যে যেখা...
যায় না, সেখানেও ত সুন্দর ফুল ফোটে; ...
তলায় কত মণিমাণিক্য পড়ে থাকে, কে ...
খোঁজ রাখে? তা ভাই, পশ্চিমে লোকই ...
বাঙ্গালই বল, ঈশ্বর সকলকেই বড় লোক ...
পারেন।" এইরূপ কথাবার্ত্তার পর, ...
মেঘ উঠিতেছে, দেখিয়া তাহারা নদীতীর
উঠিয়া বাড়ীর দিকে চলিল। তৃতীয়ার চাঁদ
বীকে অন্ধকারে পূরিয়া ঐ বড় অশ্বত্থ গ...
আড়ালে লুকাইতেছিল, এমন সময় তাহারা ...
গেল।

বিপিন ও ভীমেন্দ্র উভয়ের মাতুল দুর্গা...
ঘোষ মহাশয় একজন সেকেলে হিন্দু। বাড়ী ...
দুর্গোৎসব ইত্যাদিতে বিলক্ষণ দশ টাকা ব...
হয়—কিন্তু সে ব্যয় অপব্যয় নহে। দরিদ্রদিগে...
দান করিতেই প্রায় তাহার অর্দ্ধেক যাইত, অপ...
রার্দ্ধের কিয়দংশ নিঃস্ব আত্মীয়গণের ছেলেমে...
দের কাপড়, খেলনা প্রভৃতিতে ব্যয় হইত এবং
কিয়দংশ আমোদ ও পূজার উপকরণাদিতে খরচ
হইত। দুর্গা পূজার আর তিন দিন মাত্র বিলম্ব

...ছে, সুতরাং সেই বৃহৎ বাটী আলোক দ্বারা সজ্জিত। কর্ত্তা বাহিরে বসিয়া দুই এক জন ...স্থ লোকের সহিত উৎসবের বন্দোবস্ত করি...ন—কাহাকে কোন্ কার্য্যের ভার ...—কে কোন্ কার্য্য সুবিধামত নির্ব্বাহ ...ত পারিবে—কোন্ সময় কোন্ জিনিশ সংগ্রহ করিতে হইবে, ইত্যাদি বিষয় ঠিক করিয়া তালিকা প্রস্তুত করিতেছেন। পাশে দুই এক জন খাসামুদে ব্রাহ্মণপণ্ডিত বসিয়া 'বাবু বড় ভক্ত," 'বাবু ...ড় হিসেবী লোক,' 'আশীর্ব্বাদ করি' এই রকমের নানা কথা বলিয়া কর্ত্তাকে খোসামোদ করিতেছে। দুর্গাদাস বাবু সে দিকে মন না দিয়া নিজের কাজ করিয়া যাইতেছেন। এমন সময় বিপিন ও ভীমেন্দ্র বাড়ীতে আসিল। ভাগিনেয়দ্বয়কে দেখিয়া দুর্গাদাস বাবু বলিলেন "তোমরা কোথায় ...লে? পূজার সময় তোমাদের দুজনের উপর একটা কাজের ভার রইল—তোমরা গরিবদের খাওয়া তদারক করিবে।" উভয়ে আহ্লাদে স্বীকৃত হইয়া বাড়ীর মধ্যে গেল। মাতুলানী আহার প্রস্তুত করিয়া বসিয়াছিলেন, আসিবা মাত্র উভয়কে ডাকিয়া বসাইলেন, এবং 'এটা খাও,' 'ওটা খাও,' 'আর একটু দি,' 'আর একটু খাও,' ইত্যাদি কথা বলিয়া পরিতোষ-মত আহার করাইলেন। কিন্তু যখন খাওয়া শেষ হয় হয়, তখন ভীমেন্দ্রের এক বিপদ উপস্থিত হইল—ভীমেন্দ্র দেখিল থালার এক পাশে লম্বা এক গাছা চুল রহিয়াছে। দেখিয়াই ভীমেন্দ্র রাগ করিয়া উঠিয়া গেল। 'ওয়াক' 'ওয়াক' করিয়া সমস্ত খাবার বমি করিয়া ফেলিয়া দিয়া ভীমেন্দ্র রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে প্রথমে মামীকে, শেষে 'পোড়া বাঙ্গালদের দেশ'কে গালাগালি দিতে লাগিল। পাঠকপাঠিকাদিগকে বলা আবশ্যক যে ভীমেন্দ্র দুটী জিনিশকে বড় ঘৃণা করিত—পাতে লবণ, এবং ভাতের ভিতরে চুল। ভীমেন্দ্র চটিয়া বলিল "আমি এখনই এদেশ ছেড়ে চলে যাব, পঞ্চাশ দিন বলিছি, আমি ভাতে চুল থাকলে খেতে পারি না, তবুও চুল?" মামী বিস্তর বুঝাইলেন,—কর্ত্তা গোলমাল শুনিয়া বাড়ীর ভিতর আসিলেন—কারণ জানিয়া ভীমেন্দ্রকে বলিলেন বাবা! "না দেখে পড়েছে, অত রাগ করনা, ... বাবা আমার!" ভীমেন্দ্র রাগে হাত ছাড়াইয়া চলিয়া গেল। রাত্রি তখন প্রায় ১০টা। অ... এতক্ষণ মেঘে ঢাকা ছিল—অল্প অল্প বৃষ্টি আসিল ... সে খারাপ সময় পশু পাখী পর্য্যন্ত খোলা ... গায় বাহির হয় না; কিন্তু পোনের ... বালক ভীমেন্দ্র রাগের ভরে ঐ বৃষ্টি মাথায় ... মামার বাড়ী ছাড়িল। ক্রমশঃ—

---

## আঃ ছেড়ে দাও না!

আঃ ছেড়ে দেওনা ...  
...  
এখন কি আর খেলা কর'বা ... আছে, ভাই?  
দেখ্‌ছ না কি হাঁড়ি হাতে, চাল ধোওয়া রয়েছে  
তাতে,  
মা বলেছেন নিয়ে যেতে, 'চাকর বাকর' নাই।  
কাজটা সেরে ফিরে এলে, তখন তোমায় আমায়  
মিলে  
মনের সুখে ক'রব খেলা যত ভেবে পাই।  
কাজ ছেড়ে না ক'রব খেলা, ছেড়ে দাওনা হলো  
বেলা!  
আগে কাজ কি আগে খেলা, জান্‌তে আমি চাই!

---



## সতীশ এবং তাহার সঙ্গী।

সতীশ তাহার পিতার একমাত্র ছেলে, তাহাতে আবার সতীশের মা ছিলেন না এইজন্য সতীশের পিতা সতীশকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। সতীশ যখন যাহা চাহিত তাহাই পাইত। কিন্তু 'আদুরে' ছেলেরা সচরাচর যেমন খারাপ হইয়া যায়, সতীশ সেরূপ হয় নাই। সতীশ যখন যাহা চাহিত, তাহাই পাইত বটে, কিন্তু পিতাকে না জিজ্ঞাসা করিয়া সে কোন দ্রব্য লইত না। কোন দ্রব্য পাইতে ইচ্ছা হইলে সতীশ ছুটিয়া পিতার নিকট আসিত এবং কহিত 'বাবা আমাকে ঐ দ্রব্যটী ক্রয় করিয়া দিবে কি?' যদি পিতা বলিতেন 'হাঁ' তাহা হইলে সতীশের আহ্লাদের সীমা থাকিত না, কিন্তু যদি তিনি বুঝাইয়া দিতেন যে উহা ক্রয় করা উচিত নয়, তাহা হইলে বালক সতীশ মনে মনে ভাবিত 'আমার পিতা যখন ঐ দ্রব্যটী আমাকে দিতে চাহিতেছেন না, তখন আমি উটী লইব না, কেন না তাহা হইলে তিনি দুঃখিত হইবেন।' সতীশের এই সুবুদ্ধিতেই সতীশ খারাপ হইয়া যায় নাই। সতীশের পিতা সমস্ত দিন তাঁহার কর্ম্মের স্থানে থাকিতেন, সুতরাং সে সময় সতীশকে বাড়ীতে একাকী থাকিতে হইত। এই সমস্ত সময় সতীশ কি করিত তাহা বলিতেছি।

সতীশের একটী সুন্দর কুকুর ছিল। সতীশ যেখানে যাইত কুকুরটী সঙ্গে সঙ্গে থাকিত। পাড়ার দুষ্ট ছেলেদের সহিত বেড়াইতে বা খেলা করিতে সতীশের পিতা সতীশকে নিষেধ করিয়াছিলেন, সুতরাং এই কুকুরটীই সতীশের বন্ধু ও খেলার সঙ্গী ছিল। সতীশ যখন পোষাক পরিয়া চাকা লইয়া খেলা করিতে করিতে ছুটিয়া বেড়াইত, কুকুরটীও তাহার সঙ্গে সঙ্গে ছুটিত এবং পরিশ্রান্ত হইলে সতীশ যখন বাড়ীর সম্মুখে মাঠের মধ্যে গাছের তলায় বিশ্রাম করিতে বসিত, তাহার সঙ্গীও নিকটে আসিয়া বসিত। বস্তুতঃ 'ভুলো' সতীশকে যেমন ভালবাসিত, দুটী ছোট ছেলে পরস্পরকে ওরূপ ভালবাসে কিনা সন্দেহ। কখন কখন সতীশ নিদ্রিত হইয়া পড়িত;—তখন ভুলোই তাহার বালিশ। ঐ দেখ কুকুরের পিঠের উপর মাথা রাখিয়া কেমন ঘুমাইয়া আছে!

এক দিন সতীশ এইরূপে নিদ্রা যাইতেছিল, এমন সময় হঠাৎ একটা শব্দ শুনিয়া তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সতীশ শুনিতে পাইল সম্মুখের বনের অন্য দিক হইতে এক এক বার 'মিউ'. 'মিউ' শব্দ হইতেছে, আবার তাহার পরেই ভয়ানক হাসির শব্দ আসিতেছে। ব্যাপারটা কি জানিবার জন্য বালকের অত্যন্ত কৌতূহল জন্মিল। প্রভুর উৎসাহ দেখিয়া ভুলো 'খেউ' 'খেউ' শব্দ করিতে করিতে অগ্রে ছুটিল। বনের অপর পার্শ্বে একটী প্রকাণ্ড দীঘি। সতীশ এবং তাহার সঙ্গী দুজনে সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইল পাড়ার দু তিন জন দুষ্ট বালক একটী রোগা বিড়াল শাবককে জলে ফেলিয়া দিয়া প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে ডুবাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে। বিড়ালটী যত প্রাণের ভয়ে 'মিউ' 'মিউ' করিতেছে, ছেলেগুলি ততই উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া প্রস্তর চালাইতেছে। সতীশের মনটী বড় ভাল—দেখিয়াই তাহার ক্লেশ হইল; এমন দেখিলে কাহার না ক্লেশ হয়? দেখিবা মাত্র সতীশ ভুলোকে জলে যাইতে ইঙ্গিত করিল। ভুলো চক্ষের নিমেষে জলে পড়িয়া বিড়ালশাবককে তীরে আনিল, এবং সতীশের পায়ের নিকটে তাহাকে রাখিয়া মুখপানে

আহ্লাদে লেজ নাড়িতে লাগিল। সুবুদ্ধি ীঘ্র বিড়ালটীকে তুলিয়া লইয়া গা মুছাইতে এবং তাহাকে বাড়ীর দিকে লইয়া যাইতে । যে দুু তিনটী বালকের কথা ইতিপূর্ব্বে ছি, তাহারা এতক্ষণ কোন কথা বলে নাই,— দেখিল সতীশ বিড়াল লইয়া বাড়ী যায়, তখন ন সম্মুখে আসিয়া বলিল 'ওগো বাবু, বড় যে দের বাচ্ছা লইয়া ঘরে যাইতেছ! সাহস কি?" লক এই কথা বলিতেছিল, তাহার হাতে গাছা লাঠি এবং তাহার গায়ে সতীশের অপেক্ষা বল অনেক অধিক। কিন্তু সতীশ তাহাতে ভয় পাইল না। সতীশ জানিত যাহারা অসৎ বালক তাহাদের গায়ে বল থাকিলেও সাহস থাকে না। এই জন্য সে সাহস করিয়া বলিল: "এটী তোমাদের বিড়াল নহে, তোমরা যখন উহাকে মারিতে গিয়াছিলে, তখন আর তোমাদের উহায় সহিত কি সম্বন্ধ?" বালক লাঠি তুলিয়া রাগভরে বলিল "আমাদের বিড়াল আমরা মারি আর যাহাই করি, তাহাতে তোমার কি? এখন ও কথা থাক্, বিড়ালছানা রাখ; নতুবা এই লাঠির দ্বারা তোমার মাথা চিরিয়া দিব" সতীশ আরও সাহসের সহিত বলিল "আমার মাথা ছিড়িয়া ফেলিলেও পাইবে না। তোমাদের গায়ে বেশী বল আছে বলিয়া কি মনে ভাব যে যতক্ষণ আমি অজ্ঞান হইয়া না পড়িতেছি, ততক্ষণ এই নির্দ্দোষী বিড়ালছানাকে জলে ডুবাইয়া মারিতে দিব?"—দুষ্ট বালকের হাতের লাঠি সতীশের মাথায় পড়িল। এক ঘা খাইয়াও সতীশ দণ্ডায়মান। কিন্তু সতীশকে আর একঘা মারিতে হইল না। ভুলো এতক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল; কিন্তু যখন দেখিল তাহার প্রভুকে একটা বালক শাস্তি দিতেছে, তখন ভুলোর তাহা সহ্য হইল না। বাঘের মত লাফাইয়া উঠিয়া ভুলো সেই দুর্ব্বুদ্ধি বালকের ঘাড়ে কামড়াইয়া ধরিল এবং নখের আঘাতে তাহার হাত ও পা খানিকটা চিরিয়া দিল। অন্যান্য বালকগণ তাহাদের সঙ্গীর এই দুর্দ্দশা



দেখিয়া 'বাপরে! বাঘ! খেয়েছেরে!' এই কথা বলিতে বলিতে ছুটিয়া পলাইয়া গেল। সতীশ অতি কষ্টে ভুলোকে থামাইয়া গৃহে ফিরিল। সেই অবধি সেই দুরন্ত বালকেরা আর পশুর প্রতি অত্যাচার করিত না। বিড়ালশাবককে সঙ্গে লইয়া সতীশ ঘরে আসিল। আগুণে সেকিয়া খানিকটা গরম দুগ্ধ খাইতে দিয়া সতীশ বিড়ালছানাকে প্রাণে বাঁচাইল, এবং সেই দিন তাহার পিতা কর্ম্ম-স্থান হইতে আসিলে, তাঁহাকে এই সকল ঘটনার কথা বলিল। তাহার পিতা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন 'বেশ কার্য্য করিয়াছ;'— ইহাতেই সতীশ মাথার বেদনা ভুলিয়া গেল, এবং সমস্ত কষ্টের ফল লাভ করিল। সেই দিন অবধি সতীশের দুটী সঙ্গী হইল—'ভুলো' কুকুর এবং 'হারুমণি' বিড়াল।

---

## ঊষা।

উঠ, উঠ, ছোট বোন! পোহাইল রাতি;
কতকাল রবে আর পড়িয়া শয্যায়!
ওই দেখ ডালে ডালে ফুল কত জাতি
বাগান করেছে আলো বিমল শোভায়।

ওই শোন পাখীগণ ধরিয়াছে গান,
টুপ্ টাপ্ জলবিন্দু যেন তাল ধরে;
আলোকে শিশিরজল হীরক-সমান
শোভা পায়; ঝুপ্ ঝুপ্ পড়ে বায়ু ভরে।

গুণ্ গুণ্ রব তুলি শ্রমী মধুকর,
মধু আশে ঘূরিতেছে বাগান-মাঝার
চলি ফিরি পরিশ্রমে না হয় কাতর—
মধু ঘুটে, ছুটে ছুটে ফিরে অনিবার।

চেয়ে দেখ জলাশয়ে ছোট মাছ কত
লেজ নেড়ে উচ্চ নীচ্চ ছুটিয়া বেড়ায়;
জল নাড়ে খেলা করে, যার সাধ যত;
প্রভাতের কাজে সবে শরীর লাগায়।

ওই দেখ মাঠে বসি, ছাড়িয়া গোপাল
গাছতলে, কুতূহলে রাখাল বসিয়া
করে গান, সুখী-প্রাণ; সম্মুখে জাঙ্গাল
ভয় নাই কোন গরু যাবে হারাইয়া।

ছুটিয়া মায়ের কাছে, চলিছে বাছুর
মাথা নেড়ে মাঝে মাঝে পলাইয়া যায়;
মেয়ের শাবক মাকে দেখিয়া সুদূর
ভ্যা ভ্যা রবে ক্রন্দনে মার পানে ধায়।

ওঠ বোন কতকাল রবে ঘুমাইয়ে,
পৃথিবীর সব লোক জাগিয়া উঠেছে
এ সময়ে কোন্ লোক
ওঠ ওঠ! রাঙ্গা রবি ওই

এমন সাধের দিবা কাটিলে নিদ্রায়,
কিবা কাজ হবে বোন তাই ভাবি মনে;
ওঠ! ওঠ! ছিছি একি! দিন বহি যায়!
নিজ কাজে রত হও পরম যতনে।

গাভী মেষ আদি যত সবাই চেতনে,
পশু তারা তবু সবে নিজ কাজে রত!
তুমি তবে বল বোন! বলনা কেমনে
কাটাইছ কাল, আহা! নির্ব্বোধের মত?

যাঁহার করুণা বলে এদিন পাইলে,
সুখেতে কাটিছ দিবা যাঁহার কৃপায়,
রজনীতে যাঁর কৃপা গুণেতে বাঁচিলে
আঁখি মেলি, ভক্তি-ভাবে পড় তাঁর পায়।

---

বিলাতের পত্র

## ক্রীষ্টাল প্যালেস বা স্ফটিক প্রাসাদ-পরিদর্শন।

প্রাতকালের সুন্দর সূর্য্যকিরণে সিডেনহাম নামক পল্লীস্থ স্ফটিক-প্রাসাদ পরিদর্শন করা বড়ই আনন্দকর। কি পুরুষ, কি স্ত্রী, কি বালক, কি বালিকা এই স্ফটিক প্রাসাদে আসিলে সকলেরই আনন্দ হয়। ইংরাজী ১৮৫৪ সালে এই প্রাসাদটী প্রস্তুত করা হয়। প্রাসাদটী দেশবিদেশের নানারূপ দ্রব্য রক্ষার্থ ব্যবহৃত হয়; চারিদিকে নানারূপ দেখিবার জিনিশ আছে। মধ্যস্থলে আছে নানারূপ খেলনা ও অন্যান্য দ্রব্যের আমদানি ও ক্রয় বিক্রয় হইয়া থাকে।

প্রাসাদের মধ্যে তিন অঙ্গন অর্থাৎ উঠান; কোন কোন অঙ্গনে পূর্ব্বকালের বাড়ীর মতন দ্রব্যাদি সাজান। প্রাচীনকালে ভূমিকম্প হইয়া ইটালীদেশে পম্পিয়াই নগর মাটীর মধ্যে বসিয়া যায়; সম্প্রতি তাহার মধ্য হইতে একটী ভদ্র লোকের বাড়ী বাহির হইয়াছে, তাহার আকৃতি এবং দ্রব্যাদি যেরূপ, এই স্ফটিক-প্রাসাদের একটী অঙ্গন সেইরূপ সাজান। দেয়ালে নানারূপ সুন্দর বর্ণে ফুল, পক্ষী, ও কুঞ্জবন অঙ্কিত রহিয়াছে; কুঞ্জ-বনের মধ্য হইতে ছোট ছোট পরী উকি মারি-তেছে। মধ্যস্থলে একটী সুন্দর শীতল জলের ফোয়ারা,—তাহার চারিদিকে ছোট ছোট ঘর; সেগুলি পূর্ব্বকালের শয়নঘরের মত।

আর একটী অঙ্গনের নাম মিসর-অঙ্গন। এইখানকার দেয়ালে প্রাচীন মিসর-দেশের আশ্চর্য্য দেবতা সকল চিত্রিত রহিয়াছে; দেয়ালের এক পার্শ্বে প্রাচীন মিসরীদিগের চিত্র-লিপি (অর্থাৎ ছবির দ্বারা তাহারা যেরূপ লিখিত, সেইরূপ) অঙ্কিত। যদিও দেয়ালগুলি চূণ এবং বালির দ্বারা প্রস্তুত, তথাপি সে গুলিকে দেখিতে ঠিক প্রাচীনকালের প্রস্তর-নির্ম্মিত প্রাচীরের ন্যায় (প্রাচীনকালের প্রস্তরের নির্ম্মিত দেয়ালের কিছু অংশ লণ্ডনের বড় যাদুঘরে আছে)। মিসর অঙ্গনে স্ফিঙ্ক্স্ নামক বৃহৎ প্রতিমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়।

ইহার পর নিনেভা-অঙ্গন। অঙ্গনের দ্বারে চূণ এবং বালির দ্বারা নির্ম্মিত, নানা বর্ণে চিত্রিত, ডানাযুক্ত দুটী বৃহৎ সিংহ। প্রাচীন নিনেভা-নামক নগরের * কোন মন্দিরের দ্বারে যেরূপ দুটী সিংহ থাকিত, ইহা তাহারই অনুকরণ। নিনেভা-অঙ্গন পরিত্যাগ করিয়া কিছু দূরেই গ্রীক এবং রোমীয় অঙ্গন। এই দুটী অঙ্গনের মধ্যে প্রাচীনকালের সুন্দর সুন্দর প্রতিমূর্ত্তির ছাঁচ সকল রহিয়াছে। সেগুলি এত সুন্দর যে বর্ত্তমান সময়ে ইংরাজী শিল্পীরাও ইহার ন্যায় সুন্দর, মনোহর কোন মূর্ত্তি প্রস্তুত করিতে পারেন নাই।

কয়েকটী অঙ্গনের নাম চিত্রশালিকা-অঙ্গন। এখানে ইংলণ্ড ও অন্যান্য স্থান হইতে আনীত নানারূপ পরম সুন্দর মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। ইংলণ্ডের একটী সুন্দর ধর্ম্মালয়ের দ্বার, মাইকেল এঞ্জেলো নামক বিখ্যাত শিল্পীর নির্ম্মিত প্রাচীন কালের ধর্ম্ম-ঋষি মূষার মূর্ত্তি, ফরাশীদেশের রাজ-ধানী পারিস নগর ও ইটালী দেশের পরম সুন্দর ফ্লোরেন্স সহর হইতে আনীত নানারূপ অপূর্ব্ব মূর্ত্তি, এখানে এই সকল দ্রব্য দেখিলে মন মোহিত হয়। এতদ্ভিন্ন আরও এত রকমের জিনিশ রহি-য়াছে যাহার বর্ণনা করিয়া উঠা যায় না।

স্ফটিক-প্রাসাদের এক পার্শ্বে একটী সুন্দর

† বাড়ীটী সম্পূর্ণরূপে কাচ এবং লৌহ-দ্বারা নির্ম্মিত বলিয়া ইহার নাম, স্ফটিক-প্রাসাদ' হইয়াছে। স, স।

* আরবদেশের উত্তরে এবং পারস্যদেশের পশ্চিমে এই নামে পূর্ব্বে একটী সহর ছিল। আজকাল সে সহরের প্রায় কিছুই নাই। কেবল টাইগ্রিস নদীর তীরে মোসল নামক নগরের নিকটে কতকগুলি ভগ্নাবশেষ মত্রে দেখাযায়। স, স।



কাচনির্ম্মিত ঝরণা আছে। সেই ঝরণার চারি-দিকের জলে নানারূপ স্বর্ণ এবং রৌপ্যময় মৎস্য খেলিয়া বেড়াইতেছে, এবং জলের চারিদিকে স্তরে স্তরে পরম মনোহর ফুল সকল সাজান রহি-য়াছে। প্রাসাদের অপর পার্শ্বে আর একটী মার-বেল পাথরের নির্ম্মিত ফোয়ারা; কিন্তু সেটী কাচনির্ম্মিত ঝরণাটীর ন্যায় সুন্দর নহে। এই ফোয়ারার সম্মুখে কতকগুলি বড় 'মজার' টেয়া পাখী বাঁধা রহিয়াছে। তাহারা সুন্দর কথা কয়, এবং যদি তাহাদিগের প্রতি স্নেহ এবং আদর না দেখাও, তাহা হইলে বিরক্তির ভাব প্রকাশ করে। নিকটে পিঞ্জরে কতকগুলি বানর এবং অন্যান্য অনেকগুলি পশু দেখা যায়। একবার আগুণ লাগিয়া এই ভাগের খানিকটা স্থান পুড়িয়া যাও-য়াতে একটী বৃহৎ বানর এবং অন্যান্য অনেক দ্রব্য ও প্রাসাদের কিয়দংশ নষ্ট হয়। তদবধি প্রাসাদটী কিছু ছোট হইয়া পড়িয়াছে।

প্রাসাদের নিকটবর্ত্তী উদ্যানে গ্রীষ্মকালে পরম সুন্দর নানারূপ ফুল ফুটিয়া মন হরণ করে; মধ্যে মধ্যে চারিদিকে প্রস্তরনির্ম্মিত মূর্ত্তি সকল মাথা তুলিয়া আরও সৌন্দর্য্য বাড়ায়। চারিদিকে ফোয়ারা, জলপ্রপাত প্রভৃতি যখন জল ছড়া-ইতে থাকে, এবং তাহার উপর সূর্য্যকিরণ পড়িয়া যখন রামধনুর শোভা দেখা যায়, তখনকার সে সৌন্দর্য্য পৃথিবীতে আর কোথাও পাওয়া যায় কি না সন্দেহ।

সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়া গেলে, পূর্ব্বকালে পৃথিবীতে যে সকল বড় জন্তু ছিল, তাহাদের অনুকরণ অর্থাৎ সেইরূপ আকারের জন্তু দেখা যায়। এই সকল জন্তু আজকালকার সকল জন্তু অপেক্ষা বৃহৎ; এমন কি হস্তীও তত বৃহৎ নহে। সে আকারের কোনও জন্তু আজকাল দেখা যায় না। এই ভাগটী নানারূপ গাছপালাতে সাজান; মধ্যে মধ্যে বিদেশ হইতে আনীত সুন্দর সুন্দর চারা গাছও রোপিত হইয়াছে; কিন্তু সেগুলি ইংলণ্ডের দারুণ শীতে সচরাচর বাঁচে না।

প্রাসাদের প্রকটী প্রধান আকর্ষণের জিনিশ মনোহর বাদ্য। সাধারণতঃ প্রত্যেক দিন এবং শীতকালের শনিবারে রমণীয় ঐক্যতান বাদ্য হয়। কেহ পিয়ানো বাজায়, কেহ গান গায়, এইরূপে খুব আনন্দে সময় কাটে।

প্রাসাদের মধ্যে কখন কখন পোষা পাখী দেখান হয়। তখন নানা স্থানের নানারূপ মোরগ মুরগী, এবং পায়রা আসিয়া উপস্থিত হয়। সে সময় প্রাসাদের একপার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্ব পর্য্যন্ত কেবল এই দৃশ্য; বৃহৎ খাঁচায় দলে দলে পাখী,—পাখার ঝট্‌পটে এবং কোঁ কোঁ শব্দে কর্ণ বধির হইয়া যায়। বৎসরের মধ্যে একবার কুকুর-প্রদর্শনী মেলা হয়; তখন সুবৃহৎ (Mastiff) মাষ্টিফ্ কুকুর হইতে ইন্দুরের ন্যায় ছোট (Terrier) টেরিয়ার কুকুর পর্য্যন্ত সব রকমের কুকুর দেখিতে পাওয়া যায়। কখনওবা 'বিড়াল প্রদর্শনী' হয়; তখন প্রাসাদের কোন কোন অঙ্গন বিড়ালে পূর্ণ হইয়া যায়।

স্ফটিক-প্রাসাদ লণ্ডন নগর হইতে তিন ক্রোশ দূরে স্থিত। ঘোড়ার গাড়ী বা রেলওয়ে, দুই উপায়েই তথায় যাওয়া যায়। রেলওয়েতে যাওয়া সুবিধা বলিয়া অনেকে রেলেই যাতায়াত করিয়া থাকেন। উৎসব বা কোন মেলা উপলক্ষে দলে দলে যাত্রী লইয়া লণ্ডন হইতে রেলের গাড়ী সকল সিডেনহাম পল্লীতে আইসে, এবং এত লোকের জনতা হয় যে সন্ধ্যাকালে সহরে ফিরিয়া যাইবার সময় গাড়ীতে স্থান পাওয়া কষ্টকর হইয়া উঠে।

(অনুবাদিত)

কুমারী টি——

লণ্ডন।

## মহাত্মা হেয়ার সাহেব।

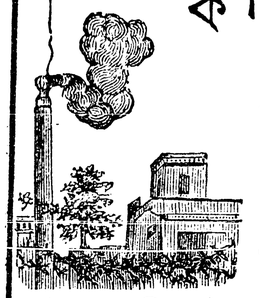

কলিকাতা পটলডাঙ্গার গোলদীঘিতে প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে অনেক বালক বেড়াইতে গিয়া থাকেন। তাঁহারা সকলেই গোলদীঘির দক্ষিণ পার্শ্বে অদ্যকার চিত্রের ন্যায় খানিকটা স্থান নিশ্চয়ই দেখিয়াছেন। কিন্তু উহা কি, এবং কিসের জন্য গোলদীঘির মধ্যে আসিল, ইহা কি কেহ ভাবিয়া দেখিয়াছেন? যে সকল বালক একটু বড় তাঁহারা জানেন উটী হেয়ার সাহেবের গোর। কিন্তু তাঁহারাও বোধ হয় জানেন না অথবা জানিতে চেষ্টা করেন নাই যে গোরের উপরের গোলাকার থামের গায়ে কি লেখা আছে। আমরা প্রথমতঃ তাহাই জানাইতেছি;—

"এই গোর-স্থানের মধ্যে ডেবিড হেয়ারের শরীর রহিয়াছে; এই স্থানটী তাঁহার বাঙ্গালী ছাত্র এবং বন্ধুদিগের দ্বারা নির্ম্মিত। হেয়ার সাহেবের জন্মভূমি স্কট্‌লণ্ডে; তিনি ১৮০০ খৃষ্টাব্দে এই সহরে আগমন করেন, এবং ঘড়ি নির্ম্মাণ ব্যবসায়ে পরিশ্রম ও সৎচরিত্রের গুণে যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিয়া ১৮৪২ খৃষ্টাব্দের ১লা জুন তারিখে পরলোকগত হন। অল্পকালের জন্য এই দেশে আসিয়া তিনি এই দেশকেই নিজের দেশ করিয়া লন, এবং যতদিন জীবিত ছিলেন সমস্ত সময় আহ্লাদের সহিত অবিশ্রান্ত উৎসাহ ও যত্ন সহকারে বাঙ্গালীদিগের শিক্ষা এবং চরিত্র বিষয়ক-উন্নতি, এই একমাত্র প্রধান এবং প্রিয় উদ্দেশ্যের জন্য ব্যয় করেন; এই কার্য্যে শারীরিক ক্লেশ, অর্থ, বা বাচনিক উপদেশ, তিনি কিছুই বাকী রাখেন নাই। তিনি যত দিন জীবিত ছিলেন সহস্র সহস্র বঙ্গবাসী সন্তানের ন্যায় তাঁহাকে ভালবাসা ও ভক্তি দিয়াছে এবং আজ তাঁহার মৃত্যুতে তাঁহাকে পিতৃ-তুল্য প্রিয়তম এবং স্বার্থশূন্য বন্ধু বলিয়া খেদ করিতেছে।"

যাঁহারা সদা সর্ব্বদা গোলদীঘিতে বেড়াইয়া বেড়ান তাঁহারা হয়ত এ কথাগুলি দেখিয়াও দেখেন না। হেয়ার সাহেব কে ছিলেন, কিসের জন্য তিনি বাঙ্গালীদিগের পিতৃ-তুল্য, এ সকল কথা জানিলে বিশেষ উপকারের সম্ভাবনা, এই জন্য আমরা হেয়ার সাহেবের কথা কিছু কিছু লিখিব। তবে সর্ব্বপ্রথমে এই বলিয়া রাখি যে আমরা এখন যে ইংরাজী শিক্ষা পাইতেছি, এই ইংরাজী শিক্ষার সূচনা হেয়ার সাহেবই সর্ব্বপ্রথমে করেন।

যখন হেয়ার সাহেব এদেশে প্রথম আইসেন তখন আমাদের দেশের লোকের বড় দুরবস্থা ছিল। হেয়ার সাহেব দেখিলেন এই দুরবস্থা দূর করিতে হইলে এই দেশীয় লোকদিগকে ইংরাজী লেখা পড়া শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক।

তখন রাজা রামমোহন রায় এবং তাঁহার কয়েক জন বন্ধু দেশের উন্নতির জন্য ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। হেয়ার সাহেব রামমোহন রায়কে ইংরাজী স্কুল করিতে পরামর্শ দেন। ইংরাজী শিক্ষা দিলে দেশের উপকার হইবে, এ কথা মহাত্মা রামমোহন স্বীকার করেন বটে, কিন্তু নানা কারণে হেয়ার সাহেবকে ভালরূপ সাহায্য করেন নাই। তখন হেয়ার সাহেব নিরাশ না হইয়া সেই সময়কার হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সার্ হাইড্ ঈষ্ট্ সাহেবের নিকট মনের কথা খুলিয়া বলেন। সার্ হাইড্ এই প্রস্তাবে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির দ্বারা হিন্দুসমাজের প্রধান প্রধান লোকের মত জানিলেন; যখন শুনিতে পাইলেন ইংরাজী শিক্ষা করিতে অনেকেরই মত আছে, তখন হিন্দুকালেজ স্থাপিত হইল (১৮১৬ খৃষ্টাব্দ)। সে আজ প্রায় ৬৬ বৎসর পূর্ব্বকার কথা। হেয়ার সাহেব যদিও নিজে শিক্ষক ছিলেন না তথাপি তিনি এত অধিক সময় স্কুলের বালকদিগের সহিত থাকিতেন, যে বালকেরা শিক্ষক অপেক্ষা তাঁহাকেই অধিক চিনিত।

হিন্দুকালেজের স্থাপনার পর হেয়ার সাহেবের উদ্যোগে দুটী সভা হয়, একটীর নাম স্কুল সোসাইটী, অপরটীর নাম স্কুল-বুক সোসাইটী। যে সকল বালক সঙ্গতি-অভাবে লেখাপড়া শিখিতে পারে না, তাহাদিগকে বিনা বেতনে শিক্ষা দেওয়া, যে সকল দেশীয় পাঠশালা সাহায্য-অভাবে ভালরূপ চলে না, তাহাদিগকে সাহায্য করা এবং বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান, অথচ দরিদ্র কতকগুলি বালকের কালেজের বেতন দ্বারা সহায়তা করা, প্রধানতঃ এই সকল কার্য্যের জন্য স্কুল-সোসাইটীর জন্ম হয়। এই সভার উদ্যোগে অনেকগুলি সামান্য বিদ্যালয় স্থাপিত হয়, তন্মধ্যে চাঁপাতলা স্কুল এবং ঠনঠনিয়া স্কুল বিখ্যাত। এই দুটী স্কুল নানা কারণে কিছু কাল পরে একত্র মিশিয়া 'কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুল' এই নাম ধারণ করে, এবং আজ কাল 'হেয়ার স্কুল' এই নামে বিখ্যাত হইয়া পড়িয়াছে। স্কুল-বুক সোসাইটীর উদ্যোগে অনেকগুলি ইংরাজী ও বাঙ্গালা পড়িবার পুস্তক প্রস্তুত হয়। এই সভাটী আজিও আছে।

হেয়ার সাহেব নাম কিনিবার ইচ্ছা করিতেন না। তিনি সর্ব্বদা বালকদিগের সন্ধান লইতেন, স্কুলে দেখা না পাইলে তাহাদের বাড়ীতে যাইতেন, এবং কখন তাহাদিগের সহিত খেলা করিয়া, কখন মিষ্ট তিরস্কার করিয়া তাহারা যাহাতে ভাল হয় তাহার চেষ্টা করিতেন।

ঘড়িনির্ম্মাণ-ব্যবসায়ে হেয়ার সাহেব যে



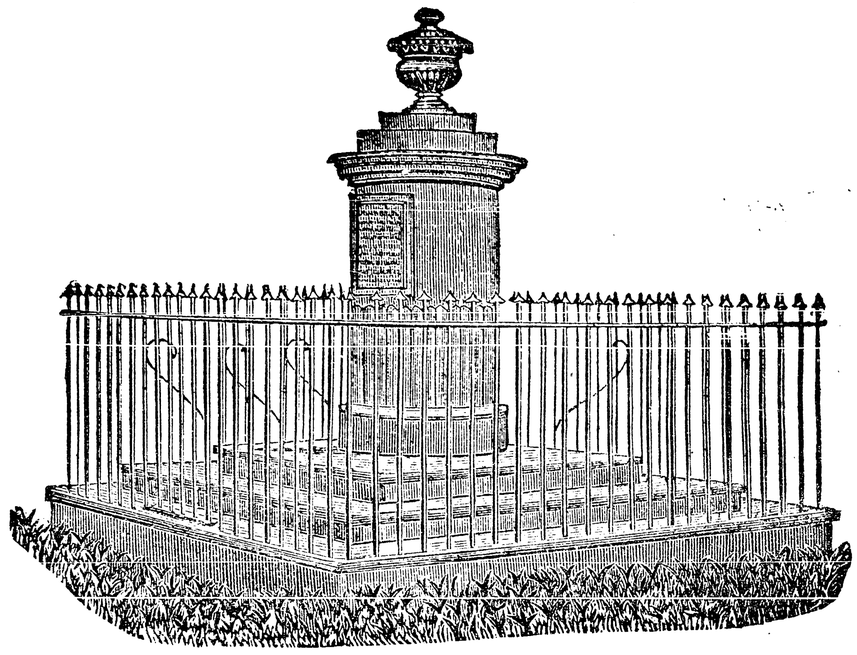

টাকা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহা লইয়া দেশে গেলে, তিনি মহাসুখে কাল কাটাইতে পারিতেন, কিন্তু এ দেশের বালকদিগের প্রতি তাঁহার কেমনই একটু মায়া জন্মিয়া গেল যে আর তাহাদিগের উপকারের চেষ্টা না করিয়া যাইতে পারিলেন না। হেয়ার সাহেবের চরিত্র সম্বন্ধে যে সকল সত্য ঘটনার কথা শুনা যায়, তাহা বলিলে হয়ত অনেকে মিথ্যা গল্প বলিয়া মনে করিবেন, কিন্তু তাহার এক তিলও মিথ্যা বা অতিরিক্ত বলা নহে। আমাদের এখানে আর অধিক স্থান নাই। সুতরাং সংক্ষেপে তাঁহার অবশিষ্ট জীবনের কথা বলিয়া অন্য বারে তাঁহার সম্বন্ধে কতকগুলি গল্প বলিব।

হেয়ার সাহেব বালকদিগকে এত ভাল বাসিতেন যে তাহাদের পীড়া হইলে অনেক সময় তিনি আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া শয্যার পার্শ্বে বসিয়া থাকিতেন। বাড়ীর মেয়েরা হেয়ার সাহেবকে দেখিয়া লজ্জা করিতেন না। বরং ছেলের পীড়া হইলে যদি সাহেব দেখিতে আসিলেন, তাহা হইলে তাঁহাদের ভাবনা অর্দ্ধেক কমিয়া যাইত। বিছানার নিকটে হেয়ার সাহেব বসিয়া ঔষধ খাওয়াইতেছেন, অন্যদিকে বাড়ীর মেয়েরা বসিয়া আছেন,—এরূপ ঘটনা অনেক সময় ঘটিয়াছে।

১৮৪২ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে ৬৭ বৎসর বয়সে ওলাউঠা রোগে দয়ার সাগর বাঙ্গালীর "পিতৃতুল্য বন্ধু" হেয়ার সাহেবের প্রাণ যায়। তাঁহার পীড়ার সম্বাদ সকলে পাইতে না পাইতে তাঁহার মৃত্যু হইল। সে দিন ভয়ানক বৃষ্টি হইতেছিল। কিন্তু হেয়ার সাহেবের নিকট যাহারা উপকার পাইয়াছে, তাহারা বৃষ্টি মানিবে কেন। জলে ভিজিয়া দলে দলে বাঙ্গালী হেয়ার সাহেবের মৃত শরীরের চারিদিকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল এবং তাহাদের পরম প্রিয় বন্ধুকে জন্মের শোধ দেখিয়া কাঁদিতে লাগিল। সাহেবদিগের গোরস্থানে হেয়ার সাহেবকে গোর দেওয়া হয় নাই; যে স্থানে মহাত্মা হেয়ার বাঙ্গালীদিগের জন্য পরিশ্রম করিয়াছেন. সেই স্থানের নিকটে, এবং যে বাঙ্গালীদিগের উন্নতির জন্য হেয়ারের প্রাণ গেল, তাহাদেরই মধ্যে হেয়ার সাহেবের শরীর মৃত্তিকার নীচে পোতা হইল।

উপকারীর প্রতি কে না কৃতজ্ঞ হয়? যাঁহার নিকট আমাদের জাতি বিশেষ উপকার পাইয়াছে, তিনি মরিয়া গিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার নাম আমাদের সকলের হৃদয়ের মধ্যে চিরকাল গাঁথা থাকিবে, তাহাতে সন্দেহ কি?

---

## মেয়েরা আমাদের কে?

**ঠিকাগণ!** পুরুষদিগের সহিত আপনাদের কি সম্পর্ক, তাহাই এই প্রস্তাবে বলিব।

অতি বাল্যকালে আমার মাতার মৃত্যু হয়। তখন মা কি ধন, তাহা জানিতাম না। আমার স্বভাব অত্যন্ত দুরন্ত এবং অবাধ্য ছিল।—এই অবাধ্যতাতে যে আমার মাতার ভয়ানক ক্লেশ হইত, তাহা আমার ছোট বুদ্ধিতে আসিত না। আমি মনের সুখে খেলা করিয়া বেড়াইতাম, এবং আবশ্যক হইলে কোন দ্রব্যের জন্য মায়ের প্রতি অত্যাচার করিতাম। মাতা যখন মৃত্যুশয্যায় পড়িলেন, তখন. আমি নির্ব্বোধ! মার স্নেহ বুঝিলাম না—ভাবিলাম "পীড়া হইয়াছে, তাহাতো ভালই! এখন নিরাপদে যেখানে সেখানে বেড়াইতে পারিব।" অসহ্য যন্ত্রণায় মাতার মৃত্যু হইল; এক দিন মাতার কাছে বসিয়া পুত্রের কর্ত্তব্য কাজ করিলাম না; যে রাত্রিতে মাতা চলিয়া গেলেন, সেই রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতে—



অবোধ আমি—ছুটিয়া বাড়ীর সম্মুখের পুষ্করিণীতে মাছ ধরিতে গেলাম।

অনেক দিন গেল। সকলেই ছুটিয়া মায়ের কাছে যায়—আমি কার কাছে যাইব? কিন্তু তাহাতে দুঃখ নাই। অবশেষে এক দিন আমার মাতার কথা মনে পড়িয়া গেল। বড় হইলাম—লেখাপড়া শিখিয়া বুদ্ধি একটুকু পরিষ্কার হইল,—তখন একদিন পাড়ায় বেড়াইতে গিয়াছিলাম। আমার মাতার চরিত্রের গুণে অনেকেই তাঁহাকে ভালবাসিতেন, তাঁহাদেরই এক জন আমাকে নিকটে পাইয়া আমার মাতার ভালবাসার কথা বলিলেন। তিনি বলিলেন "তোমার মাতা তোমাকে কত ভালবাসিতেন, তাহা কি তুমি জান? যখন তিনি মরিতে বসিয়াছেন. তখন আমাদিগকে ডাকিয়া বলিলেন 'আমি চলিলাম। আমার ছেলেটী রহিল. উহাকে দেখিও। ও গোঁয়ার, যদি তোমাদিগের বালকবালিকাকে প্রহার করে—আমার অনুরোধ উহাকে কিছু বলিও না। আমি ভগবানকে ডাকিয়াছি, তিনি উহাকে নিশ্চয়ই সুমতি দিবেন। যতদিন সে দিন না আসে ততদিন দয়া করে এ অভাগিনীর অনুরোধ মনে করিয়া সব সহ্য করিও'; এই কথা বলিতে বলিতে মাতার চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল।" আমি যখন এই কথাগুলি শুনিলাম, তখন আমার প্রাণ ধরিয়া কে যেন নাড়িয়া দিল। সেখান হইতে উঠিয়া গিয়া একস্থানে বসিয়া খানিকক্ষণ কাঁদিলাম এবং ঈশ্বরকে ডাকিয়া বলিলাম "হে জগদীশ! এইতো তুমি সুমতি দিয়াছ, এখন আর আমি গোঁয়ার নহি; কিন্তু মাতো দেখিতে আসিলেন না, মায়ের প্রতিতো সদয় ব্যবহার করিতে পারিলাম না।"

মৃত্যু-শয্যায় পড়িয়া যে মাতা নিজের জ্বালা ভুলিয়া প্রাণের টানে সন্তানের মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করেন, তিনি স্ত্রীলোক। বালকবালিকাগণ! এখন হয়ত বুঝিতেছ না, 'মা কেমন স্ত্রীলোক,' কিন্তু যে দিন মা থাকিবেন না, যে দিন পরের মাকে মা বলিয়া ডাকিতে চাহিবে, যে দিন বড় হইয়া নানারূপ জ্বালায় যন্ত্রণায় পড়িয়া চারিদিক অন্ধকার দেখিবে, তখন জানিবে মা থাকিলে কি হইত, এবং নাই যে তাহাতেই বা কি ক্ষতি হইয়াছে!

আবার, যখন ছোট ভগিনীর প্রতি অত্যাচার করিতাম, তখনকার কথা মনে হইলেও ভয়ানক ক্লেশ হয়। সে ভগিনীর সহিত এখন আর দেখা হয় না, কারণ তাহার বাড়ী আর আমার বাড়ী এখন আর এক নহে। দুই বৎসরে যদি দুদিন দেখা হইল. তাহা হইলেই যথেষ্ট। বাল্যকালে যাহার সহিত মাতৃস্তন্য লইয়া কাড়াকাড়ি করিয়াছি, আজ তাহার দিকে মন টানিতেছে; কিন্তু আর উপায় কি? ভাবিতেছি যত দিন ভগিনীর প্রতি অত্যাচার করিয়াছি ততদিন যদি তাহাকে ভাল বাসিতাম তাহা হইলে আজ এত ক্লেশ হইত না। আজ তাহার নিজের একটী সংসার হইয়াছে, অথচ আমাকে দেখিবার জন্য তাহার প্রাণ আকুল। এ স্নেহের টান, এ ভালবাসা ভগিনী ভিন্ন আর কাহার হইবে? এমন ভগিনীও স্ত্রীলোক।

আমাদের মাতা স্ত্রীলোক, ভগিনী স্ত্রীলোক এবং অধিক ভাল বাসিবার লোক যাঁহারা সকলেই স্ত্রীলোক। কাহারও পিতামহী, কাহারও ধাত্রী (ধাইমা বা বুড়ি ঝি) এইরূপ সকলেরই স্নেহের আধার স্ত্রীলোক। এইরূপ ভালবাসা পুরুষের হওয়া সম্ভব নয়। এই জন্য সহজেই বুঝা যায় যে জগদীশ্বর স্ত্রীলোককে দয়াতে, ভালবাসাতে পূর্ণ করিয়া এই পৃথিবীতে পাঠাইয়াছেন এবং তিনি যেন এই বলিয়া দিয়াছেন "হে আমার কন্যাগণ! তোমরা পৃথিবীতে যাও, এবং মাতা হইয়া, ভগিনী হইয়া, কন্যা হইয়া, ধাত্রী হইয়া কঠিন পুরুষকে স্নেহে ভাসাইয়া দিয়া সংসারকে স্বর্গ করিয়া দাও।"

সংসারকে স্বর্গ করাই স্ত্রীলোকের কার্য্য, ইহা

যেন পাঠিকাদিগের স্মরণ থাকে। পাঠিকাদিগকেও বলি তাঁহারা যেন অনর্থক আপন আপন ভগিনীদিগের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে না যান, যাহাতে বালিকাদিগের উন্নতি হয়, যাহাতে তাঁহারা নিজের শক্তি বুঝিয়া নিজের উন্নতি করিতে পারেন, সুশিক্ষিতা হইতে পারেন, পাঠকগণ যেন সে বিষয়ে মনোযোগী হন।

## বৃষ্টি।

"তোরা কি জান, বৃষ্টি কোথা হইতে আইসে?" শিক্ষকের এই কথা শুনিয়া ৭ বৎসরের বালক মণিমোহন বলিয়া উঠিল "আমি জানি। হাতীরা সমুদ্র হইতে শুঁড়ে করিয়া জল তুলিয়া আকাশের উপর হইতে ছড়াইয়া দেয়, তাহাতেই বৃষ্টি হয়।"

শিক্ষক হাসিয়া বলিলেন "মণি! তোমাকে এ কথা কে শিখাইল? ভাল, হাতীগুলি কিরূপ বলিতে পার?"

মণি। মেঘের মত গায়ের রং—ঠাকুরমা বলিয়াছেন।

হরি, মতি, কেশব, সুরেন্দ্র সকলেই মণির কথায় হাসিয়া উঠিল। শিক্ষক তাহাদিগকে থামাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন 'আচ্ছা, কেশব তুমি বল দেখি বৃষ্টি কোথা হইতে আইসে?"

কেশব বলিল "মেঘ হইতে।"

শিক্ষক। মেঘ কি? মেঘই বা কোথা হইতে আইসে?

কেশব। জানি না।

সুরেন্দ্র। আমি জানি। সমুদ্র হইতে মেঘ উঠে।

শিক্ষক। তোমার অনেকটা ঠিক বলা হইয়াছে। আচ্ছা, আমি তোমাদিগকে বুঝাইয়া দিতেছি। প্রথমতঃ একটী বিষয় তোমরা বোধ হয় জান। বল দেখি সোলা জলে ভাসে কেন?

মতি। সোলা জলের অপেক্ষা হাল্‌কা, এই জন্য।

হরি। সে দিন ভৈরব চুলীদের বাড়ীর কাছে আমরা খেলা করিতে গিয়াছিলাম; তখন দেখিলাম তাহাদের শিমুলগাছ হইতে ফল ফাটিয়া তুলা বাহির হইতেছে। তাহার কতকটা নীচে পড়িয়া গেল, আর কতকটা সরু সরু হইয়া বাতাসে ভাসিয়া যাইতে লাগিল।

মণি। আমি দেখিয়াছি। সেগুলি অতি সুন্দর।

হরি। তুলাগুলি যে বাতাসে ভাসিতেছিল সেও তাহা হইলে এই কারণে যে তুলার সরু সরু খণ্ডগুলি বাতাস অপেক্ষা হাল্‌কা।

শিক্ষক। হাঁ—অনেকটা তাই বটে। আচ্ছা এখন যাহা বলি মনোযোগ করিয়া শুন। ভয়ানক রৌদ্রের সময় পুষ্করিণীর জল শুকাইয়া যায়, তাহা জান। ভাল, এ জল কোথায় যায় জান?

সুরেন্দ্র। মাটীতে বসিয়া যায়।

শিক্ষক। খানিকটা মাটীতে বসিয়া যায় বটে, কিন্তু সমস্তটা যায় না। বাকীটা বাষ্প হইয়া উড়িয়া যায়।

মণি। বাষ্প কি?

শিক্ষক। বষ্প বাতাসেরই মত; তবে বাষ্প কখন কখন দেখা যায়।

যেমন খুব ঠাণ্ডা করিলে অনেক জলের মত জিনিশ বরফ হইয়া যায়, তেমনি খুব গরম করিলে অনেক জিনিশ বাষ্প হইয়া উড়িয়া যায়। গ্রীষ্মকালে যখন ভয়ানক রৌদ্র হয়, তখন সমুদ্র, নদী, পুকুর প্রভৃতি হইতে রৌদ্রের তেজে অনেক বাষ্প উঠে।

যদি এক খণ্ড সোলা লইয়া জলের তলায় ছাড়িয়া দাও, তাহা হইলে কি সোলার খণ্ডটী সেই খানেই থাকে?



মণি। না, না! লাফাইয়া উপরে উঠে।

শিক্ষক। বেশ, মণি! এই জন্যই রৌদ্রের তেজে যখনই সমুদ্র, প্রভৃতি হইতে বাষ্প উঠিল, অমনি হাল্‌কা বলিয়া বাষ্প লাফাইয়া বাতাসের উপরের দিকে চলিয়া গেল। এখন বুঝিয়াছ?

কেশব। আপনি বলিলেন বাষ্প প্রায়ই দেখা যায় না, কিন্তু মেঘত দেখা যায়! তবেত বাষ্প আর মেঘ এক জিনিশ নয়।

শিক্ষক। বুঝাইয়া দিতেছি। জল হইতে গরমেতে যদি বাষ্প হয়, তাহা হইলে সেই বাষ্পকে ঠাণ্ডা করিলে অবশ্য জল হইবে।

সকলে। হাঁ।

শিক্ষক। তোমরা বোধ হয় জান পাহাড়ে দেশ বড় ঠাণ্ডা।

মতি। আমি জানি। বাবা দার্জ্জিলিংএ গিয়াছিলেন; তিনি বলিয়াছেন, আমাদের এখানে যখন গরম, তখন সেখানে লেপ গায়ে দিতে হয়।

শিক্ষক। পাহাড়ে দেশ খুব উচ্চ বলিয়া তথায় শীত অধিক। উচ্চ যায়গা না হইলেই যে শীত হইবে না, তাহা বলিতেছি না; তবে মোটা মুটি জানিয়া রাখিয়া দাও, যে উচ্চ যায়গায় শীত খুব বেশী। কেন উচ্চ যায়গায় শীত বেশী হয় তাহা জানিবার এখন প্রয়োজন নাই। তবেই বুঝিতে পার, বাষ্প উপরে গিয়া খুব ঠাণ্ডার মধ্যে পড়ে।

সকলে। বুঝিয়াছি।

শিক্ষক। এই ঠাণ্ডায় পড়িয়া বাষ্প জল হইয়া যায়, কিন্তু সেই জলবিন্দু এত ছোট ছোট যে অনায়াসে বাতাসের উপরে ভাসিয়া বেড়ায়। আমরা আকাশে যে মেঘ দেখিতে পাই, সে এই জলবিন্দু। মেঘ হইলেই বৃষ্টি হয় না; মেঘ খুব গাঢ় না হইলে বৃষ্টি হইতে পারে না; তাহার পর, বাতাসে মেঘকে তাড়াইয়া অন্য দেশে লইয়া যায়, তাহাও বৃষ্টি না হইবার কারণ। যাহা হউক, যখন এই ছোট ছোট জল বিন্দু বাতাসের তাড়ায় এক সঙ্গে মিসিয়া ভারী হয়, তখনই ঝুপ্ ঝুপ্ করিয়া ঝম্ ঝম্ করিয়া পৃথিবীতে আসিয়া পড়ে। বুঝিয়াছ।

আজ এই পর্য্যন্ত। অন্য একদিন এইরূপ অন্য কোন বিষয়ে গল্প করা যাইবে। এখন বাড়ী যাও।

ছেলেরা শিক্ষক মহাশয়ের নিকট বৃষ্টির বিষয়ে গল্প শুনিয়া অত্যন্ত সুখী হইল। মনে মনে ভাবিল বাড়ীতে গিয়া এই বিষয়ে সকলকে গল্প করিব।

কেশব বলিল "মেঝকাকীকে জিজ্ঞাসা করিয়া ঠকাইয়া দিব।"

মণি বলিল "পুঁটীকে শিখাইয়া দিব।"

মতি বলিল "মার কাছে গিয়া এই গল্প বলিব।"

হরি বলিল "রামার কেবল খেলা! আচ্ছা, আজ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিব বৃষ্টি কোথা হইতে আইসে।"

সুরেন্দ্র বলিল "বৃষ্টির দিনে এই সকল কথা সকলকে মনে করিয়া দিব।" এইরূপ বলিয়া, হাসিতে হাসিতে, গোলমাল করিতে করিতে, মাষ্টার মহাশয়কে গুড্‌বাই সার, (Good bye, Sir) বলিয়া নমস্কার করিয়া ছেলেরা বাড়ীর দিকে ছুটিল।

---

## ধাঁধা।

১। নাক হাতে করিয়া যায় কে?

২।—।—।—।—খাইতে মিষ্ট। প্রত্যেক ড্যাসের যায়গায় একটী মাত্র অসংযুক্ত ব্যঞ্জন বর্ণ বসাইতে পারিবে। বলত কি জিনিশ?

৩। এরূপ ভাবে কতকগুলি কথা স্থাপিত করা যায়, যে লম্বার দিকে, চওড়ার দিকে—যে দিকে পড়িবে, একই কথা হইবে। যথাঃ—

অ—তু—ল
| | |
তুঁ—মি—ও
| | |
ল—ও—না

এখানে লম্বা এবং চওড়ার প্রথম ছত্র 'অতুল', লম্বা এবং চওড়ার দ্বিতীয় ছত্র 'তুমিও', লম্বা এবং

চওড়ার তৃতীয় ছত্র 'লওনা'। সমস্তটা এক সঙ্গে লইলে 'অতুল, তুমিও, লওনা' এই কথাগুলি হইল। এইরূপে 'মদন' এবং 'প্রমদা' এই দুটী কথার দ্বারা এইরূপ চতুষ্কোণী বিভাগ পদ রচনা কর দেখি।

৪। রামের বয়স যত, সরলার বয়স তত; রাখালের বয়স তাহার দ্বিগুণ; নবীনের বয়স রাখালের অর্দ্ধেক, চপলার বয়স নবীনের অর্দ্ধেক; লাবণ্যলতার বয়স চপলার অর্দ্ধেক। রাখালের বয়স যদি ছ কুড়ির পাঁচ ভাগের এক ভাগ হয়, তবে কাহার বয়স কত?

৫। নিম্নলিখিত অক্ষরগুলি যথাস্থানে বসাইয়া, তাহাতে কাহার নাম হয়, বাহির করঃ—

নাম বিশেষ পরিচয়।

লঙ্কামোদহরমনর্কাতন—ছেলেদের জন্য কতকগুলি পুস্তক লিখেছেন; মেয়েদের জন্য বেথুন স্কুল স্থাপিত হ'লে যখন কেহই প্রথমে মেয়ে দিতে সাহসী হন নাই, তখন ইনিই প্রথমে আপনার মেয়েকে স্কুলে দিয়া জাতিচ্যুত হন, এবং অন্য সকলের মেয়ে দিবার পথ পরিষ্কার করে দেন।

শত্রুন্দরচমেমি—কোনও এদেশীয় লোকের ভাগ্যে যাহা ঘটে নাই, বড় লাট রিপন বাহাদুরের অনুগ্রহে ইহার সেই প্রধানতম পদ লাভ হইয়াছিল।

৬। একমাত্র চক্ষু মোর তাতে জ্যোতি নাই;
অথচ তাতেই মম কার্য্য হয়, ভাই;
মুখ মোর তীক্ষ্ণ অতি,
ব্যস্ত থাকি দিবা রাতি,
দরিদ্রের ঘরে তার জীবিকা যোগাই।
কাছে থাকি বালিকার,
কত কার্য্য করি তার;
সুন্দর সুন্দর কাজে আমিই সহায়।

## সখা-সংক্রান্ত নিয়মাবলী।

১। 'সখা'র অগ্রিম বার্ষিক মূল্য এক টাকা মাত্র। মফঃস্বলে স্বতন্ত্র ডাক মাশুল লাগিবে না। আগামী মার্চ্চ মাসের পরে যাঁহারা গ্রাহক হইবেন, বিদেশবাসী হইলে তাঁহাদের পক্ষে পত্রিকার মূল্য ১৷০ এক টাকা চারি আনা নির্দ্দিষ্ট হইবে। প্রতি খণ্ডের নগদ মূল্য ৵১০ মাত্র।

২। পত্রিকাস্থ চিত্রের সংখ্যা কিছুই নির্দ্দিষ্ট থাকিবে না, তবে প্রত্যেক সংখ্যায় যাহাতে অন্ততঃ এক খানি চিত্র থাকে আমরা সেদিকে দৃষ্টি রাখিব।

৩। বালকবালিকাদিগের রচনা উৎকৃষ্ট হইলে তাহা সাদরে গৃহীত হইবে; তবে সুদীর্ঘ হইলে প্রকাশিত হইবে না।

৪। শিক্ষক এবং অভিভাবকদিগের পরামর্শ প্রভৃতি সাদরে গৃহীত হইবে।

৫। বালক বালিকাদিগের উপকারে আসিতে পারে, কেহ এরূপ কোন রচনা বা কোন সংবাদ কিম্বা সত্য ঘটনার বিশেষ বিবরণ আমাদিগের নিকট পাঠাইলে আমরা তাহা সাদরে প্রকাশ করিব।

৬। সখা-সংক্রান্ত সমস্ত পত্রাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইতে হইবে। কেবল রচনা, পরামর্শ প্রভৃতি সম্পাদকের নামে কার্য্যালয়ের ঠিকানায় পাঠান আবশ্যক।

৭। ঠিকানার পরিবর্ত্তন, নামের গোল, বা কার্য্য-সম্বন্ধীয় অন্য কোন অসুবিধা হইলে মোড়কের উপরে যে নম্বর দেওয়া থাকিবে, সেই নম্বরের উল্লেখ করিয়া পত্র লিখিতে হইবে।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে মুদ্রিত এবং ৫০নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট "সখা" কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

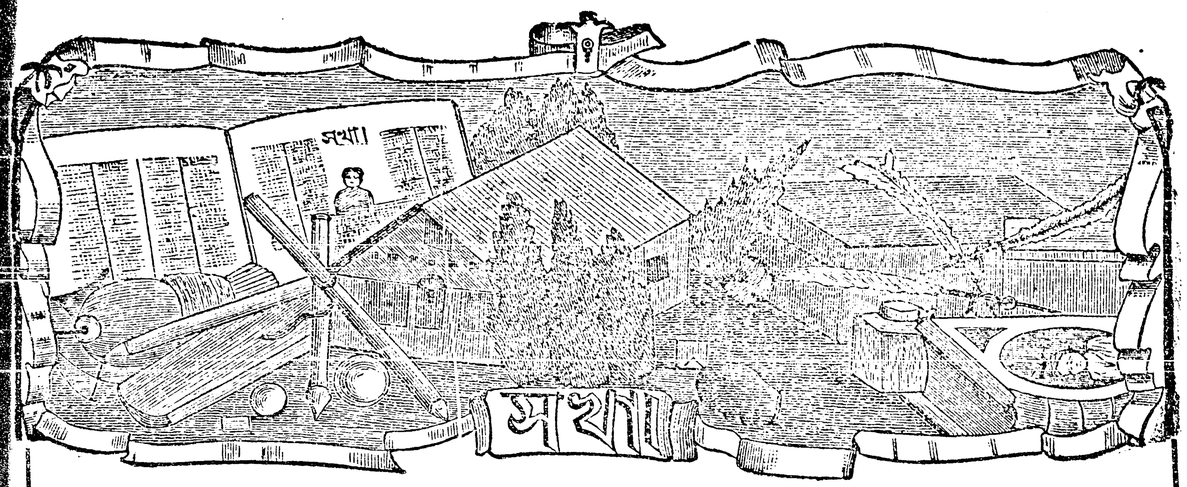


প্রথম ভাগ। কলিকাতা, বুধবার, ৭ই ফেব্রুয়ারী ১৮৮৩। দ্বিতীয় সংখ্যা।

## সম্পাদকের নিবেদন।

যাঁহারা 'সখা'র গ্রাহক এবং বন্ধু, তাঁহারা শুনিয়া আহ্লাদিত হইবেন যে এই এক মাসের মধ্যেই 'সখা'র গ্রাহক সংখ্যা অনেক বাড়িয়াছে। আমরা কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট শুনিলাম প্রায় প্রত্যহই নূতন গ্রাহকের নাম আসিতেছে, এবং অনেক স্থান হইতে উৎসাহপূর্ণ, উপদেশপূর্ণ পত্রাদি পাওয়া যাইতেছে। 'সখা'র অনেক ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও এইরূপ উৎসাহ সকলে দিতেছেন, ইহা আমাদিগের সামান্য সৌভাগ্যের কথা নহে। আমরা সকলের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া যতদূর সম্ভব উৎসাহের সহিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম।

কয়েকটী কথা এই খানে বলিয়া রাখা আবশ্যক। আমাদিগকে কেহ কেহ কতকগুলি বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইয়াছেন; তাঁহাদের প্রশ্নের উত্তর এই খানে দিতেছি, আশা করি তাহাতে অন্যান্য অনেকের কাজ হইবে।

১। 'সখা'তে বিবিধ সংবাদ নাই কেন? তাহার উত্তর স্থানের অভাব। আমরা স্থান হইলেই বিবিধ সংবাদ দিতে পারি।

২। ভীমের কপাল যেরূপ গল্প এই ভাবের গল্প অধিক থাকিবে কিনা?—যদিও এইরূপ ইংরাজী কাগজে এরূপ গল্প অনেক থাকে, তথাপি আমরা নানা কারণে ওরূপ গল্প অধিক দিতে পারিব না।

৩। নানারূপ খেলার সম্বন্ধে কিছুই বলা হয় নাই কেন? নানারূপ দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিবার উপায় প্রভৃতি শিখাইয়া দেওয়া হয় নাই কেন? এইরূপ প্রশ্ন কয়েক জন করিয়াছেন, তাহারও উত্তর স্থানাভাব।

৪। 'সখা'র ভাষাটী আরও সহজ করা হইবে কিনা? এইরূপ প্রশ্ন অনেকে করিয়াছেন। 'সখা'র লেখক ও লেখিকাদিগকে এ সম্বন্ধে অনুরোধ করা হইয়াছে; এরূপ আশা করা যায় যে অল্প কালের মধ্যেই 'সখা'র ভাষা অত্যন্ত সহজ হইয়া পড়িবে। তবে 'ভীমের কপাল' প্রভৃতি গল্পের ভাষা খুব সহজ না হইলেও চলে, কেননা গল্প পাইলে ছেলেরা শক্ত ভাষা বুঝিয়া পড়িবে।

আমাদের যাহা বলিবার ছিল, তাহা বলা হইয়াছে। 'সখা'র উপকারী বন্ধুদিগকে তাঁহাদের উৎসাহ, উপদেশ প্রভৃতির জন্য ধন্যবাদ দিয়া আমরা শেষ করিতেছি।

## আলোক-মঞ্চ।

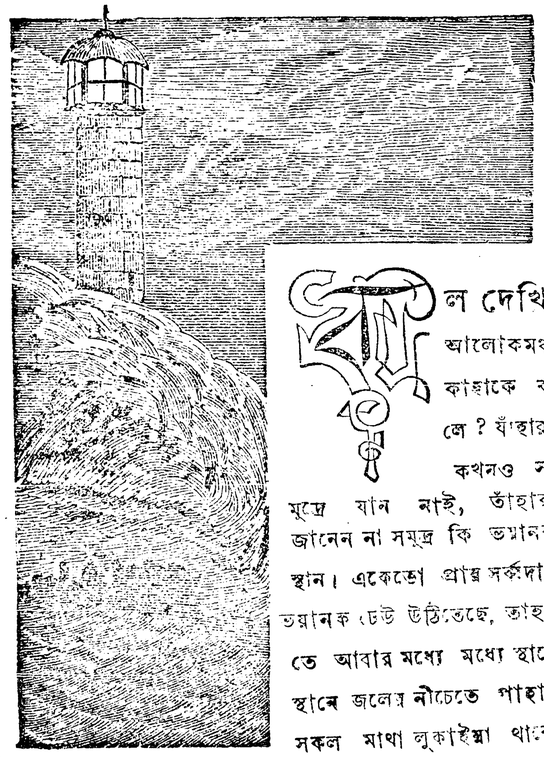

বল দেখি আলোকমঞ্চ কাহাকে বলে? যাঁহারা কখনও সমুদ্রে যান নাই, তাঁহারা জানেন না সমুদ্র কি ভয়ানক স্থান। একেতো প্রায় সর্ব্বদাই ভয়ানক ঢেউ উঠিতেছে, তাহাতে আবার মধ্যে মধ্যে স্থানে স্থানে জলের নীচেতে পাহাড় সকল মাথা লুকাইয়া থাকে, ইহাতে জাহাজগুলিকে যে কত সময় কত বিপদে পড়িতে হয়, তাহার সীমা নাই। যদি রাত্রিতে এই সকল পাহাড়ের নিকটে কোনরূপ আলোকের বন্দোবস্ত না থাকে, তাহা হইলে জাহাজের কি ভয়ানক বিপদ হইবার সম্ভাবনা, তাহা বোধ হয় সহজেই বুঝিতে পার। অন্ধকারে জাহাজ বেশ চলিয়া আসিতেছে, কোথাও কোন গোল নাই, হঠাৎ একটী পাহাড়ে লাগিয়া জাহাজখানি চুরমার হইয়া গেল, তখন কত লোকের প্রাণ যাইবার সম্ভাবনা, ভাব দেখি? এইরূপ ভয়ানক বিপদ যত দূর সম্ভব বারণ করিবার জন্য পৃথিবীর অনেক স্থানে পাহাড়ের উপরে আলোকমঞ্চ সকল নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। উপরে যে চিত্র দেখিতেছ উটী এইরূপ একটী আলোকমঞ্চ।

সকল পাহাড়ই যে সমুদ্র-জলের নীচে লুকাইয়া থাকে তাহা নহে, দু একটী উপরে মাথা তুলিয়া থাকে, কিন্তু জোয়ারের জল আসিলে সে গুলিও খানিকটা ডুবিয়া যায়। মানুষেরা বুদ্ধি করিয়া এই সকল পাহাড়ের উপরে শক্ত করিয়া ঘর তুলিয়াছে, এবং তাহার উপরে আলো দিবার বন্দোবস্ত করিয়াছে। মঞ্চের নিকটে এক জন মঞ্চরক্ষক সর্ব্বদাই থাকে, তাহাকে পরিবারের সহিত এইখানে থাকিতে হয়; সন্ধ্যা-হইবামাত্র মঞ্চরক্ষক মঞ্চের উপরে উঠিয়া আলো জ্বালিয়া দেয়। এই আলোক অনেকদূর পর্য্যন্ত দেখা যায় এবং দূরে যে সকল জাহাজ আসিতেছে, তাহারা এই আলোক দেখিয়াই সতর্ক হয়। কেবল যে লুকান পাহাড়ের উপরেই আলোক দিবার নিয়ম করা হইয়াছে তাহা নহে; সমুদ্রে যাইতে যে সকল স্থানে কিছুমাত্র বিপদের সম্ভাবনা, সেইখানেই রাত্রিতে আলোক দেওয়া হইয়া থাকে। আমাদের গঙ্গানদী যেখানে সাগরে গিয়া পড়িয়াছে, তাহার নিকটে এক স্থানে একটী আলোকমঞ্চ আছে, কিন্তু সেটী পাহাড়ের উপরে নহে। এইরূপ আলোকমঞ্চ তোমার আমার কাজে লাগে না, কেননা আমরা সমুদ্রে যাওয়া দূরে থাকুক, বাড়ি ছাড়িয়া তিন পা নড়িতে চাহি না; কিন্তু যাহাদিগকে সর্ব্বদা সমুদ্রে চলিতে ফিরিতে হয়, সেই সকল জাহাজের মাঝিদিগকে জিজ্ঞাসা কর দেখি, তাহারা এই আলোকমঞ্চ পাইয়া সুখী কিনা? তাহারা নিশ্চয়ই বলিবে "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দি, যে তিনি মনুষ্যকে এমন সুবুদ্ধি দিয়াছেন; এবং মানুষের নিকট কৃতজ্ঞ হই যে আমাদিগের প্রাণ বাঁচাইবার এমন সুন্দর উপায় করা হইয়াছে।"

কিন্তু সমুদ্রের মধ্যস্থিত সকল পাহাড়ের উপরেই যে আলোকমঞ্চ প্রস্তুত হইতে পারিয়াছে, তাহা নহে। অনেক পাহাড়ে নাই; সে সকল স্থানে জাহাজ চলিতে পারে না। ইংলণ্ডের অনেক উত্তরে এইরূপ একটী পাহাড়ময় স্থানে একজন বিধবা জেলেনী বাস করিতেন। মাছ ধরিয়া এবং অন্য ছোট ছোট দুএকটা কাজ করিয়া জেলেনীর দিন চলিত, কিন্তু একটী ভাবনায় তাঁহার বড় ক্লেশ হইত। তিনি দেখিলেন রাত্রিতে অনেক জাহাজ পাহাড়ের উপর আসিয়া পড়ে এবং তাহাতে বড় বিপদ হয়, অথচ সেখানে একটীও আলোকমঞ্চ নাই। বিধবা জেলেনী মনে মনে ভাবিলেন যে 'যদি আমার জানালায় একটী আলো সমস্ত রাত্রি রাখা যায়, তাহা হইলেও তো কাজ চলে।' কিন্তু তেলের পয়সা কোথায় পাইবেন, এই নূতন ভাবনা তাঁহার উপস্থিত হইল। তাঁহার পরিশ্রমে যে রোজগার হয়, তাহাতে তেলের পয়সা যোটে না, সুতরাং তিনি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন কিছু বেশী পরিশ্রম করিয়া তেলের পয়সা পুঁজি করিবেন। যে প্রতিজ্ঞা সেই কাজ; ভয়ানক পরিশ্রম করিতে হইল তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু জানালায় আলোক দেখিয়া অনেক জাহাজ যে বাঁচিয়া গেল, এই আহ্লাদে বিধবার কোনও কষ্টকেই কষ্ট বলিয়া মনে



হইত না। তিনি যতদিন বাঁচিয়া ছিলেন, এক দিনও জানালায় আলো দিতে ভুলেন নাই।

আমরা আলোকমঞ্চ সম্বন্ধে আর একটী গল্প বলিয়া এই প্রস্তাব শেষ করিব। একবার এক আলোকমঞ্চের রক্ষক কোন কাজে সমুদ্রের পারে নগরে গিয়াছিল। তাহার অল্পবয়সের একটী মেয়ে মঞ্চে ছিল। সন্ধ্যা হইল, কিন্তু ঝড় বৃষ্টির উৎপাতে মঞ্চরক্ষক পার হইয়া আসিতে পারিল না। এদিকে আলো দিবার সময় হইল; অন্ধকারে এখনি দলে দলে জাহাজ আসিয়া পাহাড়ে ঠুকিয়া যাইবে—তবেইতো সর্ব্বনাশ! বালিকা মঞ্চে উঠিল, কিন্তু প্রদীপের স্থানটী হাতে পাইল না। তখন সে কাঁপিতে কাঁপিতে দু তিন খানি পুস্তক উপরি উপরি রাখিয়া তাহার উপরে দাঁড়াইল—অল্পবয়স্ক বালিকাটী কি সুবুদ্ধি—এবং দেখলাই লইয়া আলো জ্বালিয়া দিল। পিতা পার হইতে আলো দেখিয়া শান্ত হইলেন, এবং পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন। বালিকা যদি বুঝিয়া আলো জ্বালিয়া না দিত, তাহা হইলে কি হইত ভাব দেখি!

আলোকমঞ্চ হইতে একটী বড় ভাল উপদেশ পাই। সমুদ্রে চলিতে চলিতে যদি আলোকমঞ্চ না থাকিত তাহা হইলে যেমন অনেক জাহাজ নষ্ট হইত, সেইরূপ মানুষের জীবনে যদি একটী জিনিশ না থাকে, যাহাকে দেখিয়া সে চলিবে, তাহা হইলে মানুষ নিশ্চয়ই বিপদে পড়ে। সে জিনিশটী ধর্ম্ম। ধর্ম্মের দিকে যদি মানুষ না চাহিয়া চলে, তাহা হইলে তাহার বিপদ কে রাখে? আর যে ধর্ম্মকে চিনিয়া, চরিত্রকে ভাল রাখিয়া চলে, তাহার বিপদ হয় না। যদি জাহাজের লোক আলোকমঞ্চের আলোক থাকা সত্ত্বেও বিপদে পড়ে তবে সে দোষ জাহাজের লোকদিগের, আলোকের নহে; তেমনি যদি ধর্ম্ম থাকিতে তাহাকে না দেখিয়া চলিয়া মানুষ বিপদে পড়ে, তবে সে দোষ কাহার? বালক বালিকাগণ! সাবধান! বড় হইতেছ, সমুদ্রের মধ্যের পাহাড়ের ন্যায় অনেক বিপদাপদ আসিবে, কিন্তু যদি ধর্ম্মকে দেখিয়া, ধর্ম্মকে সহায় করিয়া চল, তবে কিসের ভয়?

---

## হেয়ার সাহেবের গল্প।

ত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া আসিয়াও হেয়ার সাহেব এদেশের উপকার করিয়া গেলেন, আর আমরা নিজের দেশে থাকিয়াও দেশের কোন উপকার করিতে পারি না কেন? ইহার কারণ এই যে হেয়ার সাহেবের চরিত্রে এমন সকল গুণ ছিল যাহা আমাদিগের নাই। মহাত্মা হেয়ার সকলকেই ভালবাসিতেন, এবং তাঁহার হৃদয় দয়াতে পূর্ণ ছিল। এই ভালবাসা ও এই দয়াতেই বাঙ্গালী তাঁহার বশ ছিল। আমরা হেয়ার সাহেবের যে সকল গল্প পড়িয়াছি বা শুনিয়াছি, তাহার গুটী কয়েক বলিলে আমাদের কথা বুঝা যাইবে।

১। হেয়ার সাহেব পীড়িত বালকদিগের বাটীতে যাইতেন, একথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। তাঁহার পাল্কীতে আবশ্যক মত প্রায় সমস্ত ঔষধ থাকিত। কেবল পীড়া হইলে চিকিৎসা করিতেন তাহা নহে; যাহাতে পীড়া না হইতে পারে তাহার জন্যও চেষ্টা করিতেন। হেয়ার সাহেব জানিতেন বালকদিগের অনেক পীড়াই অপরিষ্কার শরীরে থাকার জন্য হইয়া থাকে; এই জন্য তিনি প্রতি দিন তাঁহার স্কুল ছুটি হইবার পর এক খানা গামছা হাতে করিয়া দ্বারে দাঁড়াইয়া থাকিতেন, এবং বালকেরা বাড়ী যাইবার সময় এক এক করিয়া প্রত্যেকের গায়ের ধূলি মুছাইয়া দিতেন, এবং ঘসিয়া দেখিতেন গায়ে মলা আছে কি না। রাত্রি জাগিয়া যাত্রা ইত্যাদি শুনিলে শরীর, মন, দুয়েরই অপকার হইতে পারে, এই জন্য মহাত্মা হেয়ার কোথাও যাত্রা হইতেছে শুনিলে চুপি চুপি সেখানে গিয়া পরিচিত ছেলেদের ধরিয়া আনিতেন। এই ভালবাসাতেই ছেলেরা তাঁহার বশীভূত ছিল; এবং হেয়ার সাহেবের দিকে এই ভালবাসার টান ছিল বলিয়াই বাঙ্গালীর ছেলেরা তাঁহার নিকট অনেক শিক্ষা করিতে পারিয়াছে। যে বাড়ীতে হেয়ার সাহেব থাকিতেন, তাহা যেন বাঙ্গালীর বাড়ীর মত হইয়া উঠিয়াছিল। দলে দলে ছোট বড় বাঙ্গালীর ছেলে, হেয়ার সাহেবের বাড়ীতে ছুটোছুটি করিয়া ফিরিত—তাহাদের উৎপাত সহ্য করিতে সাহেবের কিছু মাত্র কষ্ট হইত না।

২। হেয়ার সাহেবের অসাধারণ দয়া ছিল। যদি শুনিতে পাইলেন কোন দরিদ্র বালক সঙ্গতি-অভাবে লেখা পড়া শিখিতে পারিতেছে না, তাহা হইলে অমনি তাহাকে ডাকিয়া আনিয়া অথবা তাহার বাড়ীতে গিয়া তাহার কিরূপ অবস্থা সেই বিষয়ে সম্বাদ লইতেন। যদি প্রকাশ পাইল যে বালকের অবস্থা ভাল নহে, তাহা হইলে হেয়ার সাহেবের দয়া উপস্থিত হইল, তিনি সেই বালকের বিদ্যালয়ের বেতন এবং পুস্তক প্রভৃতি যোগাইতে থাকিলেন। একবার আমাদের কার্য্যালয়ের নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে একটী বিধবা তাঁহার ছেলেকে লইয়া বাস করিতেন। বিধবার ইচ্ছা ছিল ছেলেকে লেখা পড়া শিখাইয়া মানুষ করেন, কিন্তু টাকা নাই বলিয়া তিনি সর্ব্বদা দুঃখ করিতেন। অবশেষে এক দিন তিনি তাঁহার ছেলেটিকে সঙ্গে করিয়া ঠন্‌ঠনিয়ার স্কুলে উপস্থিত হইলেন। হেয়ার সাহেব বিধবার অবস্থা জানিতে পারিয়া দুঃখিত হইলেন, কিন্তু যে শ্রেণীতে বালকটী পড়িতে পারে তাহাতে আর স্থান নাই বলিয়া বিধবার পুত্রকে ভর্ত্তি করিয়া লইতে পারিলেন না। বিধবাটী তাঁহার ছেলেকে লইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ঘরে গেলেন। হেয়ার সাহেব এই ক্রন্দন দেখিয়া বড়ই কষ্ট পাইলেন, এবং এক দিন বেড়াইতে বেড়াইতে বিধবার বিষয়ে ভালরূপ জানিবার জন্য সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বিধবা স্ত্রী-লোকটী শুনিতে পাইলেন হেয়ার সাহেব আসিয়াছেন; তখন তিনি ছেলেটীকে লইয়া সাহেবের নিকট আসিলেন। সাহেবের দিকে চাহিয়া তাঁহার দুই চক্ষু জলে ভাসিয়া যাইতে লাগিল, কোন কথা বলিবার সাধ্য হইল না। দয়ার সাগর হেয়ার এই ব্যাপার দেখিয়া এত দুঃখিত হইয়াছিলেন যে কেবল বালককে স্কুলে 'ভর্ত্তি' করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না; তাহার ও তাহার মাতার খরচের জন্যও নিজের টাকা হইতে সাহায্য করিতে লাগিলেন।

৩। বালকদিগের চরিত্রের দিকে মহাত্মা হেয়ারের বিলক্ষণ দৃষ্টি ছিল। পরস্পরের প্রতি কুৎসিত কথা ব্যবহার করিলে হেয়ার সাহেব বড়ই বিরক্ত হইতেন। যে সকল বালক কুৎসিত কথা ব্যবহার করিত, তাহাদিগকে শাস্তি দিতে শিক্ষকদিগকে বলিতেন, এবং সকল বালককে এ বিষয়ে সতর্ক করিয়া দিতেন। একবার একটী বড় লোকের ছেলে অপর একটী বালকের সহিত 'চটাচটি' করিয়া তাহার নামে অতি কুৎসিত একটী পদ্য লিখে; এবং সেইটী ছাপাইয়া প্রায় রাত্রি একটার সময় একবয়স্ক কয়েকজন বালকের সাহায্যে পটলডাঙ্গার স্কুলে (যাহা এখন 'হেয়ার স্কুল' এই নাম পাইয়াছে, তথায়) দেয়ালে মারিয়া দিতে আইসে। হেয়ার সাহেব কোন উপায়ে 'এই বড় লোকের ছেলে'র অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়াছিলেন। নিরপরাধী বালকের পাছে নিন্দা হয়, এই জন্য সেই ভয়ানক রাত্রিতে তিনি স্কুলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং কখন সেই ছেলেগুলি আসিবে তাহাই খুঁজিতে লাগিলেন। বৃষ্টি হইতেছিল, তাহাতে সাহেবের সমস্ত শরীর ভিজিয়া যাইতেছিল, কিন্তু সেদিকে তাঁহার চক্ষু নাই। একটী অসচ্চরিত্র বালককে খারাপ কাজ করিতে না দেওয়া এবং একটী সৎ বালকের নামে মিথ্যা দুর্ণাম হইতে না দেওয়া, এই দুই প্রয়োজনে হেয়ার সাহেব রাত্রিতে স্কুলে আসিলেন, এবং চুপি চুপি এক পাশে দাঁড়াইয়া রহিলেন। অবশেষে যখন সেই দুষ্ট 'বড় লোকের ছেলে' তাহার কুৎসিত পদ্যের কাগজ খানা দেয়ালে মারিয়া দিতে যাইতেছিল, তখন হেয়ার সাহেব জলে ভিজিয়া ভূতের মত সেইখানে উপস্থিত হইলেন। সাহেবকে দেখিয়া সকলেরই চক্ষু স্থির—দৌড়িয়া কে কোন্ দিকে পলাইবে তার স্থিরতা রহিল না!



হেয়ার সাহেবের দয়া ছোট, বড়, আপনার, পর, চিনিত না। যে দয়ার উপযুক্ত সেই দয়া পাইয়াছে, যে উৎসাহের উপযুক্ত, সেই উৎসাহ পাইয়াছে হেয়ারের কাছে গিয়া কেহ মুখ শুষ্ক করিয়া ঘরে ফিরে নাই।

৪। আহারের বিষয়ে হেয়ার সাহেব প্রায় হিন্দু ঋষিদিগের মত ছিলেন। মদ মাংস ভাল বাসিতেন না; গোদুগ্ধ, নারিকেল দুগ্ধ এবং ফল মূল, ইহাই তাঁহার প্রধান খাদ্য ছিল। অথচ তাঁহার গায়ে বিলক্ষণ বল ছিল। যাঁহারা বলেন সর্ব্বদা মাংস না খাইলে শরীরে বল হয় না, তাঁহারা ইহাতে বোধ হয় কিছু আশ্চর্য্য বোধ করিবেন। তাঁহার বলের দুটী দৃষ্টান্ত দিব। একবার একটী সাহেবের সহিত 'জিদ্' করিয়া হেয়ার সাহেব বারাকপুরে (কলিকাতা হইতে ৭ ক্রোশ উত্তরে) হাটিয়া যান, এবং বিশ্রাম না করিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আইসেন; ইহাতে তাঁহার বিশেষ কিছুই ক্লেশ হয় নাই। অন্য কেহ হয়ত এইরূপে ক্রমাগত ১৪ ক্রোশ পথ চলিলে দুদিন পায়ের বেদনায় পড়িয়া থাকিত, কিন্তু হেয়ার সাহেবের সবল শরীরে ইহাতে কোন অসুবিধা হয় নাই। আর একবার একজন মাতাল জাহাজীগোরা পটলডাঙ্গা স্কুলে আসিয়া ভয়ানক উপদ্রব করে; এক জন ধনীর ছেলের গাড়ী রাস্তায় ছিল, লাঠি দিয়া তাহা ভাঙ্গিয়া দেয়, এবং সইস্, কোচোয়ানকে মারিতে যায়। স্কুলের দ্বারবান অসুবিধা দেখিয়া ঘরে লুকাইল। মাতাল গোরা গাড়ী ভাঙ্গিয়া চূরমার করিয়া একদিকে চলিয়া যায়, এমন সময় হেয়ার সাহেবের পাল্কী দেখা দিল। দ্বারবানের নিকট ব্যাপার কি জানিতে পারিয়া, হেয়ার সাহেব সেই মাতালের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গেলেন, এবং ১০ মিনিটের মধ্যে তাহাকে ধরিয়া বাঁধিয়া পুলিসে দিলেন।

হেয়ার সাহেবের সম্বন্ধে আমরা অনেক গল্প শুনিয়াছি এবং পড়িয়াছি, কিন্তু আর অধিক বলিবার স্থান আমাদের নাই। একটী কথা বলিয়া আমরা শেষ করিব। হেয়ার সাহেব আমাদিগের জন্য যে এত চেষ্টা করিয়া গেলেন আমরা তাহার কি শোধ দিলাম? যদি তাঁহার প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত হয় তবে তাঁহার ছবি প্রস্তুত করিয়া ঘরে রাখিলেই কি হইবে? অথবা তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া স্কুল কালেজের সম্মুখে রাখিলেই চলিবে? যদি বাস্তবিক তাঁহাকে কৃতজ্ঞতা দেখাইতে চাই, তাহা হইলে তিনি যেরূপ সুশিক্ষিত, সচ্চরিত্র হইতে বলিয়া গিয়াছেন আইস সেইরূপ হই।

---

## ভীমের কপাল।

২য় অধ্যায়।

১২—সালের দুর্গা-বিসর্জ্জনের দিন যদি কেহ মধুডাঙ্গা ও গোপালপুরের মধ্যের রাস্তায় বেলা সাড়ে সাতটার সময় উপস্থিত হইতেন, তাহা হইলে দেখিতে পাইতেন, এক স্থানে কি একটা জিনিষ দেখিবার জন্য ছোট বড় পুরুষ মেয়ে চারিদিকে ঘিরে দাঁড়াইয়াছে। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সকলেই চুপ করিয়া দেখিতে লাগিল—কাহারও মুখেই কথা নাই। অবশেষে একজন বলিয়া উঠিল "ছোট বাবু, মিছে চেষ্টা; ছেলেটী বোধ হয় মারা পড়েছে।" যাঁহাকে এ কথা বলা হইল তিনি ভিড়ের মধ্যে বসিয়া একটী অজ্ঞান বালকের মূর্চ্ছা ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিতেছিলেন—সেই অজ্ঞান বালকের মস্তক তাঁহার ক্রোড়ে; চক্ষে জল; বালকের এই দুরবস্থা দেখিয়া তিনি 'হাউ' 'হাউ' করিয়া ক্রন্দন করিতেছেন, এবং মধ্যে মধ্যে ঔষধ সেবন করাইতেছেন। আহা! এই দয়াবান বাবুটী কে? ইনি গোপালপুরের নিকটবর্ত্তী সুজনখালীর মিত্রদের ছোট ছেলে, নাম দীনদয়াল মিত্র, বয়স ১৮ বৎসর মাত্র। ইনি মেডিকেল

কালেজে পড়িতেন বটে, কিন্তু হোমিওপেথী ঔষধে বড় বিশ্বাস; তাই সুযোগ পাইলেই হোমিওপেথী ঔষধ লইয়া গরিব দুঃখীদিগকে বিতরণ করিয়া বেড়াইতেন। দীনদয়াল বাবু পূজার ছুটীতে বাড়ী আসিয়াছেন, এখনও যান নাই। গ্রামস্থ পরিচিত বৃদ্ধের ওই কথাগুলি দীনদয়াল বাবুর হৃদয়ে বড় আঘাত করিল। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে দুটী তিনটী ঔষধ সেবন করাইলেন, তথাপি বালকের চৈতন্য নাই। আহা, কি দয়া! পরের ছেলে রাস্তায় পড়িয়া আছে শুনিয়া দীনদয়াল শত কাজ ফেলিয়া ঔষধের বাক্স লইয়া ছুটিয়া আসিয়াছেন এবং আরোগ্য করিতে পারিতেছেন না, 'আহা, কি হবে' এই ভাবিয়া কাঁদিয়া অস্থির! পাঠিকপাঠিকাগণ, যাহার সহিত পরিচয় নাই, তাহার কষ্ট দেখিলে কি তোমাদের এইরূপ দয়া হয়?

হঠাৎ এ কি? ওই যে সকলে 'ওই চোক খুলেছে' বলিয়া চীৎকার করিল?—দীনদয়াল বাবুর ঔষধ ও সেবার গুণে বালক চক্ষু মেলিল। "বিপিন, এখানেও তুমি আমার সঙ্গে এসেছ" বলিয়া বালক চারিদিকে চাহিল। পাঠকপাঠিকা! চিনিয়াছ বালকটী কে? এই আমাদের সেই ভীমেন্দ্র। কিন্তু ভীমেন্দ্রকে আর চেনা যায় না। চোখ কোটরগত—মুখ হল্‌দে বর্ণ, শরীর হাড়ময় বলিলেও হয়। ভীমেন্দ্র এখানে কি প্রকারে আসিল, তাহা ৩য় ও ৪র্থ অধ্যায়ে বলা যাইবে। চৈতন্য হইবার পূর্ব্বে ভীমেন্দ্র স্বপ্ন দেখিতেছিল যেন চারিদিক হইতে তাহাকে সাপে আক্রমণ করিয়াছে—সাপগুলি তাহার পায়ের মধ্যে, পেটের মধ্যে ঢুকিয়া যাইতেছে, টানিলেও বাহির হয় না তখন সে চীৎকার করিয়া ডাকিল 'বিপিন!' স্বপ্নে দেখিল যেন বিপিন আসিয়াছে, তাহার মস্তক কোলে লইয়া বসিয়াছে; অমনি সর্পগুলি বিপিনকে দেখিয়া পলাইয়া গেল। তখন সে আহ্লাদিত হইয়া বলিয়া উঠিল "এখানেও তুমি আমার সঙ্গে এসেছ?" দীনদয়াল বলিলেন "আমি বিপিন নই। তুমি কে? আচ্ছা থাক্, এখন তোমাকে বড় দুর্ব্বল বোধ হইতেছে; আমাদের বাড়ীতে চল সুস্থ হইলে সকল শুনিব।"—পাল্কী প্রস্তুত ছিল। দীনদয়ালের ইঙ্গিতে বেহারারা ভীমেন্দ্রকে তুলিয়া সুজনখালীরদিকে লইয়া চলিল। দীনদয়াল পাল্কীর পাশে হাটিয়া চলিলেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

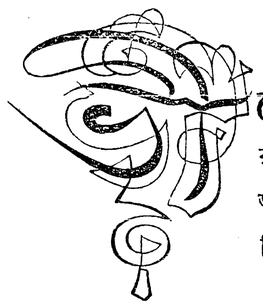

ভীমেন্দ্র বাহির হইল, কাহারও কথা শুনিল না; বৃষ্টির জলের সঙ্গে চক্ষের জল মিশাইয়া ভীমেন্দ্র ছুটিল। অন্ধকার; মধ্যে মধ্যে বিদ্যুৎ চমকিয়া অন্ধকারকে আরও ভয়ানক করিয়া তুলিতেছে, তখন ভীমেন্দ্র রাস্তায়। কি ভয়ানক রাগ! এরাগে কাহার ক্ষতি ভীমেন্দ্র তাহা বুঝিল না। মাতুলালয় ছাড়িয়া কতক দূরে গেলে ভীমেন্দ্র দেখিতে পাইল সম্মুখে একখানি কুড়ে ঘর। ভীমেন্দ্র অনেক বৃষ্টিতে ভিজিয়া এই কুড়ে ঘরে আশ্রয় লইল। ভীমেন্দ্র জানিত না এই কুড়ে ঘর কাহার, জানিলে হয়ত ঢুকিত না। সেই গ্রামে এই ঘরখানি 'মা শীতলার ঘর' বলিয়া বিখ্যাত—এক পাগল সেই ঘরে থাকিত, গ্রামবাসীরা ভয়ে কেহই সন্ধ্যার পরে ঐ ঘরে যাইত না। ভীমেন্দ্র এইখানে আশ্রয় লইল। ভীমেন্দ্র ভাবিতেছিল "কেন, পরমেশ্বর এ হতভাগা বাঙ্গালদের দেশে এসেছিলাম—এত কষ্টও কপালে ছিল। বিধাতার মনে এতও ছিল।" ভীমেন্দ্র! ভীমেন্দ্র! সাবধান তোমার সৃষ্টিকর্ত্তা পরমেশ্বরের নিন্দা করিও না; নিজের দুর্বুদ্ধির ফলভোগ করিয়া, ভগবানের উপর দোষ চাপাইবার চেষ্টা করিতেছ? মূর্খ তুমি!

ভীমেন্দ্র নিজের মনে বকিতে লাগিল—"এমন



হতভাগা দেশও থাকে? কেন আমার মামার বাড়ী এ দেশে হ'ল। কি অসভ্য, এক মুটো ক'রে নুন খায়—ভাতের মধ্যে চুল? চুলোয় যাক্। এইবার যদি মরি তবুও—" হঠাৎ কে গাইল:—

"কে জানে কার কপাল পোড়ে, ঝড় বাদলে ঘুরে ঘুরে ছিষ্টি নষ্ট কল্লে যত দুষ্টমতি যমের চরে।
আমার বাগান, আমার বাড়ী
আমার ঘোড়া আমার গাড়ী,
ভবের হাটের তাড়াতাড়ি,
দম্ভ দেখে প্রাণ শিহরে।
কোথা এল, কোথা যাবে,
এ ভবে কজন তা ভাবে,
অন্তিমে সব ধাক্কা খাবে,
ভবের নৌকায় যেতে পারে।"

ভীমেন্দ্র চুপ করিয়া শুনিল। এইবার তাহার ভয় হইল; দেখিল এক পাগল কুড়ে ঘরের দিকে আসিতেছে। ভীমেন্দ্র উঠিয়া ঘরের কোণে গেল। পাগল ঢুকিয়াই ভীমেন্দ্রকে দেখিতে পাইল এবং বলিল "বাবা চোর, আমার কাছে পরশু দিন এস,—সে দিন আমার শ্রাদ্ধ হবে, অনেক গরিব দুঃখীকে পয়সা দিব; পারত তাদের দলে মিশে যেও; এখন কি কর্ত্তে আগমন, প্রভু রঘুনাথ।" ভীমেন্দ্র ভয়েতে কাঁপিতেছিল; বৃষ্টিতে বাহির হওয়া ও কাঁপিবার একটা কারণ। কাঁপিতে কাঁপিতে কহিল "তুমি যেই হও, আমি চোর নই।" পাগল উত্তর করিল "চোর নও, তবে কাঁপছ কেন? এ কি সত্যি যুগ, যে তুমি যা বল্‌বে তাই মেনে নিতে হবে—কিন্তু, পুকুরের মধ্যে পড়্‌লে মাছে খেয়ে ফেলে দেবে, বেহালার কৃষ্ণধন ঘোষের মার মতন—কাঁপেন থর থর—তার কি?" ভীমেন্দ্র কোন কথা না বলিয়া ছুটিয়া পলাইয়া গেল। পাগল ধরিবার চেষ্টা করিল না, কেবল হাসিয়া বলিল "ওরে ইন্দুর, পাগলের ধন নষ্ট করা সিঙ্গির দাঁত নইলে হয় না, একি তামাসা না কি?" পাগলের বিশেষ পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই। এই পর্য্যন্ত বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে তিনি এক জন ধনী বণিক ছিলেন, কৃষ্ণধন ঘোষ নামে তাঁহার একজন সহযোগী ছিল। কৃষ্ণধনই সমস্ত কার্য্য করিত, পাগল এক এক বার দেখিয়া অবশিষ্ট সময় দান ধ্যানে কাটাইতেন। কৃষ্ণধন সমস্ত সম্পত্তি হরণ করিবার আশায় মাতার পরামর্শানুসারে সহকারীকে বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিয়া ঔষধ খাওয়াইয়া পাগল করিয়া দেয়। তদবধি তিনি পাগল।

ভীমেন্দ্র যখন বাহির হইল তখন ঝড় বৃষ্টি একটু কমিয়াছিল। কিন্তু তাহার মনে এত ভয় হইয়াছিল, যে সেই রাত্রিতে অধিক দূরে যাইতে সাহস হইল না—খানিক দূরে গিয়া একটা বট গাছের উপর রাত্রি কাটাইবার জন্য তাহাতে উঠিয়া বসিল। উঠিতে কত কষ্ট হইল, বুক, হাত ছিঁড়িয়া গেল; ভীমেন্দ্র অগ্রাহ্য করিয়া উঠিয়া গেল। সৌভাগ্য ক্রমে বটগাছের একটা ডাল এরূপ ভাবে বেঁকান ছিল যে তাহার উপর বসিয়া ভীমেন্দ্রের পড়িয়া যাইবার কোনও ভয় রহিল না। তখন সে সেই খানেই নিদ্রিত হইল।

রাত্রি প্রভাত হইল। পাখীগুলি অনেকক্ষণ ঝড় বৃষ্টিতে কাতর রব করিয়াছিল; সম্প্রতি সূর্য্যের লালবর্ণ আলোক দেখিয়া আনন্দে গান করিতে লাগিল। ভীমেন্দ্র জাগরিত হইয়া চক্ষু মেলিল কিন্তু উঠিয়া দেখিল সমস্ত শরীর বেদনাতে পূর্ণ। গাছ হইতে নামিয়া ভীমেন্দ্র পথ চলিতে লাগিল; কিন্তু বালক রাগ করিয়া কতদূর চলিতে পারে। যে স্থানে ভীমেন্দ্র উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার নিকটেই একটি নদী, নাম বেগবতী। ভীমেন্দ্র মনে ভাবিল এই নদী পার না হইতে পারিলে মাতুলালয় হইতে লোক আসিবে। ভীমেন্দ্র নদী পার হইবার জন্য বসিয়া রহিল—ক্ষেয়া নৌকা ওপারে ছিল। ভীমেন্দ্র বসিয়া ভাবিতে লাগিল "আজ কোথায় যাই? এখান থেকে কলিকাতা

কত দূর! কি করে যাই? তাইতো, রাগ না কর্‌লেও হ'ত। যাক্, ওসব আর ভেবে কি হবে—যদি ফিরে যাই, আবার সেই কষ্ট, আবার সেই রকম কাণ-জ্বালানে কথা! আর যাই বা কোন মুখে? মামা এমন ভাল বাসেন তাঁর হাত ছাড়িয়ে যখন চলে এসেছি, তখন আবার কি বলে তাঁর কাছে গিয়ে একটু থাকবার যায়গা ভিক্ষা চাহিব?" এইরূপে ভীমেন্দ্র নিজের মনকে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু মন সহজে বুঝিতে চাহিল না। কিসে যেন মনের ভিতর ডাকিয়া বলিতে লাগিল "ভীমেন্দ্র,—তোমার এ ব্যবহারে তোমার মামার বাড়ীর সকলে মনে ক্লেশ পাইতেছেন—তোমাদের বাড়ী যখন সংবাদ যাইবে তখন তোমার বিধবা মা কষ্ট পাইবেন। আর ঈশ্বর তোমার উপর অসন্তুষ্ট হইবেন।" ভীমেন্দ্র শুনিয়াও শুনিল না, বুঝিয়াও বুঝিল না; ক্ষেয়া নৌকা ঘাটে আসিয়াছিল, অন্যমনস্ক ভাবে তাহাতে গিয়া উঠিল। পাটনী পার করিয়া সকলের কাছে পয়সা চাহিল। সকলেই পয়সা দিল, ভীমেন্দ্র পয়সা কোথায় পাইবে? পাটনী জিজ্ঞাসা করিল তোমার পয়সা কই?

ভীমেন্দ্র। আমার পয়সা নাই। আর এখানে যে পয়সা লাগে তা আমি জানিতাম না।

পাটনী।—তিলকরাম পাটনী সকলের কাছেই একটা করিয়া পার করিবার পয়সা লয়!—এখন তুমি পয়সাটী ফেলে যেখানে খুসী সেখানে যাও।

ভীমেন্দ্র কিছু রাগান্বিত হইয়া বলিল "আমার কাছে পয়সা নাই বল্‌ছি—তবুও পয়সা দাও? এ জামাটা নিলে যদি হয়, তবে নিতে পার। আমার কাছে পয়সা নাই বল্‌ছি, আমি কি মিথ্যা কথা বল্‌ছি? অবিশ্বাস কর্‌ছো, ভারী ছোট লোকতো?" পাটনী সহজে ছাড়িবার লোক নয়, আকাশে গলা চড়াইয়া বলিল 'কি? পয়সা দেবেনা আবার উল্‌টে ছোট লোক? তোমার জামা নিয়ে কে গোলে পড়বে বাপু? আমি ও সব বুঝি না। এখন যদি মঙ্গল চাও যেখান থেকে পার পয়সা এনে দাও; নইলে—" পাটনী আর অধিক বলিল না—যা হউক, সমুদায় কথা বলা শেষ না হইলেও চারি ধারের লোক সকলেই তাহার মুষ্টি বদ্ধ দেখিয়া মতলব বুঝিতে পারিল।—ভীমেন্দ্র রাগে কাঁপিতে লাগিল কিন্তু হঠাৎ কিছুই বলিল না। একজন সদয় দর্শক বলিল "তিলকরাম, দেখ্‌ছো ছেলে মানুষ পয়সা সঙ্গে নাই ওকে ছেড়ে দাও।"—পাটনী তেলে বেগুণে জ্বলিয়া উঠিল—বলিল "ওর পয়সাটী তুমিই দাওনা কেন—যদি এত দয়া হয়ে থাকে?" তিলকরাম এই কথা বলিয়া ক্ষেয়া নৌকা ঘাটে বাঁধিল এবং ভীমের দুই হাত খুব জোরে ধরিয়া জমীদারের কাছারীতে লইয়া গেল।

(ক্রমশঃ)

---

## বিবিধ প্রসঙ্গ।

**পরীক্ষার ফল।**—এবার এণ্ট্রান্স ও এলে পরীক্ষার ফল বড় ভাল হয় নাই; প্রথমটীতে ১৪৫৮ জন এবং দ্বিতীয়টীতে ৪৪৬ মাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছেন। এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় চারিটী ইংরাজ কন্যা এবং দুটী মাত্র বাঙ্গালীর কন্যা, সব শুদ্ধ ছয়টী মহিলা উত্তীর্ণ হইয়াছেন। এলে পরীক্ষায় মহিলা এক জনও উত্তীর্ণ হন নাই। আমরা শুনিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম এবার দুটি মহিলা বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। বালক ও যুবকদিগের ন্যায় বালিকা ও মহিলাগণ যত অধিক লেখা পড়ার চর্চ্চা করিবেন, ততই দেশের মঙ্গল হইবে তাহাতে সন্দেহ কি?

আমার সাধের বিড়াল—২৭ পৃষ্ঠা

**গো-দুগ্ধ।**—পৃথিবীর প্রধান প্রধান ডাক্তারগণ স্থির করিয়াছেন যে গোদুগ্ধই মনুষ্যের সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম খাদ্য। শরীর ভাল রাখিতে যে যে দ্রব্যের প্রয়োজন, গোদুগ্ধে সে সমস্ত দ্রব্যই রহিয়াছে। যাঁহাদিগকে অতিরিক্ত শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম করিতে হয়, গোদুগ্ধ তাঁহাদের একমাত্র খাদ্য হওয়া উচিত। যাঁহারা মাংস ভাল বাসেন তাঁহারা বোধ হয় জানেন না যে গোদুগ্ধ মাংসের অপেক্ষা কোনমতে কম পুষ্টিকর নহে।

**ভয়ানক মৃত্যু।**—আমরা শুনিলাম কিছুকাল হইল আমেরিকাতে একজন লোকের বড় ভয়ানক মৃত্যু ঘটিয়াছে। একজন লোক তথাকার একটী গাছের রস পান করিয়াছিল, সে গাছের রস তৃষ্ণার সময় খাইলে জলের কার্য্য করে। খানিকক্ষণ পরে একটা শুঁড়ির দোকানে গিয়া খানিকটা মদও খায়। তখন তাহার ভয়ানক যন্ত্রণা হইতে লাগিল এবং এই যন্ত্রণাতেই সে মরিয়া গেল। ডাক্তারেরা পেট চিরিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে তাহার নাড়ি ভুঁড়ি রবারে জড়াইয়া গিয়াছে। মদের সহিত সেই গাছের রস মিশিলে যে জমিয়া রবারের মত হইয়া যায়, বোধ হয় লোকটীর তাহা জানা ছিল না। যাহা হউক মদ খাইয়াই লোকটীর মৃত্যু হইল, বলিতে হইবে। কি সাধে যে লোকে মদ খায় তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না।

**কুকুর-নাশ।**—আমরা সে দিন কলিকাতার একটী বড় রাস্তায় এক ভয়ানক কাণ্ড দেখিয়া শিহরিয়া উঠিয়াছি। কতকগুলি 'ধাঙ্গড়' প্রকাণ্ড লাঠি হাতে করিয়া রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়ায়, এবং দেশী কুকুর দেখিলে তাহার মাথায় লাঠি মারে। এই ভয়ানক ঘা খাইয়া যখন কুকুরটী ছট্‌ফট্‌ করিয়া মাটীতে পড়িয়া যায়, তখন এই ধাঙ্গড়েরা ধারাল ছুরি দিয়া তাহার মাথা কাটিয়া লয়। আমরা শুনিলাম তাহারা এই জন্য পুরস্কার পায়। সে দিন এইরূপ একটী কাণ্ড দেখিয়াছি, কিন্তু তাহার কথা লিখিতেও ক্লেশ বোধ হয় বলিয়া কিছুই লিখিব না। শুনিলাম এই কুকুরগুলি ক্ষেপিয়া গিয়া মানুষকে কামড়ায়, এই জন্য ইহাদিগকে মারিয়া ফেলিবার নিয়ম করা হইয়াছে। তবে যে সকল কুকুরের গলায় শিক্‌লির দাগ, 'কালার' বা অন্য কোন চিহ্ন আছে (যাহাতে তাহাদিগকে কোন বাড়ীর কুকুর বলিয়া চেনা যায়) তাহাদিগকে মারা হয় না। ইহাতে আমরা এই বুঝি যে যে কুকুরের বাড়ী ঘর নাই তাহাকেই মারা হয়। রৌদ্রে বৃষ্টিতে ঘুরিয়া, আহার অভাবে খারাপ জিনিশ খাইয়া এই সকল কুকুর ক্ষেপিয়া যায়। আহা! যে কুকুরকে পরমেশ্বর মানুষের সঙ্গী করিয়া, মানুষের এত বাধ্য, এত অনুগত করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাকে এইরূপে মরিতে দেখিলে কাহার না কষ্ট হয়? আমাদের পাঠকগণ কি দয়া করিয়া এক এক জন পাড়ার এক একটী কুকুরকে একটু স্থান দিয়া, একমুষ্টি খাবার দিয়া, তাহার গলায় একটা ফিতা পরাইয়া দিতে পারেন না? তাহা হইলেইতো বেচারা কুকুরগুলি বাঁচিয়া যায়? গবর্ণমেণ্টকেও বলি যে দুর্ভাগা কুকুরদিগকে যদি মারিতেই হয়, তাহা হইলে কি তাহাদিগকে চক্ষের আড়ালে, কসাইখানা কি অন্য যায়গায় লইয়া গিয়া মারিলে হয় না?

**নৈতিক বিদ্যালয়।**—প্রায় তিন বৎসর হইল কলিকাতায় একটী নৈতিক বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। প্রত্যেক রবিবার সিটীস্কুলের বাড়ীতে বেলা ৪টার সময় এই বিদ্যালয়টী বসিয়া থাকে। বালকদিগকে ভাল ভাল উপদেশ দেওয়া এই বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য। আমরা জানি এই খানে বালকদিগকে সুন্দর সুন্দর পদ্য মুখস্থ করান হয় এবং যাঁহারা গান গাহিতে জানেন তাঁহাদিগকে সুন্দর সুন্দর গান শেখান হয়। যে সকল বালক এই বিদ্যালয়ে আসিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা আপন আপন পিতামাতাকে বলিয়া এখানে আসিলেই তাঁহাদিগকে ভর্ত্তি করিয়া লওয়া হইবে। ৪৫ নং বেনেটোলা লেনে বাবু শশিভূষণ বসু অথবা সিটীস্কুলে বাবু প্রমদাচরণ সেনের নিকট আসিলেই এই বিদ্যালয় সম্বন্ধে সমস্ত বিষয় জানা যাইতে পারে। আমরা আশা করি প্রত্যেক অভিভাবকই আপন আপন বালককে এই বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া দিবেন। আমরা ভবিষ্যতে এই বিদ্যালয়ের সম্বন্ধে আরও অনেক কথা পাঠকদিগকে বলিব।

**মুক্তি-ফৌজ।**—'ফৌজ' এই নাম শুনিলেই আমাদিগের ভয় হয়, মারামারি কাটাকাটির কথা মনে পড়িয়া যায়; কিন্তু 'মুক্তিফৌজ' নামে যে একদল ইংরাজ সম্প্রতি কলিকাতায় আসিয়াছেন, তাঁহাদের চরিত্রে মারামারির নাম গন্ধও নাই। যদি তাঁহাদের কোনরূপ যুদ্ধ করিবার থাকে, তবে তাহা পাপের সহিত, অসৎ চরিত্রের সহিত। এই দলের সাহেব বিবিরা হিন্দুস্থানীদিগের মত পোষাক পরেন, এবং দেশের সকল স্থানে খ্রীষ্টান ধর্ম্ম প্রচার করিয়া বেড়ান। প্রায় ১৭।১৮বৎসর হইল উইলিয়ম বুথ্‌ নামক একজন সাহেব এই দল স্থাপন করেন; সেই অবধি ইহাঁরা যে ইংলণ্ডের কত উপকার করিয়াছেন বলিয়া উঠা যায় না। আমরা কয়েকদিন ইহাঁদিগের উপদেশ শুনিতে গিয়াছি। ইহাঁদের দলের কর্ত্তা টকার সাহেবের স্ত্রী বিবি টকার অতি সুন্দর বক্তৃতা করেন। ওরূপ ভাবের সহিত বক্তৃতা করা আমরা অতি অল্পই শুনিয়াছি। আর একটী আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যে স্ত্রীলোকের স্বভাবতঃ লজ্জা এবং ভয় অধিক, তাঁহাদেরই মধ্যে একজন হাজার হাজার পুরুষের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ধর্ম্মের কথা বলিলেন! পাঠক-পাঠিকাদিগের মধ্যে কয়জন এরূপ সৎকার্য্যে সাহস দেখাইতে পারেন?

**ব্লুরিবন** বা নীলফিতাধারী সৈন্য দল।—ইংলণ্ড ও আমেরিকাতে 'নীলফিতাধারী সৈন্যদল' এই নামে একদল লোক আছেন; তাঁহারা নিজে মদ্যপান করেন না, এবং যত দূর সম্ভব আর কাহাকেও মদ্যপান করিতে দেন না, ইহাই তাঁহাদিগের কার্য্য। এই দলের চিহ্ন নীল ফিতা। ইংলণ্ডে এই সৈন্যদলের দ্বারা অনেক কাজ হইয়াছে; সম্প্রতি কয়েক জন ইংরাজের উদ্যোগে আমাদের দেশে এইরূপ একটী দল প্রস্তুত করিবার চেষ্টা হইতেছে। ইতিমধ্যে এই সম্বন্ধে দুটী সভা হইয়া গিয়াছে, তাহার শেষেরটীতে আমরা উপস্থিত ছিলাম। কয়েক জন সাহেব এবং আমাদের দেশের দুটী প্রধান লোক এই উপলক্ষে বক্তৃতা করেন। আমরা দেখিলাম বক্তৃতার পর আমাদিগের মধ্যে অনেকেই প্রতিজ্ঞাপত্রে নাম স্বাক্ষর করিয়া নীলফিতা লইয়াছেন। আমাদিগকে এই সম্বন্ধে ইহার পর অনেক বলিতে হইবে, সুতরাং এখন আর অধিক কিছু বলিব না। এইরূপ সভা গ্রামে গ্রামে, পাড়ায় পাড়ায় হইলে মঙ্গল।

---

## আমার সাধের বিড়াল!

**সাধের** বিড়াল মম আয় কোলে আয়!
'মিউ' 'মিউ' ডাক ছেড়ে মহাসুখে উঠে পড়ে,
ধীরে ধীরে লেজ নেড়ে আয় পায় পায়!
দেখিয়ে শরীর তব নয়ন জুড়ায়।

তোরে ভালবেসে মনে সুখ হয় কত!
এ ঘরের লোক হয়ে, থাক্‌ 'দলবল' লয়ে—
'ছেলেপিলে' ডেকে আন্‌, আছে তোর যত—
বেড়া ছুটে, খেলা কর্‌ নিজ মন মত।

কেমন শরীর আহা ধব্‌ধব্‌ করে,
কাল কাল মিশি তায়, মরি কিবা শোভা পায়!
চিকণ কেশের শোভা কি বাহার ধরে।
কোমল চরণ যেন আরামের তরে!

বড় ভালবাসি তোরে সাধের বিড়াল!
কাছে এলে কোলে করি কত সুখ, হয় মরি!
তোমারি কারণে দূরেই দুরের প্রাল।
দুধ দিয়ে তাই তোরে পুষি চিরকাল।

কিন্তু বড় দুঃখ মনে, লোকে দেয় গালি
"বিড়াল লোভীর শেষ, নাহি বোঝে কাল দেশ,
আপন উদর সার—এই ভাবে খালি!
খেদাও এমন জীবে মুখে দিয়ে কালী"

বোবা তুমি আহা মরি! নহিলে এখন
দাঁড়াইয়া, উচ্চস্বরে ডাক দিতে নারী নরে—
করিতে তোমার এই কলঙ্ক ভঞ্জন।
হেন অপবাদ কেবা সহে অকারণ!

আমি জানি এ দুর্নাম কি হেতু তোমার।
মানুষের অত্যাচারে মর তুমি অনাহারে,
ক্ষুধার বেলায় তাই না থাকে বিচার!
কেন মিথ্যা নিন্দা তবে হয় বারে বার?

উদর ভরিয়া খেতে দেয় কত জনা?
কষ্ট দেয় ঘরে পুরি, তাই তুমি কর চুরি--
পেটের জ্বালায় দোষী! তবে এ গঞ্জনা
কেন দেয় সবে মিলে? কেন এ লাঞ্ছনা?

আমার মতন সবে ওহে শিশুগণ!
যত্নকর বিড়ালেরে—দেখ সে কি চুরি করে?
ভাল বাসে কি না বাসে আত্মীয় মতন!
কে কোথা রতন লভে বিনা সুযতন?

আমারি বিড়াল তুমি আমারি রহিবে—
উঠিয়া আমারি কোলে—ঘুমাইবে ঘুম পেলে
ভয় পেলে পাশে আসি ছুটে লুকাইবে
আমারি ঘরেতে সুখে জীবন যাপিবে।

---

## মাছি।

**বিলেও** বুঝিতে পার কি, এটী একটী মাছি? অনুবীক্ষণ নামে এক রূপ যন্ত্র আছে তাহার তলায় ছোট জিনিষও খুব বড় দেখায়; সেই যন্ত্রের তলায় মাছিকে যেরূপ দেখায় ছবিটি সেইরূপে আঁকা হইয়াছে। মাছির নাম শুনিয়া অনেকে হয়ত মনে মনে বলিতেছেন "মাছি তো মাছি; দুর্গন্ধ ময়লা যায়গায় থাকে, দেখিলে ঘৃণা হয়। ভিন্ ভিন্ করিয়া আসিয়া গায় বসে, বার বার হাত যোড় করে, আর মুখ হইতে শুঁড়ের মত একটা কি বাহির করিয়া চাটিতে থাকে। ছি!"

মাছিগুলিকে কেহ দেখিতে পারে না; সকলেই দূর দূর করে। যেখানে ময়লা যত বেশী সেখানে মাছি তত বেশী; মাছি গুলি যেন পরিষ্কার যায়গায় থাকাটাকে পাপ মনে করে। কিন্তু এক একটা অপরিষ্কার ছেলে মাছির চেয়েও খারাপ। তবে ভাই, মাছিগুলিকে তোমরা এত ঘৃণা করিবে কেন? ঈশ্বরের আশ্চর্য্য ক্ষমতা মাছির মধ্যেও দেখিতে পাই।

ছবির দিকে চাহিয়া দেখিলে দেখিবে যে মাছির গায়ের দুই স্থান খুব সরু। শরীরটি তিন ভাগে রহিয়াছে। প্রথম ভাগে মাথা, তার পর বুক, পা, পাখা ইত্যাদি, শেষ উদর। বুকে পা; কেমন তামাসা! তোমার আমার মুখ দাঁতে ভরা কিন্তু মাছির দাঁত নাই। দাঁতের আবশ্যকও নাই। যে খানে যে টুকু রস, তাহাই মাছির আহার, মাছি শক্ত জিনিশ খায় না। শক্ত কিছু খাইতে হইলে আগে তাহা মুখের লাল দিয়া গলাইয়া নেয়। মুখে শুঁড়ের মতন যাহা দেখিয়াছ তাহা রস টানিবার যন্ত্র। এক একটা মাছির যত গুলি চোখ হাজার জনের চোখ একত্র করিলে তত গুলি হয় না। আপাততঃ দুটী চোখ বলিয়া বোধ হয় কিন্তু ইহার প্রত্যেকটী বহু বহু শত চক্ষু একত্র করিয়া হইয়াছে। অণুবীক্ষণে দেখিতে পারিলে মৌচাকের মত দেখিতে। আহার খুঁজিতে মাছিকে অনেক বার ধূলা বালির মধ্যে যাইতে হয় এজন্য ঈশ্বর দয়া করিয়া চক্ষের উপর এক খানি আবরণ দিয়া দিয়াছেন।

মাছির পায়ের অগ্রভাগে ছোট ছোট দুইটী আঙ্গুলের মত বাহির হইয়াছে, তাহার প্রত্যেকটীর পাশ দিয়া একটী নখ। এই নখের চারিদিকে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কতগুলি পদার্থ আছে, দেখিতে লোমের ন্যায়। কত পণ্ডিত কত কথা বলিলেন কিন্তু মাছির পায়ের এই সমস্ত জিনিশ দিয়া কি হয় তাহা আজিও ঠিক হইল না। মাছিগুলি ইচ্ছামত যেখানে সেখানে বসিয়া থাকিতে পারে, আমাদের মত গড়াইয়া পড়িয়া যায় না। অনেকে বলেন মাছির পায়ের আঙ্গুল দুটি ইহার কারণ। মাছি যে জিনিশের উপর বসে, তাহার পায়ের আঙ্গুল গুলি তাহাতে জোঁকের মত চুমুক দিয়া লাগিয়া থাকে। আর কেহ কেহ বলেন যে আঙ্গুল দুটি ছোট ছোট দুটি থলে; তাহার ভিতরে এক প্রকার আঠা আছে, তাহাতে মাছির পা সমস্ত জিনিশের উপর লাগিয়া থাকিতে পারে। আর এক দলের পণ্ডিতেরা ইহার কিছুই বলেন না। তাঁহাদের মতে নখের চারিধারে লোমের মত যাহা আছে, তাহাই



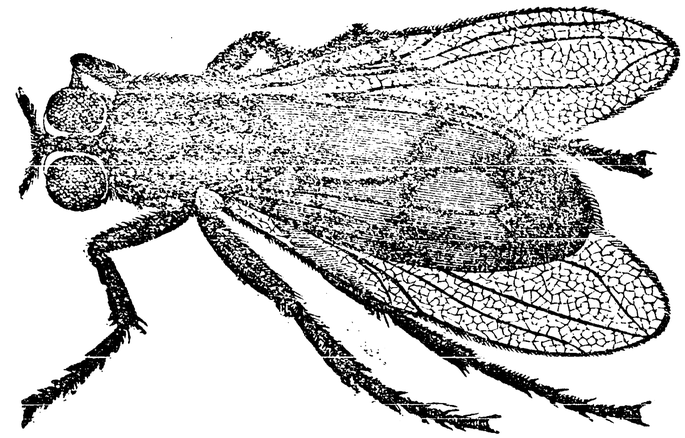

মাছির যেখানে সেখানে বসিয়া থাকিবার কারণ। মাছির ঠ্যাঙ্গে অনেকগুলি লোম রহিয়াছে, তাহা দ্বারা গা আচড়াইয়া পরিষ্কার রাখে। অপরিষ্কার যায়গায় থাকে বলিয়া নিজে অপরিষ্কার নয়।

মাছির পাখা অতি হাল্কা, অথচ খুব শক্ত। এরূপ পদার্থ আর নাই বলিলেও অপরাধ হয় না। পাখার মধ্যে যে সকল শিরার মত রহিয়াছে, সেগুলি ফাপা। নিশ্বাস তুলিবার সময় তাহাদের মধ্যে বাতাস যায়। ফলতঃ পাখাগুলির দ্বারা নিশ্বাস প্রশ্বাসের সুবিধা হয়। মাছি উড়িবার সময় যে শব্দ শুনা যায় সে তাহার পাখার। পাখা গুলি এক সেকেণ্ডে প্রায় ৭০০ বার কাঁপে; ইহাতে এই শব্দ হয়।

মাছির নিকট আমরা কি কি শিক্ষা করিতে পারি তাহার সম্বন্ধে এক সাহেব যাহা বলিয়াছেন, তাহা বলিয়া আমরা মাছির কথা শেষ করিব।

মাছি ক্ষুদ্র জীব তথাপি তাহার শরীরে যে সকল আশ্চর্য্য জিনিশ রহিয়াছে তোমার আমার শরীরে তাহা অপেক্ষা অধিক নাই।

না ভাবিয়া কাজ করার বড় বিপদ। মাছিগুলি খাইবার কিছু দেখিলে বুদ্ধিহীন হইয়া যায়; দুধের বাটীতে যত মাছি উড়িয়া পড়িয়াছে, তাহার কয়টা উঠিয়া যাইতে দেখিয়াছ?

একটুকু অনিষ্টে দশজনের ক্ষতি হয়। মাছি দুধের বাটীতে পড়িয়া মরিল; ক্ষুধা তো তাহার গেলই না; তুমিও দুধ টুকু খাইতে পারিলে না।

সামান্য পাপে ও মহা অনিষ্ট হয়। মাছি অতি অকিঞ্চিৎকর জিনিশ; কিন্তু একটী মাছি পড়িয়া মহামূল্য ঔষধ অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়।

---

## বাবুগিরি।

স্বর্ণ বড় ভাল মেয়ে—আমাদের এক ক্লাশে পড়িত! সকলেই তাহাকে ভাল বাসিত, কিন্তু আমি তাহাকে ভালবাসিতে পারিলাম না। সকলেই বলিত "স্বর্ণ বেশ মেয়েটী! বাবুগিরি কাহাকে বলে তাহা জানে না; যা দাও তাই খায়, যা পায় তাই পরে—বেশ!" আর আমার কথা উঠিলেই পাড়ার গৃহিণীরা নাক মুখ সিট্‌কে বলিতেন "প্রতিভার সকলি আশ্চর্য্য—পরিষ্কার কাপড় নইলে পরা হয় না। কোনও যায়গায় বসিতে বলিলে চারিদিকে মিট্ মিট্ করে তাকান হয়—বেছে বেছে জিনিশ খাওয়া হয়—ছিঃ!!" স্বর্ণকে সকলে ভাল বাসিতেন, তাহাতে আমার দুঃখ হইত না, কিন্তু কেন তাহাকে ভালবাসা হইত, তাহা আমি বুঝিতে পারি নাই। বাবুগিরি স্বর্ণের ছিল কিনা, তাহা আমি জানিনা, তবে স্বর্ণকে কখনও পরি-

স্কার কাপড় পরিতে দেখি নাই। বাড়ীতে, স্কুলে, নিমন্ত্রণের যায়গায়, সকল যায়গাতেই নোংরা কাপড় দেখিয়া স্বর্ণকে চিনিয়া লওয়া যাইত। আর গরিব প্রতিভার অপরাধের মধ্যে পরিষ্কার থাকিত, যাহা খাইলে অসুখ হইতে পারে, তাহা খাইত না, এই জন্য পাড়ার গৃহিণীরা ভারী বিরক্ত ছিলেন, এখনও বিরক্ত আছেন কি জানি না। পরিষ্কার থাকাই কি বাবুগিরি? নোংরা থাকাই কি ভাল মানুষের লক্ষণ? আমি সর্ব্বদা পরিষ্কার কাপড় পরিতাম—কাপড় অপরিষ্কার হইলে নিজ হাতে পরিষ্কার করিয়া লইতাম—খারাব জিনিশ খাইলে অসুখ হইবে বলিয়া লোকের অনুরোধে উপরোধেও খারাব জিনিশ খাই নাই, এই অপরাধে আমাকে সকলে গালাগালি দিতেন, আর স্বর্ণ কুড়েমি করিয়া নিজের কাপড় নোংরা করিয়া রাখিত, আর পেটুকের মত কাঁচা কুল, কাঁচা কলাই, তেতুল, আর ছাইপাঁশ খাইয়া অসুখ করিয়া বসিত, তখন সকলে তাহার ব্যথায় ব্যথিত হইয়া দুঃখ করিতেন। "প্রতিভা বাবু, স্বর্ণ ভাল" এই কথা সকলেরই মুখে শুনা যাইত। স্বর্ণ অপরিষ্কার শরীর লইয়া ভুগিয়া ভুগিয়া আজও সারা হইতেছে, আর আমার শরীর আজও বেশ সুস্থ। তবুও আমি লোকের নিকট বাবু, বড়লোক, জেঁকো এই সকল নাম পাইয়াছি। পরিষ্কার থাকিয়া শরীর ভাল রাখিলেই কি বাবুগিরি করা হয়? দোহাই পাঠক-পাঠিকাগণের! তোমরাই বিচার কর।

---

## পত্র প্রেরকদিগের প্রতি।

আমরা এবার নানা স্থান হইতে নানারূপ পত্র, রচনা ইত্যাদি পাইয়াছি। ইহার মধ্যে কতগুলি ভাল নয় বলিয়া এবং কতগুলি স্থানাভাব বলিয়া প্রকাশিত হইল না। এক খানি পত্র এইবার প্রকাশিত হইল।

'নাক হাতে করিয়া যায় কে?' এই প্রশ্নের কতকগুলি বড় আশ্চর্য্য উত্তর পাওয়া গিয়াছে! কেহ বলেন শর্দ্দিওয়ালা লোক! কেহ বলেন বুড়ো ধার্ম্মিক ভট্টাচার্য্য! কেহ বলেন যেখানে বড় দুর্গন্ধ!!

---

## প্রাপ্ত।

[ আমরা একটী বালকের নিকট হইতে নিম্ন লিখিত পত্র খানি পাইয়াছি। 'সখা' পাঠ করিয়া কোন বালক আহ্লাদিত হইয়া আমাদিগকে এরূপ পত্র লিখিবেন, আমরা তাহা ভাবি নাই এই জন্য আমরা বড়ই সুখী হইয়াছি। এস্থলে বলা উচিত যে পত্রের ভাষা অনেক যায়গায় বদলাইয়া দেওয়া গিয়াছে। ]

---

## বালকবালিকাদিগের প্রতি।

প্রিয় ভাই ভগ্নীগণ! আমার স্নেহ ও বন্ধুভাব গ্রহণ কর। মনে আজ বড় আনন্দ হইতেছে তাই প্রিয় 'সখা'র সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের নিকটে আসিলাম, তোমরা কি বুঝিতে পার কেন এ আনন্দ?

রাত্রি প্রভাত হইল, সূর্য্যকে দেখিয়া ধীরে ধীরে অন্ধকার চলিয়া গেল, অল্প অল্প বাতাস জানালা দিয়া বহিতে লাগিল, পাখীগুলি দলে দলে গান করিতে করিতে আকাশে উড়িল; পাতায় পাতায় ঢাকা গোলাপ কলি গুলি অল্পে অল্পে ফুটিয়া যেন উঁকি মারিতে লাগিল। সকলেই আনন্দ করিতেছে। আমারও ইচ্ছা হইতেছে আজ সকলকে গিয়া ডাকিয়া বলি "ভাই ভগ্নীগণ! উঠ! কেন আনন্দ করি দেখ! ঐ দেখ আমাদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইয়া 'সখা' আজ একমাস পরে আবার দেখা দিতেছেন। মানসিক ও নৈতিক উন্নতির জন্য উপদেশ এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে নির্দ্দোষ



আমোদ যোগাইবার মতন সঙ্গী যে কেহ ছিলনা; প্রিয় 'সখা' যে সেই দুর্দ্দশা দূর করিতে বাহির হইয়াছিলেন; ওই দেখ একমাস পরে তিনি আবার দেখা দিলেন। আমাদের মঙ্গলই তাঁহার লক্ষ্য, এই জন্যই তাঁহার প্রাণপণ চেষ্টা; তবুও কি তাঁহাকে সঙ্গের সঙ্গী করিবে না?

প্রিয় ভাই ভগ্নীগণ! বন্ধুকে কি ভালবাসনা? যাহাকে ভালবাস তাহাকে কি দেখিতে ইচ্ছা হয় না? যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে আশা করি এবং বিশ্বাস করি যে, যে প্রিয় 'সখা' সকল সময় তোমাদের সঙ্গী হইতে ইচ্ছুক, তাঁহাকে অযত্ন করিবে না। আশা করি প্রতি মাসে তোমরা তাঁহাকে আদরে গ্রহণ করিবে। আজ মনের আনন্দে তোমাদিগকে মনের আশা জানাইলাম; আশায় বঞ্চিত না হইলে বড়ই সুখী হইব।

শ্রীঃ—

---

## বালক বালিকাদিগের পাঠ্য পুস্তক।

নীতি-কুসুম প্রথম ভাগ। শ্রীভবনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। আমরা এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া সুখী হইয়াছি। ভবনাথ বাবু রয়েল রিডার প্রভৃতি পুস্তক এবং প্রোগ্রেস প্রভৃতি পত্রিকা হইতে অতি সুন্দর সুন্দর অনেক গল্প সংগ্রহ করিয়া এই পুস্তকে দিয়াছেন, গল্পগুলি উপদেশে পোরা; এই জন্য এই পুস্তক খানি সকল বালক বালিকারই পড়া উচিত। পুস্তকের মূল্যও খুব কম, - তিন আনা মাত্র।

---

## বিশেষ বিজ্ঞাপন।

'সখা' পত্রিকা দেশ মধ্যে যাহাতে সর্ব্বত্র প্রচারিত হয়, তাহার জন্য সমুদায় স্থলেই এজেন্টের প্রয়োজন। এজেন্টগণ উপযুক্ত রূপ অর্থ পাইতে পারিবেন। যাহাতে সমুদায় শ্রেণীর বালকবালিকাদিগের মধ্যে পত্রিকা খানি প্রচলিত হয় এই জন্য আমরা চেষ্টা করিতেছি। যাঁহাদিগের এইরূপ সৎকার্য্যে উদ্যোগ ও উৎসাহ আছে, তাঁহারা 'সখা' কার্য্যালয়ে পত্র লিখিলেই সমস্ত জানিতে পারিবেন।

'সখা' কার্য্যালয়,
৫০ নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

কার্য্যাধ্যক্ষ

---

## ধাঁধাঁ।

পূর্ব্ববারের প্রশ্নগুলির উত্তর।

১। হাতী। ২। ব-া-ত-া-স-া।

৩। ম—দ—ন অথবা ম—দ—ন
| | | | | |
দ—ম—ন দ—শ—ম
ন—ন—দ ন—ম—স্

দ্বিতীয় পংক্তির 'দমন' এই কথাটীর স্থানে 'দহন' 'দলন' 'দর্শন' এই কথাগুলিও বসান যায়।

প্র—ম—দা
| | |
ম—দ—ন
দা—ন—ব

৪। রাখাল ২৪; রাম ১২; সরলা ১২; নবীন ১২; চপলা ৬; লাবণ্যলতা ৩।

৫। মদনমোহন তর্কালঙ্কার; রমেশচন্দ্র মিত্র; ৬। ছুঁচ।

---

## নূতন।

১। কোন্ নিরাকার ফুল সাকার হলে লেবু হয়?

২। এমন চারিটী কথা কি যাহাদের প্রথম অক্ষর এক সঙ্গে লইলে একটী নগরের নাম হয়, এবং শেষের অক্ষরগুলি এক সঙ্গে লইলে ভয় হয়? কথাগুলির বিশেষ পরিচয় এই—

১ম কথাটীর অর্থ। হাতীর শাবক।

২য় ... ... ... কালীকলমের কাজ।

৩য় ... ... ... তোপ।

৪র্থ ... ... ... চুরটের কাছাকাছি।

৬। সুশীল' এবং 'তরলা' এই দুটী কথা দ্বারা পূর্ব্ববারের ন্যায় চতুষ্কোণী দ্বিভাগ পদ রচনা কর দেখি?

৪। নিম্নলিখিত অক্ষরগুলি যথা স্থানে বসাইয়া তাহাতে কি নাম হয় বাহির করঃ—

| নাম | বিশেষ পরিচয় |
|---|---|
| অমৃতাবিষারিকা— | এই দোষে মানুষ পড়্‌লে তাকে পদে পদে বিপদে পড়্‌তে হয়; তাতো হবেই! বিবেচনা না করে কাজ ক'র্‌লে বিপদ কে রাখে! |
| মালমদকেতন | ধুই সুদ-ইনি অনেকগুলি খুব সুন্দর কবিতা লিখেছেন। কেহ কেহ ইহাঁকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট কবি, কেউ বা অতি নীচ রকমের কবি বলিয়া থাকেন। যাহা হউক যখন ইনি মরিয়া গিয়াছেন, তখন লোকের প্রশংসা বা নিন্দা ইহাঁর কি করিবে? অতি গরিবভাবে ইহাঁর মৃত্যু হয়। |

৫। গলায় দড়ি গোল গা। পেটের মধ্যে হাত পা। সদা সঙ্গে সঙ্গে রাখে। মাঝে মাঝে চেয়ে দেখে। চলে কিন্তু নড়েনা। এটা কি তা বলনা?

---

## সখা
### সংক্রান্ত নিয়মাবলী।

১। 'সখা'র অগ্রিম বার্ষিক মূল্য এক টাকা মাত্র। মফঃস্বলে স্বতন্ত্র ডাক মাশুল লাগিবে না। আগামী মার্চ্চ মাসের পরে যাঁহারা গ্রাহক হইবেন, বিদেশবাসী হইলে তাঁহাদের পক্ষে পত্রিকার মূল্য ১।০ এক টাকা চারি আনা নির্দ্দিষ্ট হইবে। প্রতি খণ্ডের নগদ মূল্য ⁄১০ মাত্র।

২। পত্রিকাস্থ চিত্রের সংখ্যা কিছুই নির্দ্দিষ্ট থাকিবে না, তবে প্রত্যেক সংখ্যায় যাহাতে অন্ততঃ এক খানি চিত্র থাকে আমরা সেদিকে দৃষ্টি রাখিব।

৩। বালকবালিকাদিগের রচনা উৎকৃষ্ট হইলে তাহা সাদরে গৃহীত হইবে; তবে সুদীর্ঘ হইলে প্রকাশিত হইবে না।

৪। শিক্ষক এবং অভিভাবকদিগের পরামর্শ প্রভৃতি সাদরে গৃহীত হইবে।

৫। বালক বালিকাদিগের উপকারে আসিতে পারে, কেহ এরূপ কোন রচনা বা কোন সংবাদ কিম্বা সত্য ঘটনার বিশেষ বিবরণ আমাদিগের নিকট পাঠাইলে আমরা তাহা সাদরে প্রকাশ করিব।

৬। সখা-সংক্রান্ত সমস্ত পত্রাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইতে হইবে। কেবল রচনা, পরামর্শ প্রভৃতি সম্পাদকের নামে কার্য্যালয়ের ঠিকানায় পাঠান আবশ্যক।

৭। ঠিকানার পরিবর্ত্তন, নামের গোল, বা কার্য্য-সম্বন্ধীয় অন্য কোন অসুবিধা হইলে মোড়কের উপরে যে নম্বর দেওয়া থাকিবে, সেই নম্বরের উল্লেখ করিয়া পত্র লিখিতে হইবে।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে মুদ্রিত এবং ৫০নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট "সখা" কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

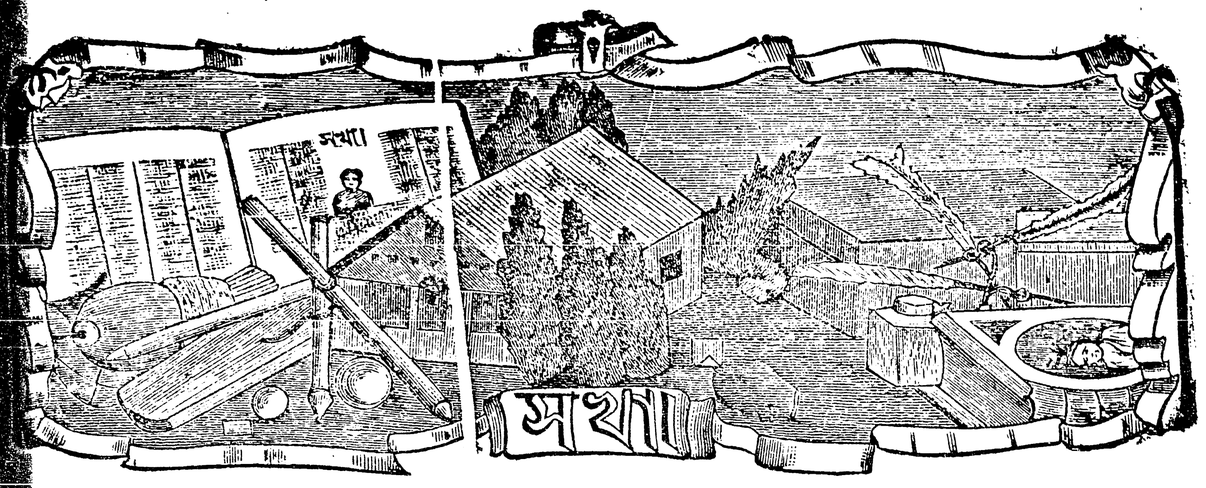


প্রথম ভাগ। ১লা মার্চ্চ ১৮৮৩, বৃহস্পতিবার। ৩য় সংখ্যা।

## কার্য্যাধ্যক্ষের বিজ্ঞাপন।

মফস্বলের বন্ধুদিগকে সবিনয়ে জানান যাইতেছে যে আগামী মাস হইতে 'সখা'র বার্ষিক মূল্য তাঁহাদের পক্ষে ১।০ এক টাকা চারি আনা নির্দ্দিষ্ট হইবে। যাঁহারা এখন গ্রাহক হ'ন নাই, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক এই মাসের মধ্যেই গ্রাহক হইলে ভাল হয়।

---

## রামায়ণের উপদেশ।

আমাদের পাঠক ও পাঠিকাগণের মধ্যে বোধ হয় কেহই সংস্কৃত রামায়ণ পড়েন নাই; অনেকে হয়ত কৃত্তিবাসের বাঙ্গালা রামায়ণও পড়েন নাই, অথচ অনেকেরই রামায়ণের কথা শুনিতে ইচ্ছা হয়। আমাকে মধ্যে মধ্যে অনেকগুলি বালকের নিকট রামায়ণের গল্প বলিতে হইত, তাহাতেই দেখিয়াছি ছোট ছেলেরা রামায়ণের গল্প বড় ভাল বাসেন। তাই আজ ইচ্ছা করিয়াছি রামায়ণ পাঠে কি উপদেশ পাওয়া যায় তাহা লিখিব। রামায়ণের গল্প পড়িতে যেমন সুন্দর, রামায়ণের উপদেশও সেইরূপ সুন্দর। কিন্তু অনেক স্থানে গল্প এত বাড়াইয়া লেখা যে কতটুকু সত্য, কতটুকু মিথ্যা, তাহা ঠিক করিয়া উঠা কষ্টকর। সূর্য্য পৃথিবী হইতে কতগুণে বড়, তাহা তোমরা সকলেই জান, অথচ হনুমান এই সূর্য্যকে বগলে পূরিল। ইহাও কি সম্ভব হয়? এইরূপ আরও অনেক অসম্ভব গল্প আছে। যাহা হউক, সে সকল কথা লইয়া আমাদের প্রয়োজন নাই। রামায়ণে কি উপদেশ পাওয়া যায়, আমরা সেইটী দেখিব। রামায়ণের কথা শেষ হইলে যদি সুবিধা হয়, তাহা হইলে মহাভারতের কথাও বলিব; কিন্তু এখন তোমাদের আশা দিয়া কাজ নাই। এই উপদেশগুলি মনে রাখিলে রামায়ণ পড়িতে আরাম বোধ হইবে, আর এখন পড়িতে গেলে অনেক স্থলে মিথ্যা বাজে গল্প দেখিবে। তোমরা বোধ হয় জান, রামায়ণ যিনি রচনা করিয়াছেন, তাঁহার নাম বাল্মীকি মুনি। প্রথমে তাঁহার কথা বলিয়া আরম্ভ করিতেছি। রামায়ণের উপদেশ স্থানান্তরে প্রকাশিত হইল। যে ডাকাত ছিল সে কিরূপে মুনি হইল, তাহা জানিয়া যদি উপদেশ লাভ করিতে চাও, তাহা হইলে স্থানান্তরে 'রত্নাকরের মুক্তি লাভ' এই প্রস্তাবটী মনোযোগের সহিত পড়িও।

---

## সর্প।

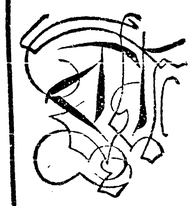

পরে! কি ভয়ানক সাপ! মহিষ বেচারার প্রাণ এবার আর বাঁচে না। এত বড় সাপ কি তোমরা কখনও দেখিয়াছ? আমি বাল্যকালে এক দিন শুনিয়াছিলাম যে আমাদের পাশের বাটীতে সাপুড়িয়ারা সাপ খেলিতে আসিয়াছে; অমনি ছুটিয়া গেলাম। গিয়া দেখিলাম একটা ঝাঁকা দুজনে বহিয়া লইয়া আসিতেছে। খানিকক্ষণ পরে ঝাঁকাটা খুলিয়া দিলে সর্প মহাশয় বাহির হইলেন। উঠানের চওড়ার দিকে তাঁহার শরীরটী প্রায় এপাশ ওপাশ হইয়া গেল। বোধ হয় সর্প মহাশয়ের শরীর ৫।৬ হাত হইবে। আর এক দিন পাড়ায় এক বাটীতে গণ্ডগোল হইতেছিল, শুনিয়া সেখানে দৌড়িয়া গেলাম। যাহা দেখিলাম, তাহা ভয়ানক। সেই বাড়ীর এক ঘরের কোণে একটা প্রকাণ্ড সাপ কুণ্ডলি করিয়া পড়িয়াছিল; অস্পষ্ট আলোতে তাহাকে সাপ বলিয়া কেহই চিনিতে পারে নাই। আমাদের সমবয়স্ক একটী বালক সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া সাপটীকে দেখিতে পাইল, কিন্তু সে সাপ বলিয়া বুঝিতে পারিল না; সে মনে করিল কাঁঠালের ভুতুড়ি (তখন কাঁঠালের সময়) পড়িয়া রহিয়াছে। বালক তাহা লইয়া আসিতে গেল, কিন্তু হাত দিবা মাত্র তেলপারা ঠেকিল, এবং সর্প বাবু নিদ্রার ব্যাঘাত হওয়াতে ফোঁস ফোঁস করিয়া উঠিলেন। অল্প সময়ের মধ্যেই পাড়াময় সম্বাদ ছড়াইয়া পড়িল, 'উত্তরের বাড়ীতে প্রকাণ্ড একটা সাপ আসিয়াছে।' কোথা হইতে আসিল, কেহই তাহা জানে না। যাহা হউক, সকলেই সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। এদিকে সর্প নিদ্রা যাইবার অসুবিধা দেখিয়া ঘর হইতে বাহির হইলেন—তাঁহার সমস্ত শরীর প্রায় ৬ হাত হইবে। উদর পূর্ণ করিয়া পান খাইতে খাইতে ফলারে ব্রাহ্মণেরা যেমন বিকাল বেলা ধীরে ধীরে বাড়ী যায়, সাপটীও সেইরূপ ধীরে ধীরে আপনার স্থানে যাইতে লাগিল। কিন্তু সাপকে কে কোথায় দয়া করিয়া থাকে? সাবোল, লাঠি, বল্লম, যে যাহা পাইল, তাহা লইয়া সকলে মার্ মার্ শব্দে সর্পের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল। 'মা মনসার প্রিয় ভৃত্য' এক বন হইতে অন্য বনে আশ্রয় লইয়াও কোন মতে প্রাণ বাঁচাইতে পারিলেন না। অল্পকালের মধ্যেই তাঁহার প্রাণ গেল; আমরা মহা আহ্লাদে সর্পকে দাহন করিয়া ঘরে ফিরিলাম। এই যে দুইবার দুটী প্রকাণ্ড সর্প দেখিয়াছি, তাহার কোনটাই বোধ হয় আমাদের অদ্যকার চিত্রিত সর্পের ন্যায় বৃহৎ বা ভয়ানক হইবে না। দেখিয়াছ, কি ভয়ানক তেজ! এই জাতীয় সর্প পাহাড়েও জলাময় বৃহৎ জঙ্গলে দেখিতে পাওয়া যায়। সর্পের একটী অভ্যাস এই যে ইহারা রৌদ্র না পাইলে থাকিতে পারে না; এই জন্য শীতপ্রধান দেশে অধিক সর্প দেখিতে পাওয়া যায় না।

তোমরা বোধ হয় সকলে সাপ-খেলা দেখিয়াছ। কেমন করিয়া সাপ ধরে তাহা জান কি? সাপুড়িয়ারা যখন শুনিতে পায় অমুক স্থানে সাপ আছে, তখন তাহারা বাঁশী লইয়া সেইখানে যায়। সাপ বাদ্য শুনিতে বড় ভাল বাসে, এই জন্য তুবড়ির শব্দ শুনিতে পাইলে মাথা তুলিয়া সেই দিকে আইসে। চতুর সাপুড়িয়া সুযোগ বুঝিয়া সাপের গলা টিপিয়া ধরে, এবং বিষের থলি ছিঁড়িয়া ও বিষদাঁত ভাঙ্গিয়া দিয়া আপনার ঝাঁকায় পোরে। এইরূপে এত তেজীয়ান যে সাপ তাহাকেও লোভে পড়িয়া মরিতে হয়। অনেকে মনে করে সাপুড়িয়ারা মন্ত্রের দ্বারা সাপকে বশ করে, কিন্তু তাহা ভুল। সাপ খেলিবার সময় বাঁশী বাজায় দেখিয়াছ? যদি কিছু থাকে, তবে সেই এক মন্ত্র। তাহার পর, সাপ ফণা তুলিয়া বাঁশীর শব্দে নাচিতেছে, এমন সময় ধূলিপড়া দিলেই অর্থাৎ মন্ত্র পড়িয়া ধূলি নিক্ষেপ করিলেই সাপ অমনি মাথা নামায়, ইহা বোধ হয় দেখিয়াছ। মূর্খ লোকেরা বলে ইহা মন্ত্রের গুণ। তোমাদিগকে এই মন্ত্রটী শিখাইয়া দিতেছি, কিন্তু সাবধান কাহাকেও বলিয়া দিওনা! ধূলো খুব সুন্দর রকমে গুড়ো করিয়া বলিবে "হে সাপ, আমাদের চক্ষের উপরে যেমন চক্ষের পাতা আছে, ঈশ্বর তোমাকে সেরূপ দেন নাই; আর আমাদের চক্ষু দুইটী যেমন দুই পাশে, তোমার চক্ষু দুটী সেরূপ না হইয়া প্রায় মাথার উপরে ভগবান দিয়াছেন, এজন্য ধূলি নিক্ষেপ করিলেই তাহা উড়িয়া



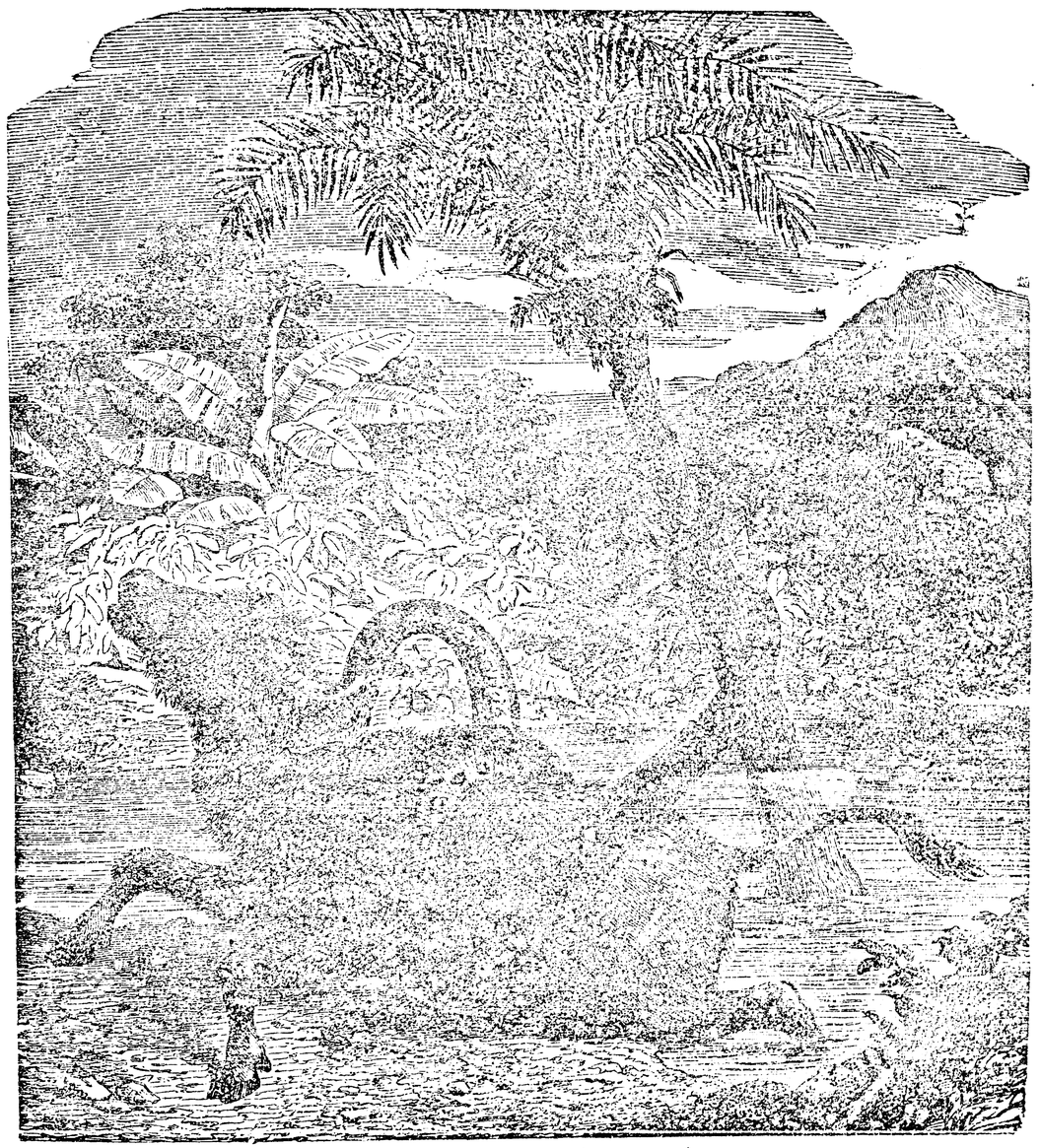

তোমাকে কাণা করিয়া দিবে—এবং কাজেই তোমাকে চারিদিক অন্ধকার দেখিয়া মাটীর উপরে জড়শড় হইয়া পড়িতে হইবে। তোমার এইরূপ গঠন এবং ধূলি নিক্ষেপের এই ফল জানিয়া. এই ধূলি নিক্ষেপ করিলাম—সহজবুদ্ধির দোহাই তুমি এখনই কাণা হইয়া যাও।”—এই বলিয়া ধূলি নিক্ষেপ করিলেই সাপের দুর্দ্দশার সীমা থাকিবে না।

এইত গেল সাপ-খেলার কথা। তাহার পর সাপের স্বভাবের কথা কিছু বলা উচিত। সর্পজাতি স্বভাবতঃ অতিশয় নিষ্ঠুর। অকারণে অথবা সামান্য কারণে সকলকেই দংশন করে। সকল সাপের দংশনে মানুষ মরেনা। যাহাদের বিষ নাই, তাহারা দংশন করিলে সামান্য জ্বালা ভিন্ন আর কিছুই হয় না, কিন্তু বিষাক্ত সাপের মত ভয়ানক শত্রু মানুষের আর নাই। বনে না গেলেই বাঘের হইতে রক্ষা পাওয়া যায়, নদীতে না গেলেই কুমীরের ভয় থাকেনা, কিন্তু এমন স্থান কোথায় যেখানে সর্প যাইতে পারে না? এই শত্রুর হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার কয়েকটী উপায় বলা যাইতে পারে।—যেখানে সাপের ভয়, সেই সকল স্থানে যাইতে হইলে একটা আলো লইতে পারিলে তো ভালই, অন্ততঃ একগাছা লাঠি লইয়া খট্ খট্ শব্দ করিতে করিতে যাইবে। শীতের সাপে প্রায় কামড়ায় না। গ্রীষ্মের দিনে এই সতর্কতা অবলম্বন করিলে চলিতে পারে। যদি নিকটে সর্প থাকে, তাহা হইলে শব্দ শুনিয়া চলিয়া যায়। বাসগৃহের মধ্যে যদি ইন্দুর অধিক থাকে তাহা হইলে সর্প আসিতে পারে তাহা মনে রাখিও, কারণ সর্প ইন্দুরকে ‘ফলার’ করিতে বড় ভালবাসে। যাহাতে সর্প না আসিতে পারে তজ্জন্য একটী উপায় অবম্বন করিতে একজন সুবিজ্ঞ ডাক্তার পরামর্শ দিয়াছেন; সে উপায়টী এই—আজকাল প্রায় প্রত্যেক পল্লিতেই ডাক্তারী ঔষধ পাওয়া যায়; এইরূপ পল্লি হইতে কিছু কার্ব্বলিক য়্যাসিড আনিবে। তাহার পর টুকরা টুকরা করিয়া কাপড় ছিঁড়িয়া কার্ব্বলিক য়্যাসিডে ভিজাইতে হইবে। অতঃপর যে সকল স্থান দিয়া সর্পের আসিবার সম্ভাবনা, অথবা যে সকল স্থানে সর্পের থাকিবার সম্ভাবনা, এইরূপ প্রত্যেক গর্ত্তের মুখে ভিজান বস্ত্র এক এক খণ্ড রাখিয়া দিবে। কিন্তু সাবধান হইবে, যেন ভিজাইবার সময় কার্ব্বলিক য়্যাসিড হাতে না লাগে, তাহা হইলে ফোস্কা হইতে পারে।

বালকবালিকাদিগের মধ্যে অনেককে এই সর্পের মত বলিয়া মনে হয়। অনেক বালক বালিক সামান্য কারণে, মাতার প্রতি, ছোট ভাইভগিনীদিগের প্রতি, দাস দাসীর প্রতি ফোঁস করিয়া উঠিয়া থাকেন। এই মন্দ অভ্যাসের হস্ত হইতে রক্ষা পাইতে হইলে প্রত্যেকেরই মনে রাখা কর্ত্তব্য যে পরমেশ্বর আমাদিগকে দয়া, ভালবাসা, প্রভৃতি মনের ভাব দিয়া সর্প অপেক্ষা অনেক বড় করিয়া দিয়াছেন। এখন, আমরা যদি সেই দয়া, সেই ভালবাসা সকলকে না দেখাই, এবং একটুতেই জ্বলিয়া উঠি, তাহা হইলে পরমেশ্বরকে অবমান করা হয়। পাঠকপাঠিকাদিগের মধ্যে এরূপ সাপের মত চরিত্র কাহারও আছে বলিয়া বিশ্বাস হয় না। যদি কাহারও থাকে, তিনি সত্বর আপন স্বভাব ভাল করিয়া যথার্থ মানুষ হউন।

---

## (ক) রত্নাকরের মুক্তি-লাভ।

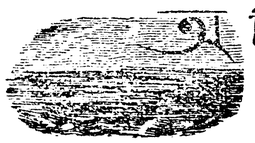


তি প্রাচীনকালে আমাদের এই ভারতবর্ষের এক বনে রত্নাকর নামে এক ডাকাত বাস করিত। রত্নাকর ব্রাহ্মণের ছেলে অথচ বাপ মায়ের অযত্নে অথবা নিজের দোষে কিছু মাত্র লেখা পড়া শেখে নাই। ‘দশকর্ম্মান্বিত’ বামণের ছেলেরা যেরূপ মন্ত্র তন্ত্র পড়াইয়া দু দশ



টাকা ঘরে আনে, মূর্খ রত্নাকরের বোধ হয় ততটুকু বিদ্যাও হয় নাই। এদিকে বাড়ীতে পোষ্য অনেকগুলি, তাহাদের না খাইতে দিলে চলে না; এইরূপ অবস্থায় রত্নাকরকে বাধ্য হইয়া এই ভয়ানক নিষ্ঠুর কাজে যাইতে হইয়াছিল। রত্নাকর যে বনে ‘আড্ডা’ করিয়াছিল তাহার মধ্য দিয়া একটি রাস্তা গিয়াছে; এখান দিয়া প্রত্যহই অনেক লোক যাতায়াত করে। রত্নাকর কাহাকেও ছাড়ে না; ছোট বড়, ছেলে বুড়ো, পুরুষ মেয়ে, যাহাকে পায়, রত্নাকর মারিয়া কাপড় ও পয়সা লয়। এইরূপে অনেক দিন রত্নাকর সেই বনে থাকিয়া দিনপাত করিতেছিল, এমন সময়ে এক দিন ব্রহ্মা ও নারদ ঋষি সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা প্রাচীন হইয়াছেন. দেখিয়া রত্নাকরের কঠিন মনে একটুকুও দয়ার উদয় হইল না। সে লোহার মত হাতে লোহার মুগুর তুলিয়া তাঁহাদিগকে মারিতে গেল। ব্রহ্মা বলিলেন “বাপু! তুমি কে? কেন আমাদের মার্‌বে?” রত্নাকর উত্তর করিল “আমি এই বনে থাকি, নাম রত্নাকর; এই পথ দিয়া যে লোক জন যায় তাদের মেরে পয়সা রোজগার করে দিন চালাই—তোমরা আমার হাতে পড়েছ, তোমাদের রক্ষা থাক্‌বে না।” ব্রহ্মা বলিলেন “বাপু, রত্নাকর! তুমি যে রোজ রোজ এই পাপ কর এই সব কার জন্য কর? তোমার এ পাপের ভাগী কি কেউ হবে? তোমার কে আছে? তাদের জিজ্ঞাসা করে এসতো।” রত্নাকর মনে ভাবিল “বুড়ো ব্রাহ্মণ দুটো কি চালাক! এই বলে হাত ছাড়িয়ে পালাবার চেষ্টা কর্‌ছে! কিন্তু রত্নাকর শর্ম্মার কাছে ওসব ফিকির খাট্‌বে না।” পরে বলিল “ওগো, তোমাদের ওসব চালাকি রেখে দাও। রত্নাকর শর্ম্মা তোমাদের মত ঢের লোক দেখেছে। আমি এখন বাড়ীতে খবর জান্‌তে যাব; আর তোমরা এ দিকে মার্ টেনে দৌড়—ছুট্! ওসব কি আর আমি বুঝিনে?” ব্রহ্মা বলিলেন “বাপু! আমরা বুড়ো মানুষ, কবে মরে যাই, এখন অধর্ম্ম কর্‌বো? তা বাপু, তোমার যদি বিশ্বাস না হয়, আমাদের এই গাছের সঙ্গে বেঁধে রেখে যাও!” তখন রত্নাকরের মনে একটু ভয় হইল ভাবিল “তবে কি সত্যই আমার পাপের ভাগী কেউ নাই? না, এমন হবে না! যাদের জন্য পাপ করি. তারা অবশ্যই আমার পাপের ভাগী হবে। আজ না জানি, কি হয়।” বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ দুজনকে গাছে বাঁধিয়া এইরূপ সাত পাঁচ ভাবিতে ভাবিতে রত্নাকর ঘরে গেল।

রত্নাকর ঘরে গিয়াই আপনার বৃদ্ধ পিতার নিকট গেল. এবং জিজ্ঞাসা করিল “পিতা. আমি যে আপনাদিগের জন্য ও আমার নিজের জন্য এই পাপ করিতেছি, ইহার জন্য কি আমি একা দায়ী হইব না আপনিও দায়ী আছেন?” পিতা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন ‘বাঃ! আমি কেন দায়ী হব? তুমি যত দিন বালক ছিলে, গায়ের রক্ত জল ক’রে তোমাকে মানুষ করিয়াছি; এখন তুমি মানুষ হয়ে আমাদিগকে প্রাচীন বয়সে পালন কর্‌বে, এই ত নিয়ম। তা, এখন কি উপায়ে টাকা উপার্জ্জন কর, তা আমি কি জানি?” রত্নাকর কোনও কথা না বলিয়া মায়ের নিকট গেল। মাকে ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনিও পিতার ন্যায় উত্তর করিলেন। তখন রত্নাকর নিতান্ত বিমর্ষ হইয়া স্ত্রীর নিকট উপস্থিত হইল; স্ত্রী রত্নাকরের আসিবার কথা জানিয়া বলিলেন “তুমি যখন আমাকে বিবাহ করিয়াছ, তখন আমাকে পালন করিতে তুমি বাধ্য; কি উপায়ে তুমি টাকা আন তাহা আমি শুনিতে চাই না। যদি অসৎ পথ বোধ হয়, ছাড়িয়া দিয়া সৎপথে যাও; আমাকে ভরণ পোষণ করিবার জন্য তোমাকে অসৎ কাজ করিতে আমি কখনও বলি নাই, তবে কেন আমি তোমার পাপের ভাগী হইব?” স্ত্রীর এই কথায় রত্নাকরের মাথায় আকাশ

ভাঙ্গিয়া পড়িল। তবে কি এত বৎসর ধরিয়া রত্নাকর যে সমস্ত পাপ করিয়াছে তাহার কেহ ভাগী হইবে না? রত্নাকর ভাবিতে ভাবিতে চারিদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিল। এতদিন আশা ছিল যে যাহাদের জন্য পাপ করিতেছে তাহারা নিশ্চয়ই পাপের কিছু কিছু অংশ লইবে কিন্তু এখন যখন সে আশা রহিল না, যখন পিতা মাতা স্ত্রী সকলেই এক বাক্যে সমস্ত পাপের বোঝা রত্নাকরের ঘাড়ে ফেলিয়া দিলেন, রত্নাকর বুঝিল পাপের বোঝা কি ভয়ানক। আর সে গৃহে থাকিতে পারিল না; ভবিষ্যতে পাপের ইচ্ছা ত গেলই, কিন্তু যাহা হইয়াছে, কিসে তাহা হইতে উদ্ধার হইবে, এই ভাবনায় রত্নাকরের শরীরের রক্ত শুকাইয়া যাইতে লাগিল। অস্থির হইয়া রত্নাকর গৃহ হইতে বাহির হইল, এবং 'কি হইবে' এই ভাবিতে ভাবিতে যেখানে বৃক্ষডালে ব্রহ্মা ও নারদ বাঁধা ছিলেন, সেইখানে উপস্থিত হইল। রত্নাকর অবিলম্বে তাঁহাদের বন্ধন খুলিয়া দিল, এবং সমস্ত কথা খুলিয়া বলিয়া তাহার সদ্গতির কি হইবে তাহার পরামর্শ চাহিল। ব্রহ্মা হাসিয়া বলিলেন "বাপু! তখনই বলিয়াছিলাম, তা বিশ্বাস কর নাই। এখন দেখিলেত? যা হউক তুমি এক কর্ম্ম কর। পাপ হইতে উদ্ধার হওয়া অতি সহজ কাজ। যিনি পাপীর রক্ষাকর্ত্তা ভগবান, পাপ যাঁহাকে দেখিলে পলায়ন করে, সেই দয়াময়ের চরণ সার করিয়া তাঁহাকে ভক্তির সহিত সরল প্রাণে ডাক, কোনও পাপ থাকিবেনা।" রত্নাকরের আশা হইল, কিন্তু যে জিহ্বা জীবনে কখনও ধর্ম্মের কথা বলে নাই, কোনও মিষ্ট কথা উচ্চারণ করে নাই, সেই পাপময় জিহ্বায় ঈশ্বরের নাম আসিল না। তখন ব্রহ্মা ও নারদ অনেক ভাবিয়া, অনেক উপায়ে রত্নাকরকে ঈশ্বরের বিষয় শিক্ষা দিলেন, ঈশ্বরের ভালবাসা ও তাঁহার দয়ায় কথা বলিলেন; এবং কিরূপে তাঁহাকে ডাকিতে হয় তাহা বুঝাইয়া দিয়া স্বস্থানে গমন করিলেন। রত্নাকর ব্রহ্মার নিকট যে অমূল্য উপদেশ লাভ করিলেন, তাহাতেই তিনি মহামুনি হইয়া গেলেন। এই উপদেশ রত্নাকর জীবনে কখন বিস্মৃত হন নাই। ব্রহ্মার কথা অনুসারে রত্নাকর ঘোর তপস্যা অর্থাৎ একমনে ঈশ্বরের নাম করিতে আরম্ভ করিলেন; তিনি ঈশ্বরের নামে এত মজিয়া গেলেন যে আহার নিদ্রার দিকে মন রহিল না, বাহিরের জ্ঞান বন্ধ হইয়া গেল; তাঁহার শরীর পৃথিবীতে, কিন্তু প্রাণ ঈশ্বরেতে ডুবিয়া রহিল। রামায়ণে উল্লেখ দেখা যায় যে রত্নাকর তপস্যা করিতে করিতে উইপোকা তাঁহার শরীরের চারি দিকে মাটীর ঢিবি নির্ম্মাণ করিয়া, তাহার মাংস চর্ম্ম খাইয়া নিঃশেষ করিয়াছিল। অনেক দিন পরে ব্রহ্মা রত্নাকরের কুশল জানিতে আসিয়া দেখিলেন একটা প্রকাণ্ড উইঢিবির মধ্য হইতে ভগবানের নামের শব্দ হইতেছে। তিনি উইঢিবি পরিষ্কার করিয়া তাহার মধ্য হইতে রত্নাকরকে বাহির করিলেন, এবং বল্মীক অর্থাৎ উইঢিবি হইতে বাহির করিলেন বলিয়া রত্নাকরকে বাল্মীকি নাম দিলেন। বাল্মীকি ব্রহ্মার পরামর্শানুসারে রামায়ণ রচনা করিয়া জগতে যশস্বী হইয়া গিয়াছেন। পাঠকপাঠিকা! রামায়ণে বাল্মীকির সম্বন্ধে অনেক অতিরিক্ত লেখা হইয়া থাকিলেও বাল্মীকির জীবন হইতে কি এই শিক্ষা পাইতেছি না যে যে ব্যক্তি সহস্র পাপে পাপী হইয়াও একপ্রাণে ভগবানের চরণকে সার বলিয়া ধরে তাহার পাপ থাকে না? মাঘ মাসের কুয়াসা গাঢ় হইলেও সূর্য্যের কিরণে কতক্ষণ থাকিতে পারে? তেমনি পাপের অন্ধকার পবিত্রতাতে পরিপূর্ণ জগদীশ্বরের সম্মুখে থাকিতে পারে না। তাই বলিতেছি, যদি পাপ করিয়া ভবিষ্যতের দুঃখ হইতে বাঁচিতে এবং পাপের হাত ছাড়াইতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে বাল্মীকির ন্যায় দয়াময়ের চরণ সরল মনে ধারণ কর। দেখিবে, তোমার মনে বল হইবে, আশা হইবে, এবং তুমি সমস্ত বিপদাপদের হস্ত ছাড়িয়া ধর্ম্মের রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে।



## ভীমের কপাল।

চতুর্থ অধ্যায়।

বল্লভগঞ্জের জমীদারী কাছারী জমীদারের বাড়ীর বাহিরে খোলা মাঠের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড আটচালা ঘরে হয়। জমীদার রামজীবন বাবু প্রতিদিন প্রাতে ও অপরাহ্ণে কাছারী করিয়া থাকেন—দুঃখী প্রজাদিগের দুঃখের কথা শুনেন, ও যাহাতে তাহাদের দুঃখ না থাকে তাহার জন্য ব্যবস্থা করেন। প্রজাদিগকে তিনি নিজের ছেলেদের মত ভালবাসিতেন, এবং তাহাদের জন্য রাস্তা ঘাট, হাঁসপাতাল, ইস্কুল করিয়া তাহাদের সকলরূপ সুবিধা করিয়া দিতেন। প্রজারাও তাঁহাকে পিতার ন্যায় ভক্তি করিত। কাহারও কোন বিপদ হইলে তাঁহারই কাছে ছুটিয়া আসিত, তাঁহারই পরামর্শ লইয়া কাজ করিত। ফলতঃ রামজীবন বাবু যে বল্লভগঞ্জের জমীদার, তাহা তাঁহার ভাবগতিকে বুঝিবার যো ছিল না; পোষাক সামান্যরূপ—সর্ব্বদা প্রজাদের বাড়ীতে গিয়া কখনও বা মাটীতে বসিয়া আছেন, কখনও বা গরিব প্রজার কাদা-মাখান ছেলেগুলি কোলে পিঠে করিতেছেন, এরূপ দেখিলে কাহার সাধ্য বুঝিয়া লয় তিনি জমীদার। তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহাকে কখন কখন বলিয়াছেন 'এরূপ করিলে মান থাকিবে না'। রামজীবন বাবু হাঁসিয়া বলিতেন "প্রজার যাহাতে মঙ্গল হয় তাহা করিলে যদি মান যায়, যাক্। যাহার অবস্থা খারাপ তাহার সহিত মিশিলেই যে মান যায়, তাহা নহে।"

তিলকরাম ভীমেন্দ্রকে ধরিয়া টানিতে টানিতে এই জমীদারের কাছারীতে লইয়া গেল। তখন বেলা ১০টা। রামজীবন বাবু এই কতক্ষণ বাড়ীর মধ্যে গিয়াছেন—তিনটার পূর্ব্বে বাহির হইবেন না, সুতরাং ভীমেন্দ্রকে দেওয়ানজি মহাশয়ের হাতে পড়িতে হইল। দেওয়ানজি মহাশয় একটী ছোট খাট নবাব, কিন্তু বাবুর জ্বালায় কিছুমাত্র কর্ত্তৃত্ব করিতে পারিতেন না। সকল প্রজাই বাবুর কাছে আইসে তাঁহাকে কেহই গ্রাহ্য করে না, এ দুঃখ দেওয়ানজি মহাশয়ের অনেক দিন হইতে ছিল। এখন একজনকে হাতে পাইয়া নিজের তেজ কত তাহা দেখাইবার ইচ্ছা করিলেন। তিলকরাম দেওয়ানজি মহাশয়কে প্রণাম করিয়া ভীমেন্দ্রের সকল কথা কহিল। দেওয়ানজি মহাশয় গোঁপে হাত দিয়া, চোক ঘুরাইয়া বলিলেন 'বটে? কেন তুমি পয়সা দাও নাই?' ভীমেন্দ্র বলিল "আমার পয়সা ছিল না তাই দিই নাই; আমার ঠকাবার ইচ্ছা ছিল না।" দেওয়ানজি রাগিয়া বলিলেন "খুব বাচাল ছেলেতো? পয়সা ছিল না, তবে পার হতে এসেছিলে কোন্ বুদ্ধিতে?" ভীমেন্দ্র কি উত্তর করিতে যাইতেছিল; দেওয়ানজি মহাশয় বাধা দিয়া বলিলেন "এ জমীদারের কাছারী, তা হিসাব নাই! মুখে মুখে উত্তর? কোই হ্যায়?" দুজন বেহারা যোড়হাত করিয়া সেখানে দাঁড়াইল। দেওয়ানজি হুকুম দিলেন "রাস্তার ধারের ছোট ঘরে পুরে চাবি বন্ধ করে দাও।" একজন ভদ্রলোক দেওয়ানজির কানে কানে বলিলেন 'কর্ত্তা শুন্‌লে কি বল্‌বেন?' দেওয়ানজি ষাঁড়ের মত চেঁচাইয়া বলিলেন 'আমার হুকুম। লে যাও'।—দুজন বেহারা ভীমেন্দ্রকে ধরিয়া লইয়া চলিল। এই বার গোঁয়ার ভীমেন্দ্র দুঃখ কি তাহা বুঝিল।

বাড়ীর সুখের কথা, মাতুল মাতুলানীর স্নেহ, বিপিনের প্রাণের ভালবাসা, সকলি এক সঙ্গে ভীমেন্দ্রের মনে পড়িল। দুঃখেতে কষ্টেতে তাহার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল—সে প্রাণ খুলিয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। বেহারাদের পাহাড়ের মন, তাহাতে ভিজিল না; তাহারা ভীমেন্দ্রকে ধরিয়া লইয়া চলিল।

দেওয়ানজি মহাশয় যে ছোট ঘরের কথা বলিলেন, তাহার কথা একটু বলা আবশ্যক। রামজীবন বাবুর পিতা বড় অত্যাচারী ছিলেন, তিনি যাহার প্রতি বিরক্ত হইতেন, তাহাকে এই ঘরে পুরিয়া রাখিতেন। ঘরটী ইন্দুর ছুঁচো, আরশুলাতে পরিপূর্ণ। এই ঘরে লইয়া গিয়া নিষ্ঠুর বেহারা ভীমেন্দ্রকে বন্ধ করিল। ভীমেন্দ্রের ক্রন্দন বাতাসেই মিশিয়া গেল! এখন ভীমেন্দ্র বুঝিল অনর্থক রাগ করার ফল কি? ভীমেন্দ্র বালক বটে, তথাপি তাহার মনে হইতেছিল "কেন রাগ করিলাম? কেন সামান্য কারণে এত বিরক্ত হইলাম? কেন মাতুলের মিষ্ট কথা শুনিলাম না? বিপিন না জানি আমার কথা ভাবিয়া কত ক্লেশ পাইতেছে? যখন আমার মা একথা শুনিবেন, তখন তাঁর কত কষ্ট হইবে?" ভাবিতে ভাবিতে চক্ষের জলে ভীমের বুক ভাসিয়া গেল। কাঁদিতে কাঁদিতে ভীমেন্দ্র অচেতন হইয়া পড়িল। দ্বিপ্রহর বেলা—ভীমেন্দ্র তখনও আহার করে নাই, তৃষ্ণায় গলা শুকাইয়া যাইতেছে। ভীমেন্দ্র অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত অচেতন হইয়া পড়িয়া রহিল। যখন জ্ঞান হইল, তখন শরীর জ্বলিয়া যাইতেছে। হঠাৎ দ্বার খুলিয়া গেল; জমীদার রামজীবন বাবুর হুকুম লইয়া একজন চাকর উপস্থিত হইয়া বলিল "তুমি যাইতে পার। তোমাকে ছাড়িয়া দিতে বাবু হুকুম দিয়াছেন।" ভীমেন্দ্র কোথায় যাইবে? এদিকে অসহ্য ক্ষুধা, পথ চলা কষ্ট; ওদিকে অসহ্য শরীর বেদনা—ভীমেন্দ্র কোথায় যাইবে? ভিক্ষা করিলে আহার যোটে বটে, কিন্তু ভীমেন্দ্র ভদ্রলোকের ছেলে কি বলে ভিক্ষা করে? অবশেষে ক্ষুধা আর সহ্য করিতে না পারিয়া এক ময়রাদোকানের কাছে গিয়া কিছু খাবার চাহিল। দোকানের মধ্যে একটী বালক বসিয়া খাবার খাইতেছিল, সে ভীমেন্দ্রের দুঃখ দেখিয়া তাহার যত খাবার ছিল, সকলি ভীমেন্দ্রকে দিল। ভীমেন্দ্র ক্ষুধার জ্বালায় এই দয়ার জন্য কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেও ভুলিয়া গেল; খাবার খাইবার সময় ভীমেন্দ্রের চক্ষে জল আসিয়াছিল, পাছে কেহ দেখিতে পায় এই ভয়ে ভীমেন্দ্র অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া চলিয়া গেল।

এইরূপে আর ও পাঁচ দিন কখন কোন চাষার বাটীতে, কখন কোন ময়রার দোকানে, কখন বা পেটের জ্বালায় জোর করিয়া যৎসামান্য আহার যোগাড় করিয়া ভীমেন্দ্র নবমীর দিন রাত্রিতে গোপালপুরের রাস্তায় উপস্থিত হইল, কিন্তু কতক দূরে গিয়া ভীমেন্দ্র চারিদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিল—মাথা ঘুরিতে লাগিল, গলা শুকাইয়া কথা বন্ধ হইয়া গেল। ভীমেন্দ্র মৃতের ন্যায় মাটীতে পড়িয়া গেল—তাহার চৈতন্য রহিল না। প্রাতে রাস্তার লোকে এই ব্যাপার দেখিবার জন্য সেইখানে যুটিল। অল্প সময়ের মধ্যে চারিদিকের গ্রামে এই খবর ছড়াইয়া পড়িল। সুজনখালীর মিত্রেদের বাড়ীতে এ খবর গেল। দীনদয়াল বাবু তাড়াতাড়ি কতকগুলি ঔষধ লইয়া, একটা পাল্কী সঙ্গে করিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। তাহার পর কি হইয়াছে, তাহা পাঠকপাঠিকাগণ অবগত আছেন।

ক্রমশঃ—

---



## ক্ষুদ্র জিনিশ।

নেকের অভ্যাস আছে ক্ষুদ্র জিনিশ দেখিলে আর তাহা গ্রাহ্য করিতে চান না। একটী পয়সা বাজে খরচ, একটী ঘণ্টা মিথ্যা গল্প করা, একটু অল্প স্বাস্থ্য নষ্ট করা, এ সকল বিষয়ে কাহারও কাহারও মনোযোগ একেবারেই নাই। 'এসব সামান্য বিষয়' এই বলিয়া অনেকে এই সকল বিষয়ে সাবধান হইতে চান না। কোন খারাপ কাজের সম্বন্ধে যেমন, ভাল কাজের সম্বন্ধেও সেইরূপ,—'সামান্য কাজ, ওর জন্য আর কি?' এই কথাই অনেকে বলেন। কিন্তু যাঁহারা পৃথিবীতে বড় লোক হইয়াছেন, যদি একবার তাঁহাদের জীবনের কথা পড়া যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে তাঁহারা সকল দিকে দৃষ্টি রাখিতেন, কোন জিনিশ সামান্য বলিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিতেন না। এক জন বড় লোককে একবার জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, 'আপনি কিরূপে এই সুনাম লাভ করিলেন?' তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন "আমি কোন জিনিশকেই সামান্য বলিয়া অগ্রাহ্য করি নাই।"

যদি কেহ ১৬ বৎসর বয়স হইতে ৫০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত প্রত্যহ একটী করিয়া পয়সা বাজে খরচ করে, তাহা হইলে পঞ্চাশ বৎসর বয়সের সময় হিসাব করিলে সে দেখিতে পাইবে যে তাহার প্রায় দুই শত টাকা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। বৃদ্ধ বয়সে যে সময় কাজ কর্ম্মের শক্তি থাকিবে না, সে সময় এতগুলি টাকা হাতে থাকিলে কত কাজ হইত। আট বৎসর বয়স হইতে পঞ্চাশ বৎসর পর্য্যন্ত প্রত্যহ এক এক ঘণ্টা সময় নষ্ট হইলে শেষে দেখা যায় যে প্রায় দুই বৎসর সময় নষ্ট হইয়াছে। এইতো গেল অপব্যয়ের কথা। তাহার পর শিক্ষা সম্বন্ধেও কিছু বলা উচিত। অনেকে সামান্য সামান্য বিষয় হইতে কিছুই শিখিবার জিনিশ পান না, কিন্তু জ্ঞানী লোকদিগকে এই কথা বলিলে তাঁহারা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলেন "সে কি? চোখ্ কাণ খোলা থাকিতেইতো চারিদিক হইতে শিক্ষা পাওয়া যায়!" চক্ষু কর্ণ সকলেরই আছে, কিন্তু এক জন তাহার ব্যবহার জানেন বলিয়া বড় লোক, আর তুমি আমি চোখ কাণ বোঝার মত বহিয়া লইয়া বেড়াইমাত্র, কাজে লাগাই না, এই জন্যই আমরা মূর্খ। ফল পাকিলেই গাছ হইতে মাটীতে পড়িয়া যায়, ইহাতো সকলেই দেখিয়াছি, কিন্তু নিউটন সাহেব বুঝিলেন, পৃথিবী ফলকে টানে, তাই ফল পড়ে। জল গরম করিবার সময় হাঁড়ির মুখে কাপড় চাপা দিলে, জলের ধূঁয়া অর্থাৎ বাষ্প কাপড়টাকে ঠেলিয়া দেয়, তাহাতে কাপড়টা কাঁপে, ইহা আমরা সকলেই দেখিয়াছি এবং জানি; কিন্তু মহাত্মা জেম্‌শ্ ওয়াট্ তাহা দেখিয়া স্থির করেন বাষ্পের 'গায়ে' জোর আছে, তাহাতেই কাপড় নড়ে এবং এই হইতেই রেলের গাড়ী প্রভৃতি ধূম কলের সৃষ্টি হইল। তোমরা বোধ হয় জান বিলাতে টেম্‌শ্ নদীর নীচে এপার হইতে ওপার পর্য্যন্ত একটী প্রকাণ্ড সুরঙ্গ-পথ আছে। ব্রুনেল নামে এক জন সাহেব ১৮২৫ হইতে ১৮৪৩ সাল পর্য্যন্ত খাটিয়া অর্থাৎ ১৮ বৎসরে এই কাজটী শেষ করেন। কিসে তাঁহার এ কার্য্যের সুবিধা হইল, তাহা কি জান? তিনি এক দিন দেখিলেন একটী ছোট পোকা এক খণ্ড কাষ্ঠের মধ্য দিয়া গর্ত্ত করিয়া যাইতেছে। পোকাটী কেমন করিয়া ধীরে ধীরে কাষ্ঠের মধ্যে খিলান করিয়া এক প্রকার বার্ণিস লাগাইয়া যাইতে লাগিল, ব্রুনেল সাহেব তাহা বেশ করিয়া দেখিলেন, এবং এই 'সামান্য' বিষয়ই বড় করিয়া টেম্‌শ্ নদীর সুরঙ্গ-পথ প্রস্তুত হইল।

আর অধিক দৃষ্টান্ত দিবার আবশ্যকতা নাই। কি অপব্যয় বিষয়ে, কি সদ্ব্যয় বিষয়ে, কি শিক্ষা

বিষয়ে, কি উন্নতি বিষয়ে, সকল দিকেই 'সামান্য' জিনিশের মূল্য আছে। পরমেশ্বর যে হাতে খুব বড় জিনিশকে সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই হাতেই সামান্য জিনিশকে সৃষ্টি করিয়াছেন। অতএব কোন দ্রব্যকেই সামান্য বলিয়া অগ্রাহ্য করিও না; মনে রাখিও সেই বড় লোক হয় যে সামান্য বিষয়কে অগ্রাহ্য করে না।

---

## দেখ, বাবা! কেমন বাছুর!

**সন্ন বাবু** এক জন বেশ শিক্ষিত লোক। তিনি অনেক কাল হইতে পশুর প্রতি-অত্যাচার-নিবারিণী সভার * সহিত যুক্ত আছেন। তাঁহার বাড়ীতে পশুর প্রতি কখনও অত্যাচার হয় নাই;—পিতা মাতার দেখাদেখি ছেলেগুলি পর্য্যন্ত বিড়াল, কুকুর, বাছুরদিগকে নিজেদের এক বাড়ীর লোকের মত ভালবাসে। ছেলেরা পশুদিগকে কিরূপ ভালবাসিত, তাহার একটী দৃষ্টান্ত বলি। এক দিন প্রসন্ন বাবু নিজের ঘরে বসিয়া কার্য্য করিতেছিলেন, এমন সময় শুনিতে পাইলেন, উঠানে সরলা (তাঁহার কন্যা) কাহার সহিত কথা বলিতেছে; প্রসন্ন বাবুর বড় শুনিতে ইচ্ছা হইল, সরলা কাহাকে কি বলিতেছে, এই জন্য উঠানের দিকে গলা বাড়াইলেন। তিনি দেখিতে পাইলেন উঠানের একপাশে মঙ্গলা গাই মহাসুখে সরলার হাতের খড় খাইতেছে, পাশে সরলা দাঁড়াইয়া কি বলিতেছে। (বালিকার বয়স ৭ বৎসর মাত্র) প্রসন্ন বাবু আশ্চর্য্য বোধ করিয়া আরও একটু অগ্রে গেলেন। গিয়া শুনিতে পাইলেন, সরলা বলিতেছে "মঙ্গলা! লক্ষ্মীটী! এই কটা খড় খেয়ে ফেল—না খেলে পেট ভরিবে কেন? (গাভী কোন কারণে মাথা নাড়িল) ও কি মাথা নাড় কেন? আর খাবে না? রাগ করিলে? তবে আমি যাই" এই বলিয়া সরলা চলিয়া যাইতেছিল, এমন সময় গাভীটী অল্প ডাকিয়া তাহার মুখের দিকে স্নেহের চক্ষে তাকাইতে লাগিল। জগদীশ্বর বোবা করিয়াছেন, নতুবা বোধ হয় সে এই কথাই বলিতেছিল—"ওগো সুশীলে, আমি কি তোমার উপর রাগ করিতে পারি? যদি এই পৃথিবীর সকল লোকই তোমার মত হইত, তাহা হইলে কি আমাদের কোন দুঃখ থাকিত! তুমি যাইও না তোমার মত বালকবালিকা আমার কাছে আসিলে, আমি বড় সুখী হই; ঈশ্বর করুন, সকলেই তোমার মতন হউক।" গরুর ডাক শুনিয়া সরলা ফিরিল, এবং অবশিষ্ট খড়গুলি সম্মুখে রাখিয়া অাঁচলের দ্বারা গরুর গায়ে বাতাস করিতে লাগিল। গরু যখন খাইতেছিল, তখন সরলার মুখে হাসি—সরলা বলিতেছিল "এই তো মা লক্ষ্মীটী! খাও, খাও! আবার সন্ধ্যা বেলা ভাত আনিয়া দিব এখন।" এই কথাগুলি শেষ হইতে না হইতে প্রসন্ন বাবু সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং সরলার গালে হাত দিয়া বলিলেন "কি মা! কার সঙ্গে কথা হচ্ছিল? উনি যদি তোমার মা হন, তাহ'লে তো আমার মায়ের মা—দিদীমা—হলেন! বেশ মা! তোমার জন্য গরুর সঙ্গে আমার বেশ সম্পর্ক হ'ল।" "যাও, বাবা! তুমি বড়—"ইত্যাদি বলিতে বলিতে সরলা সে স্থান হইতে দৌড়িয়া প্রস্থান করিল।

এমন সাধের গরুর কিছুকাল পরে বাছুর হইবার সময় হইল। প্রসন্ন বাবু তখন কোন কার্য্যের জন্য বিদেশে গিয়াছিলেন—ছেলেরা পত্র লিখিয়া জানাইল মঙ্গলার শীঘ্রই বাছুর হইবে। অবশেষে

* এই সভার কার্য্যালয়, কলিকাতা রাধাবাজার, ১৯১ নং বাটীতে। সভা অনেক স্থানে আপনাদিগের এজেণ্ট অর্থাৎ কার্য্যকারক নিযুক্ত করিয়াছেন; ইহাঁরা পশুর প্রতি কোন অত্যাচার দেখিলে অত্যাচারীর নামে আদালতে নালিশ করিয়া তাহাকে শাস্তি দেওয়াইয়া থাকেন।

এক দিন রাত্রিতে বাছুর হইল। প্রাতঃকালে ছেলেরা উঠিয়া দেখে সুন্দর বাছুর হইয়াছে, তখন তাহাদের আহ্লাদ দেখে কে? পাড়াময় ছুটিয়া গিয়া ছেলেরা খবর দিয়া আসিল বাছুর হইয়াছে। পাড়ার মেঝদাদা, সেঝ কাকা, দাদাবাবু, গোলাপ দিদী, কবিরাজ জেঠা মহাশয়, মামাবাবু, দিদিমণি, গৌরমণি পিশী সকলেই প্রসন্ন বাবুর ছেলেদের গোলমালে নিদ্রা হইতে জাগিলেন—শুনিলেন বাছুর হইয়াছে। সকলেই প্রসন্ন বাবুর ছেলেদের সুখে সুখী, যেন প্রসন্ন বাবুর বাড়ীতে একটী নূতন ছেলে হইয়াছে! তবে ছেলেদের একমাত্র দুঃখ প্রসন্ন বাবু বাড়ীতে নাই। স্কুল হইতে আসিয়া বাছুরের খেলা দেখা ও বাছুরের সঙ্গে খেলা করা, ইহা ভিন্ন ছেলেদের অন্য খেলা নাই। এইরূপে অনেক দিন কাটিয়া গেল। অবশেষে প্রায় একমাস পরে প্রসন্ন বাবু বাটী আসিলেন। ছেলেরা যখনই তাঁহাকে দেখিতে পাইল অমনি 'বাবা বাছুর দেখিবে এসো' বলিয়া গরুর ঘরের দিকে টানিয়া লইয়া গেল। দয়ালু প্রসন্ন বাবু—ছেলেদের সুখে সুখী; তিনি মনে মনে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন যে তাঁহার ছেলেরা বোবা পশুদিগকে এত যত্ন করে এবং ভালবাসে। ছেলেদের সহিত গরুর ঘরে গিয়া প্রসন্ন বাবু নূতন ছেলের ন্যায় নূতন বাছুর দেখিলেন; ছেলেরা পিতাকে বাছুর দেখাইয়া যেন হাতে স্বর্গ পাইল। ছবিতে দেখ তাহারা কেমন বাছুর দেখাইতেছে!

ঈশ্বর করুন আমাদের সকল বালক বালিকাই এই প্রসন্ন বাবুর ছেলেগুলির মত পশুর প্রতি দয়া করিতে শিখুক। আহা! যাহারা কথা কহিয়া, মন খুলিয়া নিজের কষ্ট বলিতে পারে না, তাহাদের প্রতি অত্যাচার করা কি উচিত?

---

## গারফীল্‌ডের বাল্যকালের দুটী গল্প।

মহাত্মা গারফীল্‌ডের নাম তোমরা বোধ হয় অনেকেই শোন নাই। তিনি কিছুকাল পূর্ব্বে উত্তর আমেরিকার ইউনাইটেড্‌ষ্টেট্‌স্ প্রদেশের সর্ব্ব প্রধান রাজপুরুষ ছিলেন। বাল্যকালে কখনও রাজ মিস্ত্রীর কাজ করিয়া, কখন ছুতারের কাজ করিয়া, কখন চাষার কাজ করিয়া, গারফীল্‌ড্ টাকা উপার্জ্জন করিতেন, এবং তাহার দ্বারা বিধবা মার সাহায্য করিয়া নিজের লেখাপড়ার খরচও চালাইয়া দিতেন। এইরূপ চেষ্টা ও সুবুদ্ধির বলেই তিনি অত্যন্ত ছোট অবস্থা হইতে উঠিয়া এত বড় হইয়াছিলেন। তাঁহার মাতা অত্যন্ত বুদ্ধিমতী এবং পরম ধার্ম্মিকা ছিলেন বলিয়া গারফীল্‌ডের চরিত্র অল্প বয়স হইতেই ভাল হইয়া উঠে। আমরা অন্য সময়ে এই মহাত্মার জীবনচরিত পাঠকপাঠিকাদিগকে জানাইব; এখন কেবল সংক্ষেপে তাঁহার বাল্যকালের দুটী মাত্র গল্প লেখা যাইতেছে; এই গল্প দুটী পড়িলেই বুঝিতে পারিবে তিনি বাল্যকালেও কি চমৎকার লোক ছিলেন।

গারফীল্‌ডের একটী পোষা বিড়াল ছিল; বিড়ালটী তাঁহাকে অত্যন্ত ভাল বাসিত, তিনি যেখানে যাইতেন, প্রায়ই সঙ্গে সঙ্গে থাকিত—বোবা পশু পর্য্যন্ত যেন বুঝিয়াছিল যে গারফীল্‌ডের মত বালকের কাছে থাকিলে তাহার কোন বিপদের সম্ভাবনা থাকিবে না। একদিন গারফীল্‌ড আপনাদিগের বাড়ীর বাগানে কাজ করিতেছিলেন,—বিড়ালটী সঙ্গে ছিল—এমন সময়ে তাঁহার সমবয়স্ক একটী বালক সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। অন্য দশ জন বালক যেরূপ এই বালকটীও সেইরূপ কুকুর বিড়াল প্রভৃতির উপর উৎপীড়ন করিয়া আমোদ বোধ করিত। কাজেই গারফীল্‌ডের বিড়ালটী দেখিয়া তাহার ইচ্ছা হইল একবার ঢিল ছুঁড়িয়া লয়! দুই একঘা ঢেলা খাইয়া বেচারা বিড়াল দৌড়িয়া ঘরে চলিয়া গেল, নিষ্ঠুর বালক নিজের মনে হাসিতে লাগিল।

বিড়ালের প্রতি এই অত্যাচার দেখিয়া গারফীল্‌ড অবাক্ হইয়া গেলেন। তাহার পর খানিক ক্ষণ পরে বলিলেন—"আমি এরূপ ব্যবহার ভালবাসি না।" বালক একটুও অপ্রস্তুত না হইয়া বলিল, "আঃ এমন কি ব্যবহার? একটা সামান্য বিড়াল বইতো নয়।"

গারফীল্‌ড্।—বিড়াল সামান্য হইলেও একটা প্রাণী।

বালক।—তাহা হইলে ইন্দুর, ছুঁচো, টীকটিকিও একটা প্রাণী।

গারফীল্‌ড্।—তাতে আর সন্দেহ কি? ঠাট্টা করিবার প্রয়োজন নাই; তুমি অত্যন্ত অন্যায় কার্য্য করিয়াছ; যে এই বয়স হইতেই বোবা পশুর প্রতি অভদ্র ব্যবহার করিতেছে সে বড় হইয়া মানুষের প্রতিও অভদ্র ব্যবহার করিবে। বালক গারফীল্‌ডের এই কথা গুলিতে একটু থতমত খাইয়া বলিল—'তুমি আমার হইয়া তোমার বিড়ালের নিকট ক্ষমা চাহিও।" এইরূপ কথা বার্ত্তার পর দুজন বালক দুদিকে চলিয়া গেল,—গারফীল্‌ড বিড়ালের হইয়া দুকথা বলিতে পারিয়াছেন, এই আহ্লাদে হাসিতে হাসিতে গেলেন, এবং অন্য বালকটী সমবয়স্ক গারফীল্‌ডের কথায় চিন্তিত হইয়া পশুর প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা উচিত তাহাই ভাবিতে ভাবিতে গেল।

আর একবার আর একটী ঘটনাতে, গারফীল্‌ড ভদ্র ব্যবহার করিতে কত ভাল বাসিতেন, তাহা বুঝা গিয়াছিল। 'সখা'র পাঠকগণ বোধ হয় জানেন (অন্ততঃ যাঁহারা সহরে অথবা বড় নগরে থাকেন, তাঁহারা জানেন) যে কোন স্কুলে একটী বালক নূতন ভর্ত্তি হইলে তাহাকে কত কষ্ট পাইতে হয়। ছোট বড় সকল ছেলেই তাহাকে ক্ষেপাইয়া তুলে, এবং সুবিধা পাইলেই তাহাকে 'পাড়াগেঁয়ে ভূত' বলিয়া ঠাট্টা করে। আমরা নিজে জানি এই রূপ নূতন ছেলেরা কষ্ট পায়। গারফীল্‌ড্ যে বিদ্যালয়ে পড়িতেন, সেইখানে একবার একটী ছোট ছেলে নূতন আসিয়া 'ভর্ত্তি' হয়। সকলেই তাহাকে জ্বালাতন করিতে লাগিলেন। কেহ বলিলেন 'এটা পাড়াগেঁয়ে ভূত,' কেহ বলিলেন 'এটা নিতান্ত বাচ্ছা,' এইরূপে এক এক জন এক এক কথা বলিয়া বেচারা ছোট বালককে ঠাট্টা করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ দু চার ঘা চড় চাপড় দিতেও ছাড়েন না। ন্যায়বান গারফীল্‌ড্ এই সকল দেখিয়া বড় বিরক্ত হইলেন, এবং একদিন সকলকে ডাকিয়া বলিলেন "যে এই বালককে কষ্ট দিবে তাহাকে আমি আমার শত্রু বলিয়া মনে করিব।" গারফীল্‌ডের এই কথা শুনিয়া কেহ কেহ ঠাট্টা করিয়া বলিলেন "ওঃ এত দয়া যে? এমন কি গুণ ওর আছে যে তোমার মন ভিজিয়া গেল?" গারফীল্‌ড্ বলিলেন "গুণ থাকুক বা না থাকুক, উহার পিতা অথবা উহার বড় ভাই কেহই এখানে নাই; এমন সময়ে উহাকে এই অত্যাচার হইতে না রক্ষা করিলে কে উহার মুখের দিকে তাকায়?" বালকেরা হাসিয়া বলিল "তবে তুমি ছোট বালকের বাবাও হইবে, দাদাও হইবে?" গারফীল্‌ড্ এই কথার উত্তরে মুখ ভার করিয়া বলিলেন "বাবাই হই, আর দাদাই হই, আর যাই হই, ঠাট্টাই কর আর যাই কর, এই কথা মনে রাখিও যে আমার অপেক্ষা যদি কাহারও গায়ে জোর অধিক থাকে, তাহা হইলে এই বালকের প্রতি অত্যাচার করিতে আসিও, নতুবা মঙ্গল হইবে না।" গারফীল্‌ডের এই কথায় বালকদিগের মনে ভয় হইল, তাহারা সেই অবধি নূতন বালকদিগের প্রতি অত্যাচার করা ছাড়িয়া দিল; ছোট বালকেরাও বিপদাপদে গারফীল্‌ড্‌কে দেখিলে সাহস পাইতে লাগিল।

এইরূপ সচ্চরিত্র বালকই ধন্য। যাঁহারা বাল্যকালে এইরূপ ভাল হন, বড় হইলে তাঁহারা যে সকলের নিকট প্রশংসা পান এবং চরিত্রের গুণে সকলের উপরে থাকেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?



## ধূমপান।

একদিন পটলডাঙ্গার বাজারের এক দোকানে কি কিনিতে গিয়াছি, এমন সময় ছোট ছোট দুটী বাবু আসিয়া উপস্থিত। বয়স চৌদ্দ পানের বৎসর হইবে, কিন্তু এত বড় ছেলের যত দূর ভদ্রতা জানা উচিত তাহার কিছু তাঁহাদের মধ্যে দেখিতে পাইলাম না। পোষাক অতি পরিপাটী; বাঁদর বাঁধিবার মত করিয়া বুকে পিঠে চাদর জড়ান; কোঁকড়ান চুলে লম্বা সীথী; চক্ষের চাউনিতে যেন অহঙ্কার পোরা; জুতার শব্দ যাহাতে কিছু বেশী হয় মত করিয়া চলা; দেখিলেই বোধ হয় মা বাপ ইঁহাদের শিক্ষার সম্বন্ধে কিছু অযত্ন করেন। আমি যে দোকানে গিয়াছিলাম ছেলে দুটী সেইখানেই আসিলেন, আমার একটু কৌতূহল হইল। জানিলাম তাঁহারা চুরট কিনিতে আসিয়াছেন। দোকানদার চুরট দেখাইল। চুরট পসন্দ হইল না, একজন বলিলেন "এর চাইতে গুলি খাওয়া ভাল যে!"—আমি হতবুদ্ধি হইয়া থাকিলাম। ছেলেমানুষ তামাক খায়! কি লজ্জার কথা!

যে ছেলেরা তামাক খায় তাহাদের সঙ্গে বেড়াইতেও তোমাদিগকে পরামর্শ দিই না। তাহারা কখনও ভাল ছেলে নয়; তোমাদিগকে অনেক মন্দ বিষয় শিখাইয়া দিতে পারে, যাহার জন্য তোমরা বড় হইলে অনুতাপ করিবে। আমি এরূপ বলিতেছি না যে যাঁহারা তামাক খান তাঁহারা খারাপ লোক; দুঃখের বিষয় অনেক ভাল ভাল লোকও তামাক খান। কিন্তু তোমাদিগকে সাবধান করিয়া দিতেছি

তোমরা তামাক স্পর্শও করিও না; তামাক বিষ। তামাক খাইয়া ও যাঁহাদের বুদ্ধি পরিষ্কার রহিয়াছে, তাঁহারা যদি তামাক না খাইতেন তবে আরো কত ভাল থাকিতে পারিতেন। অন্যান্য অনেক দোষের মত তামাক খাওয়া কুসঙ্গের ফল; যে ছেলেরা তামাক খায় তাহাদের সঙ্গে বন্ধুতা করিওনা।

তামাক খাওয়ার অনেক দোষ। প্রথম, নিজের ক্ষতি। ডাক্তারেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন তামাকে মাথা গরম হয় এবং যাহারা তামাক খায় তাহাদের ঠোঁট প্রায়ই কাল হইয়া যায়।

তুমি বসিয়া রহিয়াছ, তামাকখোর তাঁহার যন্ত্র হাতে করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন, আর ভ্রূড় ভ্রূড় শব্দে রাশি রাশি ধূম তোমার নাকে মুখে দিতে লাগিলেন। তখন কি ইচ্ছা হয় না যে কাছে একটা লাঠি থাকিলে লোকটাকে কিছু ঔষধ দিয়া দাও?*

তৃতীয় দোষ, তামাক একবার যাহারা অভ্যাস করিয়াছে, অনিষ্ট হইতেছে দেখিয়া ও তাহারা ছাড়িতে চায় না। কাহারও নিকট গেলে সে যদি তামাক দিয়া অভ্যর্থনা না করিল তবে অনেক তামাকখোর তাহাকে অভদ্র মনে করে।

চতুর্থ দোষ, ডাক্তারেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে তামাকখোরেরা প্রায়ই শেষকালে মদখোর হইয়া উঠেন, তবেইতো কি ভয়ানক সর্ব্বনাশের পথ খোলা হইল ভাব দেখি?

পঞ্চম দোষ, কাপড়ে মুখে বিলক্ষণ দুর্গন্ধ হইয়া থাকে। তামাকখোর যে গেলাশে জল পান করিলেন, তোমার আমার সাধ্য নাই যে সেই গেলাশে জল পান করি। ভদ্র সমাজে যাওয়া কষ্ট—দুর্গন্ধে ভূত পলায়।

তামাকের নানারূপ আকার আছে,—নস্য, তামাক, এবং চুরোট। অনেকে শর্দ্দি হইলে নস্য লইয়া থাকেন, এবং তাহাতে শর্দ্দি আরাম হয় বলিয়া মনে করেন। কিন্তু আমরা জানি এইরূপে ঔষধ বলিয়া ব্যবহার করিতে গিয়া তাঁহারা নস্যের কেনা চাকর হইয়া পড়েন, আর তাহার হাত ছাড়াইয়া যাইতে পারেন না; আবার যে শর্দ্দির জন্য এই ঔষধ, তাহাও যেন বার মাস তাঁহাদের শরীরে লাগিয়া থাকে। তামাকের দুই রকম ব্যবহার দেখা যায়; এক ব্যবহার পানের সহিত চিবাইয়া খাওয়া, এবং অন্য ব্যবহার গুড় মাখিয়া আগুন দিয়া তাহার ধূম পান করা। বোধ হয় বলিতে হইবে না, আমরা ইহার কিছুই পসন্দ করি না। আর চুরোটের কথা কি বলিব? চুরোটের ফল যেরূপ খারাপ, মুখে শরীরে যেরূপ দুর্গন্ধ করিয়া দেয়, চুরোটটী কাহারও মুখে দেখিতেও সেইরূপ খারাপ। লেজের মত মুখে লাগিয়া আছে এবং তাহার এক পাশ হইতে যেন আগ্নেয়গিরির ধূমরাশি বাহির হইতেছে! ছি!

এ জঘন্য অভ্যাস শীঘ্রই সকলের পরিত্যাগ করা উচিত। আমাদের অনেকের অভিভাবক ধূম পান করেন, কিন্তু তাই বলিয়া যে আমাদিগকেও সেই পথে যাইতে হইবে, কে বলিল? যাঁহারা অভিভাবকদিগকে তামাক খাইতে দেখিয়া মনে করেন, বড় হইলে ভদ্র সমাজে তামাক খাওয়াই উচিত, তাঁহারা আপন আপন অভিভাবকদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখুন দেখি, নিজেরা তামাক খোর হইলেও তাঁহারা বালকদিগকে তামাক স্পর্শ করিতে পরামর্শ দেন কি না? আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস তাঁহারা এরূপ পরামর্শ কখনই দিবেন না। নিজেরা কুৎসিৎ কার্য্য করেন বলিয়া যে ছোট ভাই, ভাইপো, অথবা ছেলেদিগকেও তাহা করিতে বলিবেন, ইহা সম্ভব নহে। আমার কোন অভিভাবক ভয়ানক তামাকখোর, অথচ আমি বাল্যকালে একদিন কুসঙ্গে থাকিয়া হুঁকা হাতে করিয়াছিলাম দেখিয়া তিনি আমাকে ভয়ানক বেত্রাঘাত করিতে ছাড়েন নাই। 'সখা'র পাঠকগণের মধ্যে যদি কেহ ধূমপায়ী থাকেন, আমাদের আশা, তাঁহারা শীঘ্রই এই কু-অভ্যাসের হাত ছাড়াইয়া পলাইবেন। স্কুলের শিক্ষকগণ যত্ন করিলে স্থানে স্থানে এই বিষয়ের আলোচনার জন্য সভা হইতে পারে।

* এত শক্ত শাস্তি না দেওয়াই ভাল। যাহা হউক, লেখকের তামাকের প্রতি কত বিদ্বেষ, ইহাতে তাহাই বুঝা যাইতেছে। স, স।

---



## প্রাপ্তি-স্বীকার।

আমরা ঢাকা নিবাসী বাবু নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত "ব্রাহ্মধর্ম্মের লক্ষণ ও উপাসনা পদ্ধতি" নামক এক খানি ছোট পুস্তক সমালোচনার জন্য পাইয়াছি। বালক বালিকাদিগের উপকারে আসিতে পারে এইরূপ পুস্তক ভিন্ন আমরা অন্য পুস্তকের সমালোচনা করি না, সুতরাং আমরা এই পুস্তক খানির সম্বন্ধে কিছুই মতামত দিতে পারিতেছি না। তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে যদি আমাদের কোন পাঠক অথবা পাঠিকা 'ব্রাহ্মধর্ম্ম কি?' তাহা জানিতে চান, তাহা হইলে এই পুস্তকে সে বিষয়ে অনেক জানিতে পারিবেন। পুস্তকের মূল্য এক আনা মাত্র।

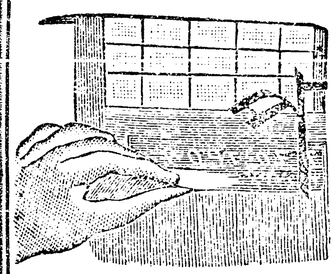

---



## ত্রপ্রেরকদের, প্রতি।

দেবনারায়ণ ঘোষ, বগুড়া—১। আপনার সমস্ত পত্র গুলিই পাওয়া গিয়াছে; রচনা সংশোধন করিবার সময় নাই বলিয়া প্রকাশিত হইতেছে না; যাহা হউক কাগজে প্রকাশিত হউক বা না হউক আপনি ক্রমাগত রচনা করিবেন। ইহাতে কালে বিশেষ উন্নতি হইবে, আশা করা যায়। ২। বাবু শিবনাথ শাস্ত্রী 'সখা'র সম্পাদক নহেন—সম্পাদকের নাম প্রকাশ করা প্রয়োজনীয় নহে।

**শ্রীশারদানাথ খাঁ, বগুড়া।**—আপনাদিগের উৎসাহপূর্ণ পত্রের জন্য ধন্যবাদ দিতেছি। 'সখা' পাঠে আপনাদিগের উপকার হয়, এ সংবাদে 'সখা'র লেখক ও লেখিকা মাত্রেই সুখী হইবেন।

**শ্রীনীলকমল সরকার লাহিড়ী।**—রচনাটি মন্দ হয় নাই, কিন্তু স্থানে স্থানে বিশেষরূপে বদলাইয়া দেওয়া প্রয়োজন বোধ হইল, সেরূপ সময় আমাদের নাই। যদি আপনার নিকট রচনার নকল একটী থাকে তাহা হইলে 'কি ছার কুসুম' ইত্যাদি দুই এক স্থল বদলাইয়া দিবেন।

**শ্রীকেশবচন্দ্র মজুমদার, মালতীনগর।**—আপনাদিগের উপকার হইতেছে জানিলেই আমরা কৃতার্থ হইব। আপনার উৎসাহপূর্ণ পত্রের জন্য ধন্যবাদ।

**শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, গোপালপুর।**—একটী ভিন্ন সমস্ত প্রশ্নগুলির উত্তর হইয়াছে।

**শ্রীক্ষেত্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শালডাঙ্গা।**

**শ্রীবামাপদ চট্টোপাধ্যায়, কালনা।**—দুইটী ভিন্ন সমস্ত গুলির উত্তর হইয়াছে।

---

## ধাঁধা।

পূর্ব্ববারের প্রশ্নগুলির উত্তর।

১। 'কমল' নিরাকার অর্থাৎ আকার নাই তাহাতে আকার যোগ করিলে 'কমলা' হইল।

২। ক র ভ প্রথম অক্ষরগুলিতে 'কলিকাতা'
লি খি য়া এবং
কা মা ন শেষের অক্ষরগুলিতে 'ভয়ানক'
তা মা ক হইল।

৩। সু শী ল এবং ত র লা
শী ত ল র সা ল
ল ল না লা ল সা

৪। অবিমৃষ্যকারিতা ; মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

৫। পকেট ঘড়ি।

শ্রীজ্যোতিশচন্দ্র মিত্র, কলিকাতা ; শ্রীদেবনারায়ণ ঘোষও শ্রীশরদানাথ খাঁ, বগুড়া ; ইহাঁরা উপরের প্রশ্নগুলির ঠিক উত্তর করিয়া পাঠাইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সরকার, কলিকাতা এবং শ্রীকেশবচন্দ্র মজুমদার, মালতীনগর ; ইহাঁরা একটী ভিন্ন আর সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন।

নূতন।

১। f—f—f—=খাইতে মিষ্ট।—t—t—t—t—খাইতে মিষ্ট।

২। পুস্তকেতে আছি আমি, নাই কিন্তু মনে,
কাননেতে আছি আমি, নাই কিন্তু বনে।
কলিকাতা মাঝে আমি দুই ঠাঁই থাকি,
অথচ সহরে মোরে পাবেনা নিরখি।
শিক্ষকেতে আছি আমি পণ্ডিতেতে নাই।
বল দেখি কোন্ প্রাণী আমি হই ভাই।

৩। আমার ১ম ও ৩য় অক্ষর···এক সঙ্গে লইলে—আশা।

——১ম ও ৪র্থ অক্ষর···ফলারে বামণের আশা কিন্তু পোড়োর ভয়।

——১ম ও ৫ম অক্ষর···বড়লোকে মাথায় বাঁধে।

——২য় ও ৪র্থ অক্ষর ··এ সময়ে ছেলেরা বাহির হয় না।

——২য় ও ৫ম অক্ষর...চটা মেজাজ।

——২য়, ৩য় ও ৬ষ্ঠ অক্ষর···একটা রাক্ষস।

বলত আমি কে ?

১। নিম্নলিখিত অক্ষরগুলি যথা স্থানে বসাইয়া তাহাতে কি নাম হয় তাহা বাহির করঃ—

| নাম | বিশেষ পরিচয় |
|---|---|
| সূর্যতাদীত্র | এই দোষে লোকের কোন কাজ হয় না ; এ দোষ যাহাকে ধরে তাহাকে কি বিদ্যালয়ে কি অর্থোপার্জ্জনে কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে দেয় না। ইংরাজীতে ইহাকে লোকে সময়ের চোর বলিয়া থাকে। |
| রণতাশ্ব পয়রাঈ | এই গুণ থাকলে মানুষ কখনও ক্লেশে পড়ে না, ঈশ্বরই তাহার সহায় হন। |

৫। একটী ছেলে তান ছেড়ে দেশের কাছে গেল ; অমনি সে একটী ভাল খাবার জিনিশ হয়ে গেল ! বল দেখি কেমন ক'রে ?

৬। তিনটী অক্ষরে নাম যথা তথা মম ধাম
দ্বিতীয় ছাড়িলে অর্থ অল্প-মাত্র হয়।
তৃতীয়ে ছাড়িলে পরে যন্ত্র অর্থ সবে করে
ভাষার বাহক আমি কেবা মহাশয় ?

---

# সখা

## সংক্রান্ত নিয়মাবলী।

১। 'সখা'র অগ্রিম বার্ষিক মূল্য এক টাকা মাত্র। মফঃস্বলে স্বতন্ত্র ডাক মাশুল লাগিবে না। আগামী মার্চ্চ মাসের পরে যাঁহারা গ্রাহক হইবেন, বিদেশবাসী হইলে তাঁহাদের পক্ষে পত্রিকার মূল্য ১।০ এক টাকা চারি আনা নির্দ্দিষ্ট হইবে। প্রতি খণ্ডের নগদ মূল্য ৵১০ মাত্র।

২। পত্রিকাস্থ চিত্রের সংখ্যা কিছুই নির্দ্দিষ্ট থাকিবে না, তবে প্রত্যেক সংখ্যায় যাহাতে অন্ততঃ এক খানি চিত্র থাকে আমরা সেদিকে দৃষ্টি রাখিব।

৩। বালকবালিকাদিগের রচনা উৎকৃষ্ট হইলে তাহা সাদরে গৃহীত হইবে ; তবে সুদীর্ঘ হইলে প্রকাশিত হইবে না।

৪। শিক্ষক এবং অভিভাবকদিগের পরামর্শ প্রভৃতি সাদরে গৃহীত হইবে।

৫। বালক বালিকাদিগের উপকারে আসিতে পারে, কেহ এরূপ কোন রচনা বা কোন সংবাদ কিম্বা সত্য ঘটনার বিশেষ বিবরণ আমাদিগের নিকট পাঠাইলে আমরা তাহা সাদরে প্রকাশ করিব।

৬। সখা-সংক্রান্ত সমস্ত পত্রাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইতে হইবে। কেবল রচনা, পরামর্শ প্রভৃতি সম্পাদকের নামে কার্য্যালয়ের ঠিকানায় পাঠান আবশ্যক।

৭। ঠিকানার পরিবর্ত্তন, নামের গোল, বা কার্য্য-সম্বন্ধীয় অন্য কোন অসুবিধা হইলে মোড়কের উপরে যে নম্বর দেওয়া থাকিবে, সেই নম্বরের উল্লেখ করিয়া পত্র লিখিতে হইবে।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে মুদ্রিত এবং ৫০নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট "সখা" কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

প্রথম ভাগ। ১লা এপ্রেল ১৮৮৩, রবিবার। ৪র্থ সংখ্যা।

জর্জ ষ্টিফেন্‌শন— ৫৭ পৃষ্ঠা।

# রামায়ণের উপদেশ।

## (খ) হরিশ্চন্দ্রের স্বর্গবাস ও পতন।

হরিশ্চন্দ্রের পূর্ব্বে অযোধ্যাতে অনেক রাজা ছিলেন—কিন্তু কেহই আমাদের ভক্তি পান নাই, আর রাজা হরিশ্চন্দ্রকেই বা এত ভক্তি করি কেন? ভক্তি করিবার কারণ আছে; হরিশ্চন্দ্রের জীবন উপদেশে পূর্ণ। আমরা সচরাচর কি দেখিতে পাই? বড়লোক হইলে প্রায়ই ধার্ম্মিক হয় না—যাহার টাকা আছে সে প্রায়ই অহঙ্কারে মাতিয়া পরম ধন যে ধর্ম্ম তার দিকে মন দিতে চায় না। এই যখন পৃথিবীর দশা, তখন যদি দেখি একজন বড়লোক রাশি রাশি টাকার অধিকারী হইয়াও অহঙ্কারী নন, যদি দেখি একজন রাজা হাজার হাজার লোকের প্রধান হয়ে, কখনও তাদের কটু কথা বলেন না, বা অপকার করেন না, যদি দেখি পৃথিবীতে যত সুখ থাকিতে পারে সে সকল সুখে সুখী হয়েও একজন অতি প্রধান পুরুষ ধর্ম্মের জন্য সব ত্যাগ করিয়াছেন, তাহা হইলে আর আমাদের আশ্চর্য্যের সীমা থাকে না। এই জন্যই আমরা ভক্তির সহিত, আশ্চর্য্যের সহিত হরিশ্চন্দ্রের গল্প পড়িয়া থাকি বা শুনিয়া থাকি। যে সময় হরিশ্চন্দ্র অযোধ্যার রাজা ছিলেন, তখন অযোধ্যাই ভারত বর্ষের মধ্যে সর্ব্ব প্রধান নগরী ছিল, তখন অযোধ্যার রাজার নামে চারিদিকের রাজারা ভয়ে কাঁপিতেন। হরিশ্চন্দ্র এত বড় রাজা হইয়াও কখনও অহঙ্কৃত হন নাই; সৎপথে থাকিয়া রাজ্য শাসন করাই হরিশ্চন্দ্র পরম ধর্ম্ম বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহার ও তাঁহার স্ত্রী শৈব্যার রোহিতাশ্ব নামে সবে একটী পুত্র ছিল। হরিশ্চন্দ্র এই রোহিতাশ্বকে অধিক ভাল বাসিতেন, কি আপন প্রজার উপকার করাকে অধিক ভাল বাসিতেন, তাহা স্থির করা কঠিন। হরিশ্চন্দ্র মৃগয়া অর্থাৎ পশুশিকার করিতে বড়ই ভালবাসিতেন। রাজকার্য্য করিয়া অবসর পাইলেই অথবা মন্ত্রীকে রাজকার্য্যের ভার দিয়া হরিশ্চন্দ্র মধ্যে মধ্যে আপন রাজ্যের নানা স্থানে বনে বনে বন্যপশু মারিয়া ফিরিতেন।

এই মৃগয়া করিবার জন্য একদিন হরিশ্চন্দ্র এক প্রকাণ্ড বনের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। প্রথমে এজন্ত ওজন্ত শিকার করিয়া অবশেষে হরিশ্চন্দ্র একটা বরাহ অর্থাৎ বুনো শূকর বধ করিবার জন্য এত মত্ত হইলেন, যে তাঁহার সঙ্গীরা কেহই তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে যাইতে পারিল না। তিনি একটা বন হইতে আর একটা বনে, অল্পবন হইতে বেশী বনে যাইতে লাগিলেন, কিন্তু তথাপি বরাহ বধ হয় না—হঠাৎ তাঁহার কাণে কি একটা শব্দ আসিল। যে দিক হইতে শব্দটী আসিতেছিল, সেই দিকে কাণ পাতিয়া হরিশ্চন্দ্র শুনিতে পাইলেন, কতক গুলি স্ত্রীলোক চীৎকার করিয়া কাঁদিতেছে, এবং 'কোথায় মহারাজ হরিশ্চন্দ্র রক্ষা কর!' এই বলিয়া তাঁহাকেই ডাকিতেছে। পরম ধার্ম্মিক হরিশ্চন্দ্রের হৃদয় এই কাতর বাক্যে বড়ই ব্যথিত হইল—তিনি বরাহ বধ ছাড়িয়া দিয়া যে দিক হইতে রোদনের শব্দ আসিতেছিল, সেই দিকে চলিলেন, এবং 'ভয় নাই, ভয় নাই,' এই কথা বলিতে বলিতে শীঘ্রই সেই গভীরবন ছাড়িয়া একটা নিকটবর্ত্তী বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

যেখানে হরিশ্চন্দ্র উপস্থিত হইলেন, বাস্তবিক ধরিতে গেলে তাহাকে বাড়ী বলা যায় না; চারিদিকে সুন্দর সুন্দর গাছ মিলিয়া একটী ঘরের মত হইয়াছে—তাহার ভিতরে একটী বেদী অর্থাৎ বসিবার আসন। দুএকখানি কুঁড়ে ঘর যা আছে, তাও ঘর নয় বলিলেও হয়। কিন্তু এই স্থানের স্বাভাবিক শোভা অতি সুন্দর। এই রূপ স্থানটী মুনি বিশ্বামিত্রের আশ্রম বা তপোবন; এইখানে বসিয়া মুনি, দেব-পূজা বা তপস্যা করেন—এ খানে আসিলেই চারিদিকের সৌন্দর্য্য দেখিয়া



মন পবিত্র ভাবে পূর্ণ হয়। এই খানে যে বিশ্বামিত্রের তপোবন, তাহা হরিশ্চন্দ্র জানিতেন না সুতরাং যখন তিনি আসিয়া দেখিলেন, কতকগুলি স্ত্রীলোক বাঁধা রহিয়াছে এবং প্রাণ যাইবার ভয়ে তাহারা কাঁদিতেছে—তখন তিনি অগ্র-পশ্চাৎ না ভাবিয়া তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিলেন, এবং অল্পকালের মধ্যেই অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিলেন।

এদিকে বিশ্বামিত্র সংবাদ পাইলেন হরিশ্চন্দ্র তাঁহার তপোবনে প্রবেশ করিয়া যে মেয়েদের তিনি বাঁধিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন—তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিয়াছেন। তখনি তিনি ভয়ানক রাগিয়া উঠিলেন—মনে মনে ভাবিলেন "কি? আমার তপোবনে আমার অনুমতি না নিয়ে এসে আবার আমারই উপর অত্যাচার? এর শোধ যদি না দিই তবে আমার নাম বিশ্বামিত্রই নয়!" এই ভাবিয়া বিশ্বামিত্র অযোধ্যায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং বজ্রের ন্যায় কর্কশ স্বরে ডাকিয়া বলিলেন "ওরে দুরাত্মা, তুমি রাজা হয়ে বড় অহঙ্কৃত হয়েছ? তোমার কি সাহস—আমার তপোবনে গিয়ে সেই মেয়েদের খুলে দিয়ে এসেছ?" বিশ্বামিত্রের রাগ দেখিয়া হরিশ্চন্দ্রের ভয় হইল; তিনি বলিলেন "ঠাকুর, আমিতো জানি না আপনি বেঁধেছেন? আমি শুনিলাম কতকগুলি স্ত্রীলোক 'রক্ষা কর' 'রক্ষা কর' বলিয়া কাঁদিতেছে; আমি ক্ষত্রিয়, দান করা, রক্ষা করা, এসকল আমার স্বধর্ম্ম, তাই নিজ ধর্ম্মানুসারে মেয়েদের ছাড়িয়া দিয়াছি, আমাকে ক্ষমা করুন।" বিশ্বামিত্র হরিশ্চন্দ্রের এই মহৎ কথাগুলি শুনিয়া কিছু হটিয়া গেলেন—কিন্তু তিনি জব্দ করিতে আসিয়াছিলেন, এই কথাতেই চুপ করিয়া গেলেতো জব্দ করা হয় না! তাই বলিলেন "তুমি দান করে থাক, না? আচ্ছা আমাকে দাও দেখি কি দেবে?" হরিশ্চন্দ্র বলিলেন "প্রভো, আপনাকে ধন-জন-পূর্ণ আমার সমস্ত রাজ্য দিলাম।" বিশ্বামিত্র ইহাতেও না পারিয়া দক্ষিণার ছল করিয়া হরিশ্চন্দ্রকে বিপদে ফেলিলেন। তোমরা বোধ হয় সকলেই জান ব্রাহ্মণেরা পূর্ব্বকালে কাহারও বাড়ীতে আহার করিতেন না, অথবা কাহারও দান লইতেন না; যদি কাহাকেও এই বিষয়ে অনুগ্রহ করিতেন তাহা হইলে এই অনুগ্রহের জন্য তাঁহাকে কিছু টাকা দিতে হইত; এই টাকার নাম দক্ষিণা এখনও অনেক স্থানে ব্রাহ্মণেরা কাহারও বাটীতে আহার করিলে এইরূপ দক্ষিণা লইয়া থাকেন। বিশ্বামিত্র বলিলেন "তোমার দান আমি লইলাম; যেমন দান তেমনি দক্ষিণা চাই, এই দানের মতন দক্ষিণা সাত কোটী মোহর আমাকে দিতে হইবে।" হরিশ্চন্দ্র চারিদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন; এত টাকা কোথায় পাইবেন?—নিজের ধনাগারে টাকা আছে বটে, কিন্তু তাহাতো দান করিয়াছেন; কাহার ধন কাহাকে দিবেন? হরিশ্চন্দ্রকে ভাবনায় পতিত দেখিয়া বিশ্বামিত্র মনে মনে ঘৃণার সহিত হাসিলেন, এবং ঠাট্টার স্বরে বলিয়া উঠিলেন "বড় নিজের ধর্ম্মের জাঁক করা হচ্ছিল! হারে পামর! এখন দক্ষিণা দেবার বেলা মুখ শুকিয়ে গেল কেন?" হরিশ্চন্দ্র স্থির ভাবে বলিলেন "ঠাকুর, আপনি অনুগ্রহ করে এক মাস অপেক্ষা করুন; আমি উপার্জ্জন করে আপনার দেনা পরিশোধ করিতেছি।" বিশ্বামিত্র আরও রাগিয়া বলিলেন "তুমি রোজগার করেই আন আর চুরি করেই আন—এক মাসের মধ্যেই দিতে হবে; আর আমার এ রাজ্য থেকে তুমি চলে গিয়ে যা খুসি তাই করগে। কাশী আমার পৃথিবী রাজ্যের মধ্যে নয়, তুমি সেই খানে যাও।" এই বলিয়া বিশ্বামিত্র স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন; হরিশ্চন্দ্রও দুঃখিত মনে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

হরিশ্চন্দ্রের দুঃখের কারণ এ নহে যে তিনি কেন না বুঝিয়া পৃথিবী দান করিলেন; কিন্তু উহাঁর

দুঃখের কারণ অনেক গুলি;—প্রথম তিনি না জানিয়া, অগ্র পশ্চাৎ না ভাবিয়া, কোন একজন মুনির ক্ষতি করিলেন? দ্বিতীয়,—মুনি যদি রাগান্বিত হইয়া তাঁহার রাজ্যের কোন অপকার করেন, তাহা হইলে তাঁহারই দোষে তাঁহার প্রজারা কষ্ট পাইবে; তৃতীয়,—দক্ষিণার টাকা উপার্জ্জনে যে ক্লেশ হইবে, তাহাতে তিনি কাতর নন, কিন্তু সেই কষ্টের সময় মহারাণী শৈব্যা ও বালক রোহিতাশ্ব কোথায় দাঁড়াইবে? কার মুখ চেয়ে বাঁচিবে? তিনি তাঁর সত্যের জন্য দায়ী—প্রাণ দিয়ে নিজের সত্য পালন করিবেন, কিন্তু তাঁহার জন্য অন্য লোকে কষ্ট সহ্য করিবে, একি বিষম বিপদ এইরূপ ভাবনাতেই হরিশ্চন্দ্রের মুখ শুকাইয়া গেল। তিনি মলিনমুখে অন্তঃপুরে—যেখানে রাজরাণী ও রাজকুমার ছিলেন, সেইখানে গিয়া উপস্থিত হইলেন!

শৈব্যা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত হরিশ্চন্দ্রের পথ চাহিয়া ছিলেন; তিনি আসিলে তাঁহার ম্লানমুখ দেখিয়াই শৈব্যার প্রাণ উড়িয়া গেল। অধিক বিলম্ব করিতে হইল না, হরিশ্চন্দ্র শৈব্যাকে সমস্তই খুলিয়া বলিলেন। হরিশ্চন্দ্রের মুখে তাঁহার প্রতিজ্ঞার কথা শুনিয়া শৈব্যা ভয় বা কষ্ট কিছুই বোধ করিলেন না। বরং স্বামী যাহাতে নিজের কথা রাখিয়া ধর্ম্মে বজায় থাকিতে পারেন, তাহার জন্য স্বামীর সহিত কাশীতে যাইতে চাহিলেন। বালক রোহিতাশ্বও পিতার সাহায্য করিবে বলিয়া উৎসাহিত হইয়া উঠিল। রাজ্যের দুটী একটী প্রধান কর্ম্মচারী ভিন্ন, আর কেহই এ সম্বাদ জানিল না। জানিলে তাহারা তাহাদের পিতৃতুল্য রাজার সঙ্গে সঙ্গেই চলিয়া আসিত। রাত্রির অন্ধকারে প্রজাদিগকে ফাকি দিয়া প্রজার পিতা হরিশ্চন্দ্র ধর্ম্মপালনের জন্য অযোধ্যা ত্যাগ করিলেন।

হরিশ্চন্দ্র চলিয়া গেলে অযোধ্যার দশা কি হইল তাহা বলিতে চাই না; হরিশ্চন্দ্র রাণীকে এবং রোহিতাশ্বকে লইয়া কোথায় গেলেন, আইস তাহাই দেখি। যথাসময়ে হরিশ্চন্দ্র কাশীতে পৌছিলেন।—অনেক দিন, কি করিবেন এই ভাবনাতেই গেল।—অবশেষে বিশ্বামিত্রের টাকা দিবার দিন আসিল।—শৈব্যা আর উপায় নাই দেখিয়া বলিলেন "আমাকে বিক্রয় করিয়া আপনার অর্থ পরিশোধ করুন, আর ভাবিয়া কি হইবে?"—যখন শৈব্যা এই কথা বলিতেছিলেন, তখন দুঃখে তাঁহার গলার স্বর বন্ধ হইয়া আসিল—তিনি যে দাসী হইবেন, তাহাতে কষ্ট কি? কিন্তু তিনি চলিয়া গেলে হরিশ্চন্দ্রের ক্লেশ হইবে—বালক রোহিতাশ্ব কাহার মুখ চাহিয়া দাঁড়াইবে, এই ভাবনায় তাঁহার প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল।—শৈব্যা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন "মহারাজ—আর বিলম্বে কাজ নাই। যাহাতে নিজের কথা থাকে তাহা করুন।" হরিশ্চন্দ্র ব্যথিত মনে 'কেউ দাসী কিনিবে? কাহারও দাসীর প্রয়োজন আছে?' এই বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন।—এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কে দাসী বিক্রী ক'চ্ছ, বাপু? আমার একটী দাসী চাই। 'এই—এই দাসীটী—তা বেশ! বাপু, কত হলে দাসীটী পাওয়া যায়?" হায়! হায়! ধর্ম্মের জন্য কি কষ্ট-স্বীকার! হরিশ্চন্দ্র বলিলেন "৩ কোটী মোহর চাই।" ব্রাহ্মণ তাহাতেই রাজি হইলেন, কিন্তু যখন রোহিতাশ্ব—'মাকে কোথায় নিয়ে যাও' বলিয়া মায়ের অঞ্চল ধরিয়া চোখের জলে বুক ভাসাইতে লাগিল, তখন ভয়ানক বিপদ উপস্থিত হইল। শৈব্যা বলিলেন "ঠাকুর, আপনাকে পয়সা দিতে হইবে না—এ ছেলেটীকেও আপনি ক্রয় করুন; আপনার পূজার আয়োজন করা, ফুলটুল তুলে দেওয়া, এসব পার্‌বে।" ব্রাহ্মণ বলিলেন "না বাপু, আর আমি বেশী লোক নিয়ে খেতে দিতে পার্‌বো না;—



আবার ছেলে মানুষ, কত দুষ্ট, তা কে জানে।" ব্রাহ্মণ, তুমি কি নিষ্ঠুর?—ঐ দেখ শৈব্যা চোখে অঞ্চল দিয়া কাঁদিতেছেন—একটী ছোট ছেলেকে মা ছাড়া করে রাখিতে চাহিতেছ? কি নিষ্ঠুর?—শৈব্যা বলিলেন "আমার পুত্র আপনার চাকর হইয়া থাকিবেক; উহাকে আহার দিবার জন্য আপনাকে ভাবিতে হইবে না—আমাকে যাহা দিবেন, তাহা হইতেই উহার আহার চলিবেক।"

ক্রমশঃ—

---

## জেমৃশ্ এব্রাম গার্‌ফীল্‌ড্।

প্রথমে দুটী কথা বলা আবশ্যক। বিদেশীয় নামগুলি লইয়া কোন কোন বালক আমাদিগকে বড়ই ত্যক্ত করিয়াছেন; তাঁহারা বলেন "প্রথমটীই নাম, শেষেরটীতো বংশের উপাধি, তবে সাহেবদিগকে শেষের নামে ডাকা হয় কেন? ইহাতে এক বংশের অনেকের মধ্যে গোল হয় না?" এই প্রশ্নের উত্তর সংক্ষেপে দিতেছি। সাহেবদিগের শেষের নামটী বংশের;—যেমন সেন বংশ, দাস বংশ, কি রায় বংশ, সেইরূপ গার্‌ফীল্‌ড্ বংশ, এ কথা সত্য, এবং পূর্ব্বের নামগুলি পিতা মাতার দ্বারা তাঁহাদের নিজের নামের সহিত মিলাইয়া বা কোন বড় লোকের নামের সহিত মিলাইয়া রাখা হয়, সুতরাং সেইগুলিই যথার্থ নাম, তাহাও সত্য, কিন্তু সাহেবদিগের মধ্যে এই নিয়মই চিরকাল চলিয়া আসিতেছে যে প্রত্যেককে বংশের নাম ধরিয়া ডাকা হয়। তবে পিতা মাতা কিম্বা বয়সের বড় অন্য কোন নিকট আত্মীয় হইলে, তাঁহারা প্রথম নামেই ডাকেন। যদি এক স্থানে এক বংশের দুই তিন জন থাকেন, তাহা হইলে প্রথম ও শেষের নাম দুই ধরিয়া বাছিয়া লওয়া হয়। এই সম্পর্কে আর একটী কথা আছে। সাহেবদের বংশের নামের আগে যে দুটী নামই থাকিবে তাহার অর্থ নাই—কাহারও একটী কাহারও বা তিনটী থাকে; সুতরাং আমাদের যেমন 'সতীশ' বলিলেই 'চন্দ্র' তাহার পরে আপনি বসে—সাহেবদিগের সেইরূপ একটী নাম আর একটী নামের উপর নির্ভর করে না; প্রত্যেকটীই স্বতন্ত্র।

আমাদিগের দ্বিতীয় কথা আমেরিকার সম্বন্ধে। উত্তর আমেরিকার খানিকটা স্থান পূর্ব্বে ইংরাজদিগের অধীন ছিল, কিন্তু ইংরাজেরা কোন কোন বিষয়ে কিছু কিছু অত্যাচার করাতে সেই স্থানের লোকেরা দল বাঁধিয়া তাহাদিগকে যুদ্ধ করিয়া তাড়াইয়া দেয়। এই দলের কর্ত্তার নাম জর্জ ওয়াশিংটন। ইহাঁর সম্বন্ধে এখন কিছুই বলিবার নাই, তবে এই বলিলেই চলিতে পারে যে যখন ইংরাজেরা ইহাঁদের দেশ ছাড়িয়া চলিয়া গেল, তখন সে দেশের রাজকার্য্য কি ভাবে চলিবে, ইনি সে বিষয়ে অনেক পরামর্শ দেন, এবং ইহাঁরই চেষ্টাতে স্থির হয় যে এ দেশের কেহই রাজা থাকিবেন না, সকলে মনোনীত করিয়া একদল লোক বাছিয়া দিবেন, তাঁহাদের পরামর্শে সমস্ত কাজ চলিবে, এবং সকলে মনোনীত করিয়া কয়েক বৎসরের জন্য এমন একজনকে বাছিয়া দিবেন, যিনি এই মহাসভার কর্ত্তা হইবেন, এবং যাঁহার নামে আমেরিকার সমস্ত রাজকার্য্য চলিবে। এই কর্ম্মচারীর নাম 'প্রেসিডেণ্ট।' যে উপযুক্ত হইবে সেই এই কার্য্য পাইতে পারিবে, ইহাতে ছোট বড়

বিচার থাকিবে না; একজন সামান্য পথের মুটে পর্য্যন্ত আশা করিতে পারিবে যে, লেখা পড়া শিখিয়া খুব বুদ্ধিমান এবং উপযুক্ত হইলে সেও একদিন আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট হইতে পারে। গরিবের ঘরে জন্মিলে আমেরিকায় কোন ভয় নাই, গুণ থাকিলেই প্রত্যেকে তাহার উপযুক্ত আদর পায়।

এমন আমেরিকা দেশে এক গরিবের ঘরে মহাত্মা গার্‌ফীল্‌ড্ জন্মগ্রহণ করেন। গার্‌ফীল্‌ড্ তাঁহার বাপ মায়ের সর্ব্বকনিষ্ঠ সন্তান, এই জন্য বাপ মায়ের বড় ভালবাসার পাত্র ছিলেন। যখন গার্‌ফীল্‌ডের বাপ মরিয়া যান, তখন গার্‌ফীল্‌ড্ অতি অল্প বয়স্ক। গার্‌ফীল্‌ড্-পরিবার যেখানে বাস করিতেন, তাহার চারিদিকেই জঙ্গল; তাহার মাঝের একটু স্থান পরিষ্কার করিয়া তাঁহারা নিজেদের বাড়ী প্রস্তুত করিয়াছিলেন। একবার এই বনে আগুন লাগিয়া গেল, ভয়ানক রৌদ্রে গাছপালা প্রায় শুষ্ক হইয়াছিল, সুতরাং চারিদিক পোড়াইয়া ভয়ানক বেগে আগুন গার্‌ফীল্‌ড্‌দিগের ঘরেরদিকে আসিতে লাগিল। বাড়ী ঘর, ছেলে মেয়ে, সকলই বুঝি এইবার যায়, এই ভয়ে গার্‌ফীল্‌ডের পিতা ভয়ানক সাহসের সহিত সেই প্রচণ্ড রৌদ্রে দাঁড়াইয়া গাছ কাটিয়া আগুনের পথ বন্ধ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অনেক চেষ্টার পর অগ্নি থামিল বটে, কিন্তু ভয়ানক গরমে শরীর উত্তপ্ত হইয়াছিল, তাহার পর অনেকক্ষণ শীতল বাতাসে বসিয়া থাকাতে অল্প সময়ের মধ্যেই কাশরোগে হঠাৎ গার্‌ফীল্‌ডের পিতা মরিয়া গেলেন; যে পরিবারটীকে প্রাণে বাঁচাইবার জন্য তিনি নিজে মারা পড়িলেন, তাহাদের জন্য কিছুই পুঁজি করিয়া রাখিয়া যাইতে পারিলেন না। কেবল মরিবার সময় গার্‌ফীল্‌ডের মাতাকে এই কথা বলিয়া গেলেন,—"যে ঈশ্বর এতদিন রক্ষা করিয়াছেন, তিনি এখনও রক্ষা করিবেন; আমার বালক বালিকাদিগকে তোমার কাছে রাখিয়া গেলাম, ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া তোমার সুবুদ্ধির দ্বারা ইহাদিগকে চালাইও।

গার্‌ফীল্‌ডের পিতার মৃত্যু হইলে অনেকে তাঁহাদিগকে সে স্থান ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে পরামর্শ দিয়াছিল, কিন্তু গার্‌ফীল্‌ডের মাতা তাহাতে স্বীকৃতা হইলেন না। তিনি নিজে অত্যন্ত পরিশ্রমশীলা ছিলেন, তাহাতে তাঁহার বড় পুত্র টম্ ভয়ানক পরিশ্রমের সহিত ক্ষেতের কাজ করিতে লাগিল; কাজেই সেই পরিবারের বিশেষরূপ কষ্ট ছিল না। যদিও বা কখনও কষ্ট হইত, তাহা হইলে তাঁহারা এই ভাবিয়া সকল কষ্ট ভুলিতেন যে সৎপথে থাকিয়া কষ্ট পাইলে, তাহাতে দুঃখ নাই।

টমের বয়স এই সময় ১১ বৎসর মাত্র, কিন্তু পরিশ্রম করিতে তিনি বুড়ো মানুষের মত মজবুত ছিলেন। লাঙ্গল চষা, গাছ রোপণ করা, বীজ ছড়ান, কাঠ কাটা, গরু দোহা, এইরূপ অনেক কাজে টম প্রাণপণে খাটিতে লাগিলেন। মা বাড়ীতে বসিয়া চরকায় কাটিয়া ছেলে মেয়েদের জন্য কাপড় প্রস্তুত করেন। এইরূপে সেই গরিব পরিবারটী অনেককাল সেই স্থানে কাটাইলেন। নিজেদের বাড়ীর আবশ্যকীয় কাজ করিয়াই যে টম্ স্থির থাকিতেন, তাহা নহে; তাঁহাদের বাড়ীর নিকটে একটী পরিবারের একজন চাকরের প্রয়োজন হইয়াছিল;—টম্ মায়ের পরামর্শে অমনি সেখানে গিয়া চাকরী আরম্ভ করিলেন। এইরূপে যে টাকা উপার্জ্জন করা হইল, বালক গার্‌ফীল্‌ডের জন্যই তাহা কাজে আসিল; তাঁহার একযোড়া জুতা হইল, (ইহার পূর্ব্বে আর জুতা ছিল না;—গরিব কোথায় পাইবেন?) এবং তাঁহার স্কুলে পড়িবার বন্দোবস্ত হইল। সেই জঙ্গলের মধ্যে খানিকটা দূরে যে একটী স্কুল ছিল, ৩।৪ বৎসরের বালক গার্‌ফীল্‌ডের সাধ্য ছিল না সেখানে হাটিয়া যান, কাজেই তাঁহার দিদি তাঁহার ঘোড়া হইলেন।



দিদির ঘাড়ে চড়িয়া গার্‌ফীল্‌ড্ প্রত্যহ স্কুলে যাইতে লাগিলেন। গ্রীষ্মের দিনে ঘরের কাজ কর্ম্ম, চাষবাস করিতে হইত, সুতরাং সে সময় পড়াশুনার তত বেশী সুবিধা হইত না; যে সময় শীত আসিত, ভয়ানক শীতে চাষবাস বন্ধ হইয়া যাইত, তখনই তাঁহাদের পড়িবার সময়। তেলের পয়সা জুটিত না, বাড়ীতে আগুন পোহাইবার জন্য যে কাঠ জ্বালা হইত, তাহাতেই আগুন পোহান এবং পড়া শুনা, দুয়েরই কাজ চলিয়া যাইত। যাহা হউক এইরূপ কষ্টে পড়িয়াও গার্‌ফীল্‌ডের পড়াশুনার কোনরূপ ক্ষতি হয় নাই। আট বৎসর যখন তাঁহার বয়স, তখন তাঁহাকে তাঁহার জানিত বিষয়ে কেহই ঠকাইতে পারিত না, কারণ তিনি কিছুই অর্দ্ধেক শিখিয়া ফেলিয়া রাখিতেন না। ক্ষেত্রের কাজেও তিনি এই সময়ের মধ্যে পটু হইয়াছিলেন। আর না হইবেনই বা কেন? ছোট ছেলেরা যেমন কোন কাজ করিতে বলিলে, বলিয়া বসেন 'আমি পারিব না,' গার্‌ফীল্‌ডের সে অভ্যাস ছিল না; বরং তিনি কোন কাজ করিতে পাইলেই, আনন্দের সহিত 'আচ্ছা যাই' বলিয়া ছুটিয়া যাইতেন। তাঁহার মা সর্ব্বদাই তাঁহাকে বলিতেন, "দেখ বাছা! কোন কাজ করিতে হইলে, 'পারিব' বলিয়া মনে মনে দৃঢ় বিশ্বাস ও সাহস থাকিলেই সে কাজের অর্দ্ধেক হইয়া যায়"; গার্‌ফীল্‌ডেরও মনে মনে এই বিশ্বাস চিরকাল ছিল।

ইহার কিছুকাল পরে টম্ চাকরী করিবার জন্য বিদেশে যান, কাজেই ক্ষেতের সমস্ত কাজ গার্‌ফীল্‌ডের ঘাড়ে আসিয়া পড়ে। ভাবিয়া দেখিলে এই অল্প বয়সেই গার্‌ফীল্‌ডের একরূপ সংসারের আরম্ভ হইল। সুযোগ বুঝিয়া তাঁহার মাতা তাঁহাকে দুটী অমূল্য উপদেশ দিলেন—(১) "ঈশ্বর তোমাকে যে অবস্থাতেই রাখুন, তিনি যে তোমার মঙ্গলই করিবেন, এটী বিশ্বাস করিও, এবং সকল বিষয়ে তাঁহারই সাহায্য চাহিও, কারণ তাঁহার সাহায্য ব্যতীত কিছুই হয় না।" (২) "যাহা ঠিক বুঝিবে তাহা করিতে ভয় পাইওনা। পৃথিবীর মধ্যে সেই সর্ব্বাপেক্ষা ভীত যে ভাল কাজ করিতে ভয় পায়।" শেষের উপদেশটী শুনিয়া গার্‌ফীল্‌ড্ বলিলেন, "মা, যাহারা বড় হইয়াছে, তাহাদের ভাল কাজ করিতে ভয় পাওয়া উচিত নয়, তুমি এই কথা বলিতেছ?" মাতা উত্তর করিলেন "কেবল তাহা কেন? বালকদিগের কথাও বলিতেছি। অনেক বালক ভাল কাজ করিতে সাহস পায় না। মাতা অথবা শিক্ষক একটা কাজ করিতে হয়তো বারণ করিয়াছেন, কিন্তু পাছে একবয়স্ক সঙ্গীরা ঠাট্টা করে এই ভয়ে অনেক বালক সেই কাজ করিয়া ফেলে, এরূপ করা ভয়ানক অন্যায়। যে দিকে ভাল কাজ সেই দিকেই ঈশ্বর থাকেন; তবেই বোঝ, যদি ঈশ্বর তোমার দিকে থাকিলেন, হাজার বন্ধুবান্ধব ঠাট্টা করিলে বা চটিয়া গেলেই বা ক্ষতি কি?"

এইরূপ উপদেশ পাইয়া গার্‌ফীল্‌ড্ চলিতে লাগিলেন। ভয়ানক পরিশ্রম করিয়াও তাঁহার কোন কষ্ট হইত না! বিশ্রাম যে এক দ্রব্য তাহা তিনি চাহিতেন না। কাজ করিয়া অবকাশ পাইলেই সে সময়টুকু পড়াশুনায় কাটাইয়া দিতেন, আবার পড়া শুনা করিয়া যে অবকাশ পাইতেন, সে সময় টুকু নূতন নূতন কাজ শিখিয়া কাটাইয়া দিতেন। অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি ছুতোরের কাজ শিখিয়া ফেলিলেন, এবং তাঁহার দাদা টাকা উপার্জ্জন করিয়া বাড়ী ফিরিলে, তাঁহার সাহায্যে মাতাকে একখানি সুন্দর ঘর প্রস্তুত করিয়া দিলেন। আরও দুই তিন রকম কাজ করিয়া গার্‌ফীল্‌ডের বড়ই ইচ্ছা হইল, একবার সমুদ্রে চাকরী করিতে যান। তিনি গল্পের পুস্তকে সমুদ্রের নানারূপ গল্প পড়িয়া মোহিত হইয়া গিয়াছিলেন, কাজেই ইচ্ছাটী কিছু প্রবল হইল; মাতা গতিক বুঝিয়া বলিলেন "আপাততঃ সমুদ্রে গিয়া কাজ নাই, নিকটবর্ত্তী হ্রদে যাও,

সেখানে গিয়া যদি সমুদ্রে যাইবার ইচ্ছা অধিক হয়, তখন যাইও।" এইরূপে পুত্রকে বিদায় দিয়া স্নেহময়ী মাতা ভয়ানক কষ্টে দিন শেষ করিতে লাগিলেন।

এদিকে গার্‌ফীল্‌ড্ আপনার 'পুঁজিপত্র' বাঁধিয়া হ্রদের ধারে উপস্থিত হইলেন, এবং এক জাহাজে উঠিয়া সেই জাহাজের ক্যাপ্তেনের সহিত দেখা করিলেন। তিনি পুস্তকে পড়িয়াছিলেন ক্যাপ্তেন সাহেবেরা বেশ ভদ্রলোক, কিন্তু কাজে যাহা দেখিলেন, তাহাতে প্রাণ উড়িয়া গেল। ভয়ানক মাতাল একটা লোক সকলকে বিশ্রী ভাষায় গালাগালি দিতে দিতে সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং তিনি কি জন্য আসিয়াছেন, জানিতে পারিয়া গালাগালি দিয়া তাড়াইয়া দিল। যাহা হউক ইহারই নিকটে কোন একস্থানে গার্‌ফীল্‌ড্ একটুকু আশ্রয় পাইলেন! একজন ভদ্রকাপ্তেন দয়া করিয়া তাঁহাকে চাকরী দিলেন। এইখানে কিছুকাল থাকিয়া গার্‌ফীল্‌ডের সমুদ্রে যাইবার ইচ্ছা চলিয়া গেল। শরীরের প্রতি তাচ্ছিল্য করিয়া তাহার ফল পাইতে পাইতে তিনি বাড়ী আসিলেন। যদিও কম্পজ্বরে ভুগিতে ছিলেন, তথাপি পূর্ব্বের ন্যায় প্রফুল্লভাবেই তিনি বাটী আসিলেন, এবং মা কি করিতেছেন দেখিবার জন্য চুপি চুপি জানালা দিয়া তাকাইলেন। তখন সন্ধ্যা হইয়াছে, ঘরে আলো জ্বলিতেছে, তিনি সেই আলোতে দেখিতে পাইলেন ঘরের এককোণে তাঁহার মা হাটুপাতিয়া বসিয়াছেন, সম্মুখে চেয়ারে একখানি পুস্তক খোলা। মা কি পড়িতেছেন? গার্‌ফীল্‌ড কাণ পাতিয়া এই কথা শুনিলেন—(তাহাতে তাঁহার মনে কি রূপ ভাব হইল, আমরা বলিতে চাহিনা, পাঠকপাঠিকাগণ বুঝিয়া লইবেন)—তিনি শুনিলেন;—"হে জগদীশ্বর, আমায় দেখা দাও, আমাকে দয়া কর। তোমার দাসীর মনে বল দাও, এবং তোমার দাসীর পুত্রকে রক্ষা কর।" ধন্যা মা! ধন্যা মা! আমরা আর কি বলিব? ঈশ্বর হাতে হাতে তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন, তাঁহার ভালবাসার ধন ঘরে গিয়া মাকে জড়াইয়া ধরিল,—আহ্লাদে মায়ের চক্ষের জল পড়িতে লাগিল।

এই খানেই তাঁহার বাল্য জীবন একরূপ শেষ হইল। তাহার পর তিনি কেমন করিয়া নিজের চেষ্টায় টাকা উপার্জ্জন করিয়া ভালরূপ লেখা পড়া শিখিতে আরম্ভ করিলেন, স্কুল হইতে কালেজে, কালেজ হইতে সংসারে, কেমন করিয়া তিনি নিজের সদ্‌গুণের দ্বারা সকলকে চমৎকৃত করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন, কেমন করিয়া তাঁহার দেশীয় মহাসভার মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন, কেমন করিয়া হতভাগ্য কাফ্রীদিগকে স্বাধীন করিবার জন্য যুদ্ধ করিলেন, কেমন করিয়া সকলের মনের সম্মতিতে তিনি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হইলেন, সামান্য কাঠের ঘর ছাড়িয়া রাজবাড়ীতে আসিলেন, এ সকল বিশেষ করিয়া বলিবার স্থান আমাদের নাই।

একজন পাগলের বন্দুকের গুলিতে অবশেষে গার্‌ফীল্‌ডের প্রাণ গেল। যখন তিনি বাঁচিবেন কি মরিবেন তাহার স্থিরতা ছিল না, তখন একজন ভদ্রলোক বলিয়াছিলেন 'গার্‌ফীল্‌ড্ মরিয়া গেলে আমেরিকার ঘরে ঘরে ক্রন্দন উঠিবে।" আজ তাহাই হইয়াছে—এমন লোক আমেরিকাতে নাই, যে না আজ এই মহাত্মার মৃত্যুতে দুঃখ করিতেছে। এইরূপ জীবনই ধন্য! ধন্য গার্‌ফীল্‌ড্! ধন্য আমেরিকা।



## রেলের গাড়ী।

বাল্যকালে আমার বিশ্বাস ছিল যে বাড়ীতে বা স্কুলে যেরূপ রেল থাকে, সেই রূপ রেলের উপর দিয়াই গাড়ী যায়, কিন্তু যখন সত্য সত্যই রেলের গাড়ী দেখিলাম, তখন জানিলাম সেরূপ নহে। মাটীর উপরে লোহার রেল শক্ত করিয়া বসান, তাহার উপর দিয়া গাড়ী যায়। দেখিয়া আগের ভুল চলিয়া গেল বটে, কিন্তু তখনও একটা বিশ্বাস মনে রহিল—তাহা এই যে, যেখানে রেলের গাড়ী যাইবে, সেখানকার সমস্ত জিনিশ ভয়ানক দুর্ম্মূল্য হইয়া উঠিবে; পল্লীগ্রামের সমস্ত ভাল ভাল খাবার জিনিশগুলি কলিকাতায় বা অন্যান্য বড় সহরে আসিয়া পড়িবে—আর গরিব পাড়াগেঁয়ে লোকেরা হাত তুলিয়া হাঁ করিয়া বসিয়া থাকিবে!!!

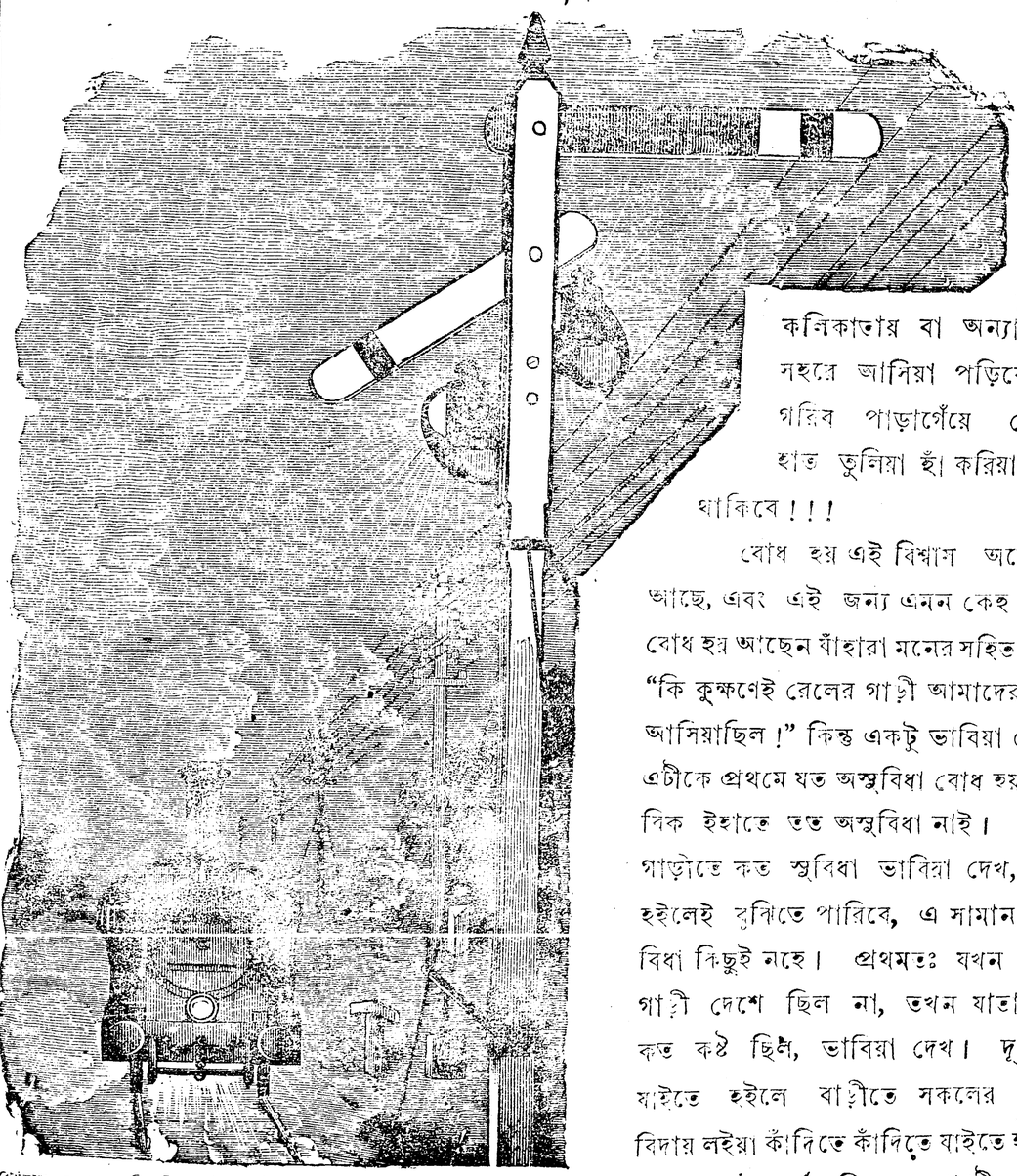

বোধ হয় এই বিশ্বাস অনেকেরই আছে, এবং এই জন্য এমন কেহ কেহ ও বোধ হয় আছেন যাঁহারা মনের সহিত ভাবেন "কি কুক্ষণেই রেলের গাড়ী আমাদের দেশে আসিয়াছিল!" কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলে এটীকে প্রথমে যত অসুবিধা বোধ হয়, বাস্তবিক ইহাতে তত অসুবিধা নাই। রেলের গাড়ীতে কত সুবিধা ভাবিয়া দেখ, তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবে, এ সামান্য অসুবিধা কিছুই নহে। প্রথমতঃ যখন রেলের গাড়ী দেশে ছিল না, তখন যাতায়াতের কত কষ্ট ছিল, ভাবিয়া দেখ। দূরদেশে যাইতে হইলে বাড়ীতে সকলের নিকট বিদায় লইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে যাইতে হইত—পাছে আর ফিরিয়া আসিতে না হয়; রাস্তা ঘাট নানারূপ ভয়ে পূর্ণ ছিল; প্রাণটী হাতে করিয়া বাহির হইতে হইত। আর যখন রেলের গাড়ী হইল, তখন এই রূপ ভাবনা চলিয়া গেল—

# ভীমের কপাল।

## ৫ম অধ্যায়।

দীনদয়াল বাবুর ভাইবোন অনেকগুলি ছিল; কিন্তু তাঁহারা এখন ভাই বোনে দুজন মাত্র বাঁচিয়া আছেন; সুতরাং বাপ মা তাঁহাদিগকে বড়ই স্নেহ করেন। দীনদয়াল এবং তরলা যাহা কিছু করিবে, অন্যায় না হইলে, কর্ত্তার তাহাতে কিছুমাত্র আপত্তি ছিল না। গৃহিনী বড় কোমলস্বভাবা ছিলেন। এইরূপ বাপ মায়ের সন্তান বলিয়াই দীনদয়াল দয়াতে পূর্ণ এবং তরলা করুণার ভাণ্ডার ছিলেন। তাঁহাদের ধন সম্পত্তি তত অধিক না থাকিলেও তাঁহারা এরূপ মিতব্যয়ী ছিলেন, যে সংসারের খরচ নির্ব্বাহ হইয়া দরিদ্রদিগের দুঃখ মোচনের জন্যও যথেষ্ট অর্থ থাকিত। দীনদয়াল বাড়িতে আসিলেই এইরূপ ঘুরিয়া ঘুরিয়া কোথায় কে কষ্ট পাইতেছে দেখিয়া বেড়াইতেন, এবং যদি দেখিতেন কাহারও সাহায্যের প্রয়োজন, অমনি তাহাকে লইয়া বাড়ীতে আসিতেন। চতুর্দ্দশবর্ষীয়া তরলা এসকল বিষয়ে দাদার সঙ্গিনী ছিলেন। তাঁহারা দু ভাইবোনে গরিব দুঃখীদের জন্য যে কত কাঁদিয়াছেন তাহার সীমা নাই। দাদা ঘুরিয়া ঘুরিয়া দুঃখী, রোগী সংগ্রহ করিতেন, বোন তাহাদের রীতিমত সেবা শুশ্রূষা করিতেন। ফলতঃ দীনদয়াল বাবু বাড়ীতে আসিলে বাড়ীর দশা কিরূপ হইত তাহা নিম্নলিখিত গল্পটী হইতে বুঝা যাইতে পারে;—এক দিন চাকরেরা কাঁদিতে কাঁদিতে গিয়া গৃহিনীর কাছে উপস্থিত হইয়া বলিল "মা, আমাদের মাইনে হিসেব করে দিন, আমরা থাকিব না।" গৃহিনী ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কেনরে কি হয়েছে?" চাকরেরা বলিল "আপনারা ভদ্রলোক, আপনাদের চাকরী ক'রে দুটো করে খাব বলে এসেছি—কিন্তু ছোট বাবুর জ্বালায় আর তরু দিদির উৎপাতে রোজ এক দল ছোটলোকের খান্‌শামাগিরি কর্‌তে হয়, তা আমরা পারি না, এতে আমাদের মানের হানি হয়।" গৃহিনী মিষ্ট কথায় বুঝাইয়া, জলখাবারের জন্য সকলকে পয়সা দিয়া তুষ্ট করিলেন।

সুজনখালীর মিত্রদের বাড়ী দয়ার মন্দির বলিলেও হয়। এই দয়ার মন্দিরে দীনদয়াল ভীমেন্দ্রকে লইয়া উপস্থিত হইলেন। চাকরেরা দেখিবামাত্র পরস্পরকে টেপাটিপি করিয়া বলিতে লাগিল "যা বলিছি, ঐ আর একটা উৎপাত যুটিয়ে এনেছেন।" দীনদয়াল বাড়ীতে উপস্থিত হইয়াই ছুটিয়া মাতার নিকট গেলেন এবং কি অবস্থায় ভীমেন্দ্রকে পাইয়াছেন, তাহা বলিয়া তরুকে তাঁহার সাহায্যের জন্য ডাকিলেন। তরু তখন স্নানের পর চুল শুকাইয়া চুল বাঁধিবার উদ্যোগ করিতেছিল, দাদার কথা শুনিয়া কেশবিন্যাস রাখিয়া ছুটিয়া গেল। তাহারা দুজনে মিলিয়া ভীমেন্দ্রকে একটা বিছানায় শোওয়াইয়া খানিকটা পুষ্টিকর ঔষধ খাওয়াইয়া দিলেন। অল্প সময়ের মধ্যেই উপযুক্তরূপ খাদ্য প্রস্তুত হইল। ভীমেন্দ্রকে দীনদয়াল পরিতোষমত আহার করাইলেন;—ভীমেন্দ্র সুস্থ হইল। প্রায় ৭ দিন ভীমেন্দ্র মিত্রদের বাড়ী রহিল।

উদ্ধত গোঁয়ার লোকের স্বভাবই এই, তাহারা কাহারও নিকট কিছু ভিক্ষা চাহিতে পারে না, এবং অনেক কাল অপরিচিত কাহারও আশ্রয়ে (বিশেষ আবশ্যক হইলেও) থাকিতে ভালবাসে না। ভীমেন্দ্র দেখিল দীনদয়ালদের বাড়ীর সকলেই তাহাকে নিজের বাড়ীর ছেলের মত দেখেন; দীনদয়াল, তরলা যখন যাহা প্রয়োজন সাধ্যমত তাহা যোগাড় করিয়া দেন, তথাপি ভীমেন্দ্র চঞ্চল হইয়া উঠিল; সেখানে আর অধিক কাল থাকিতে ইচ্ছা



হইল না। এক দিন বিকালে বেড়াইবার নাম করিয়া ভীমেন্দ্র নদীর ধারে গেল, এক জন মাঝির সহিত কলিকাতায় যাইবার বন্দোবস্ত করিয়া আসিল। ভীমেন্দ্র কি মূর্খ! মাঝির নাম জিজ্ঞাসা করিল না। মিত্রদের বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া কাহাকেও কিছু বলিল না; অবশেষে যখন রাত্রি এক প্রহর, তখন ভীমেন্দ্র ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইল।

ভীমেন্দ্র! কি করিলে? যাঁহাদের সেবা শুশ্রূষায় বাঁচিয়া গেলে, যাইবার সময় তাঁহাদিগকে দুটো মিষ্ট কথা বলিতেও ইচ্ছা হইল না? এই কি তোমার কৃতজ্ঞতা? আর যাইবার সময় সিদ্ধিদাতা পরমেশ্বরের নামও লইলে না? ধন্য তোমার বুদ্ধির গতি!

অন্ধকার রাত্রিতে ভীমেন্দ্র কোন মতে পথ চিনিয়া গেল, এবং শীঘ্রই নৌকায় উঠিল। মাঝিরা জাগিয়াছিল, ভীমেন্দ্র উঠিবা মাত্র নৌকা ছাড়িয়া দিল। সমস্ত রাত্রি নৌকা চলিল। একটা বড় আশ্চর্য্যের বিষয় এই সমস্ত রাত্রির মধ্যে কখনও বিপরীত স্রোত হয় নাই। পরদিন প্রাতে যখন দীনদয়ালদিগের বাড়ীতে ভীমেন্দ্র কোথায় গেল খোঁজ আরম্ভ হইল, এবং স্নেহময়ী তরু ছল ছল চক্ষে বসিয়া পড়িল, তখন ভীমেন্দ্র একটা প্রকাণ্ড নদীর উপরে নৌকার মধ্যে। দীনদয়ালদিগের বাড়ীতে শীতে কষ্ট পাইতে হইত না, কিন্তু নৌকায় ভীমেন্দ্র ভয়ানক কষ্ট পাইল। প্রাতে সূর্য্য ভালরূপ উদয় হইলে ভীমেন্দ্র নৌকার ভিতর হইতে বাহির হইল; কিন্তু আশ্চর্য্য হইয়া দেখিল গত কল্য যে নৌকা ভাড়া করিয়াছিল এবং যে মাঝির সহিত কথা বলিয়াছিল এ সে নৌকা নহে, এবং এ নৌকায় সে মাঝি নাই। মাঝিরাও আশ্চর্য্য হইয়া টেপাটিপি করিয়া বলিতে লাগিল "এ কোন্ বাবুরে!"—কিন্তু চেঁচাচেঁচি করিল না। ভীমেন্দ্রের কিছু আশঙ্কা হইল, কিন্তু কিছুই বলিল না। নৌকা চলিতে লাগিল। রাত্রি শেষে একটা ছোট নগরের নিকটে নৌকা থামিল। মাঝিরা অপরাহ্নে রন্ধন ও আহারাদি করিয়া লইয়াছিল—কিন্তু ভীমেন্দ্রের যে কি হইবে তাহা তারাও জিজ্ঞাসা করে নাই, ভীমেন্দ্রও তাহা ভাবে নাই। নৌক থামিলে মাঝিরা বলিল "বাবু নামুন।" ভীমেন্দ্র দ্বিরুক্তি না করিয়া নামিল। মাঝিরাও টাকা চাহিল না, ভীমেন্দ্রও দিল না; সেই নগর মধ্যে ভীমেন্দ্র প্রবিষ্ট হইল। ক্রমশঃ—

---

## কেন্দ্রীয় ঊষা।

গদীশ্বর এই পৃথিবীর কত স্থানে যে কতরূপ সুন্দর দ্রব্যের সৃষ্টি করিয়া মানুষের সুখ স্বচ্ছন্দতা বাড়াইতেছেন তাহার সীমা নাই; কেন্দ্রীয় ঊষা নামক দ্রব্যটী এই সকল আশ্চর্য্য সৃষ্টির মধ্যে একটী।

পৃথিবীর ঠিক মাঝখানে যদি চারিদিকে ঘুরাইয়া একটী রেখা টানা যায়, তাহা হইলে সেই রেখাকে বিষুব রেখা বলে। এই বিষুব রেখার দুপাশে খানিক দূরে যে সকল দেশ, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা গরম। এই সকল দেশ হইতে যতই উত্তরে এবং দক্ষিণে যাওয়া যায় ততই শীত বেশী পৃথিবীর কেন্দ্র অর্থাৎ ঠিক উত্তর ও দক্ষিণ সীমা ভয়ানক শীতে চির কাল বরফ-ঢাকা হইয়া থাকে। শীতপ্রধান দেশের একটী নিয়ম এই যে তথায় দিন ছোট, রাত বড় হইয়া যায়; যে দেশে শীত যে পরিমাণে বেশী, সেই দেশে দিন যত ছোট এবং রাত তত বড়। এই হিসাবে ধরিয়া গেলে পৃথিবীর কেন্দ্রের নিকটে যে সকল দেশ, সেখানে কি হইতে পারে ভাবিয়া দেখ। আমরা শুনিয়াছি সেই দেশে ছমাস দিন এবং ছমাস রাত্রি হয়। কেহ কেহ হয়ত জিজ্ঞাসা করিবেন, তবে কি সেখানকার

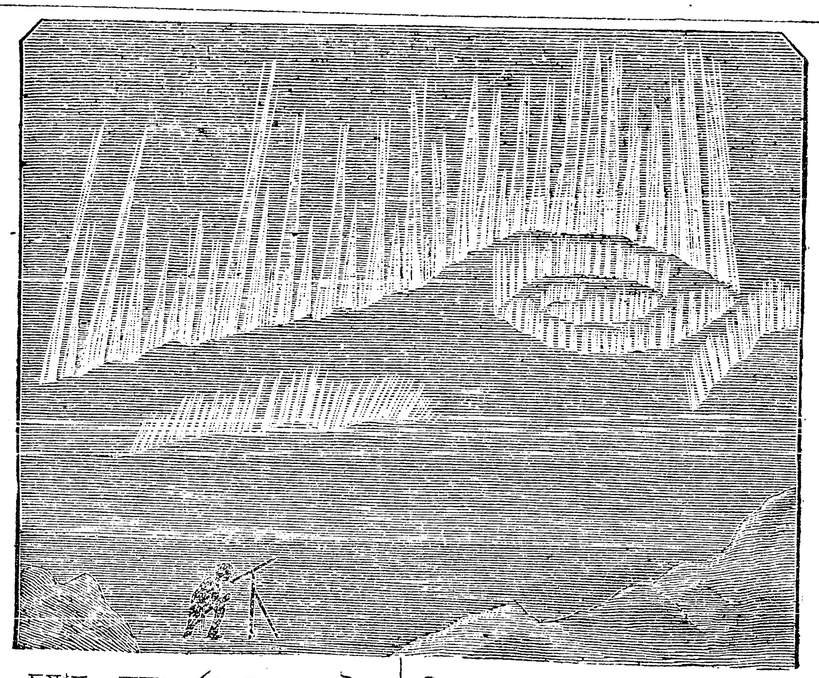

লোক রাত্রির ছমাস কুম্ভকর্ণের মত ঘুমাইয়া কাটায়? না, তাহা কেন? তাহারা আমাদেরই মত ৬।৭ ঘণ্টা ঘুমায়, এবং অন্য সময় আমাদেরই মত সংসারের কাজ কর্ম্ম করে। কিন্তু অন্ধকারের সময় কাজ কর্ম্মের কত অসুবিধা ভাবিয়া দেখ। এই জন্য দয়াময় জগদীশ্বর কেন্দ্রীয় ঊষা নামক এক রূপ আলোকের সৃষ্টি করিয়াছেন। আমরা অদ্য তাহারই একটী চিত্র প্রদান করিলাম। সকল স্থলের কেন্দ্রীয় ঊষা দেখিতে একরূপ হয় না, কিন্তু কার্য্য সকল গুলিরই একরূপ। অন্ধকারের সময় আকাশে উঠিয়া উত্তম আলোকে সমস্ত দেশ উজ্জ্বল করিয়া কেন্দ্রীয় ঊষা সেই দেশের লোকদিগের লম্বা রাত্রির কষ্ট দূর করিয়া দেয় যদিও সূর্য্যের আলোকের মত ঊষার আলোক তত পরিষ্কার নহে, তথাপি এই আলোকে লোকের অনেক অসুবিধা দূর হয়। ভোর বেলা আমাদের যেরূপ অস্পষ্ট আলো হয়, কেন্দ্রের এই আলোকমালারও সেই রূপ আলো, এই জন্যই বোধ হয় ইহার নাম কেন্দ্রীয় ঊষা। এই আলোকটী কোথা হইতে কেমন করিয়া আসে তাহা ভালরূপ জানা যায় নাই, এবং যাহা জানা গিয়াছে তাহা লিখিলেও অল্পবয়স্ক পাঠক পাঠিকাদিগের বুঝিতে একটু শক্ত হইবে সুতরাং সে বিষয়ে বলিবার প্রয়োজন নাই।

জগদীশ্বর এইরূপ অনেক স্থানে অনেকরূপ সুন্দর সুন্দর দ্রব্য সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা দেখিলে অথবা তাহার বিষয় শুনিলে অবাক্ হইতে হয়, এবং পরমেশ্বরকে ভক্তি না করিয়া থাকিতে পারা যায় না।

---

## একটী আশার কথা।

আমরা অত্যন্ত আহ্লাদের সহিত আমাদিগের পাঠকগণকে জানাইতেছি, যে আমাদিগের মফস্বলের কোন পাঠক গতবারের ধূমপান বিষয়ক প্রস্তাবটী পাঠ করিয়া, তামাক খাওয়া একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছেন। তিনি এসম্বন্ধে আমাদিগকে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইল; নাম প্রকাশ লজ্জার কারণ হইতে পারে বলিয়া, প্রকাশ করা গেল না।

"মহাশয়!

আমি পূর্ব্ব হইতে তামাক খাইতাম; কিন্তু 'সখার' একটী প্রবন্ধ পাঠ করিয়া অদ্য হইতে তামাক খাওয়া চিরদিনের মত পরিত্যাগ করিলাম। ইতি, তারিখ ১০ই চৈত্র, ১২৮৯ সাল।"

শ্রী——————

'সখা'র পাঠক মাত্রেরই শুনিয়া আহ্লাদ হইবে যে বালকদিগের মধ্যে যাহাতে ধূমপান প্রচলিত না হয়, তাহার জন্য এখানকার কোন কোন বন্ধু একটী সভা স্থাপনের চেষ্টা করিতেছেন। যদি সভাটী বাস্তবিক স্থাপিত হয়, তাহা হইলে বিশেষ উপকারের সম্ভাবনা, এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

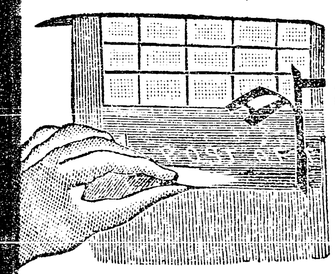

## ত্রপ্রেরকদের প্রতি।

আমরা এবার এত স্থান হইতে এতগুলি পত্র পাইয়াছি যে সমস্ত গুলির প্রাপ্তি স্বীকার পর্য্যন্ত আমরা করিতে পারিতেছি না। যাঁহার উত্তর যাঁহারা ঠিক দিতে পারিয়াছেন, কেবল তাঁহাদেরই নাম যথাস্থানে প্রকাশিত হইল।

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সরকার, হেয়ার স্কুল।—প্রথমবারে বালকবালিকাদিগের আলোচনার জন্য খানিকটা স্থান রাখিবার কথা ছিল, কিন্তু অদ্যাবধি কেহই কোন বিষয়ে আলোচনা আরম্ভ করেন নাই কাজেকাজেই সে বিষয়ে কোন কাজ হয় নাই। কি বিষয়ে আলোচনা চলিবে, তাহা ঠিক করিয়া দেওয়া সম্পাদকের কার্য্য নহে।

বালিকা সমিতির সভ্যগণ, বেথুন স্কুল।

যাঁহার উত্তরগুলি সমস্তই ঠিক হইয়াছে, কিন্তু এক সঙ্গে না মিলিয়া প্রত্যেকে স্বতন্ত্রভাবে উত্তর বাহির করিলেই ভাল হইত।

শ্রীকালিদাস রায় চৌধুরী, মাধবকাটী।

হেয়ালীটী অত্যন্ত দীর্ঘ,—বিশেষতঃ তাহার কি উত্তর হইবে, লিখেন নাই।

শ্রীতুলসীচরণ দে, শ্রীঅমৃতধন মুখোপাধ্যায়, কাদিহাটী।—যে হেয়ালী গুলি পাঠাইয়াছেন, তাহার উত্তরও সেই সঙ্গে পাঠান উচিত ছিল।

শ্রীচুলিনাল ঘোষ, কৈখালি।—হেয়ালী গুলির উত্তর পাঠান নাই।

শ্রীসিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়, কাদিহাটী।—হেয়ালী গুলি প্রকাশ করা যাইবে কিনা, আমরা সে বিষয়ে বিবেচনা করিব।

শ্রীতারাপ্রসন্ন বসু, ধূলজুরি।—আপনার উৎসাহপূর্ণ পত্রের জন্য ধন্যবাদ। সখার লেখকদিগের মধ্যে অনেকেই সুপরিচিত নহেন, কাজেই নাম প্রকাশ করা হয় নাই; যাহা হউক, যদি জানিতে ইচ্ছা করেন, সখার আগামী কোন সংখ্যায় তাঁহাদের নাম প্রকাশ করা যাইতে পারে।

শ্রীশ্যামাচরণ রায়, কাড়াপাড়া।—আপনার উৎসাহপূর্ণ পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। রচনাটী আপাততঃ বিবেচনাধীন রহিল।

শ্রীমন্মথনাথ পাল, বরাহনগর।—ভাল হয় নাই।

শ্রীধ, গ, ও শ্রীক্ষ, চ, কলিকাতা।—বেশ হইয়াছে, কিন্তু কিছু শক্ত বলিয়া প্রকাশিত হইল না।

শ্রীবনবিহারী বন্দোপাধ্যায়, ফরিদপুর।—মন্দ হয় নাই, আপাততঃ বিবেচনাধীন রহিল। কেবল পদ্য না লিখিয়া যাহাতে বুদ্ধিব্যয় করিতে হয়, এরূপ বিষয়েও লিখিবেন। সাধারণতঃ বিজ্ঞান, জীবন চরিত, ইতিহাস বা এইরূপ অন্য কোন বিষয়ে লিখিলেই ভাল হয়।

শ্রীদ্বারকানাথ পাল, পিরোজপুর। 'সখা'র মূল্য ডাকমাশুল সমেত ১৷৷০ মাত্র। এইরূপ অল্প মূল্যে সকলেই গ্রহণ করিতে পারেন; বিশেষতঃ পত্রিকার যে ব্যয় তাহাতে ইহা অপেক্ষা কম মূল্যে দিতে গেলে কাজ চলেনা, এই জন্য আমরা নিয়ম করিয়াছি—সিকিমূল্য, অর্দ্ধমূল্য বা তিন চতুর্থাংশ মূল্যে কাহাকেও পত্রিকা দিব না।

শ্রীপ্রিয়লাল গঙ্গোপাধ্যায়, প্রভৃতি—বরিশাল গবর্ণমেণ্ট স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণী। আপনাদের পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। গতবারের প্রশ্নগুলির উত্তর সব ঠিক হয় নাই।

শ্রীকরুণানিধান সিংহ, ভাণ্ডাড়া। মন্দ হয় নাই, কিন্তু স্থানে স্থানে ছন্দ পতন হইয়াছে; যাহা হউক আপাততঃ বিবেচনাধীন রহিল।

শ্রীনিঃ, সিলং; "উকিলের পরামর্শ," কলিকাতা; স্থানাভাব।

---

## ধাঁধা।

### পূর্ব্ববারের প্রশ্নগুলির উত্তর।

১। ি-জি-ি-লি-ি-পি ; ছ-া-ন-া-ভ-া-জ-া। ২। 'ক' এই অক্ষরটী। ৩। পারাবতগণ। ৪। দীর্ঘসূত্রতা ; ঈশ্বরপরায়ণতা। ৫। 'সন্‌তান' এই কথাটী হইতে 'তান্‌' ছাড়িয়া দিলে সন্‌ থাকে, তাহার নিকটে 'দেশ' এইটী বসাইলে 'সন্দেশ' হয়। ৬। কলম।

**নিম্নলিখিত স্থান হইতে উপরের প্রশ্নগুলির ঠিক উত্তর পাওয়া গিয়াছে;—বালিকা সমিতি, বেথুন স্কুল; শ্রীঅক্ষয়কুমার ভট্টাচার্য্য, পারসীর বাগান, কলিকাতা শ্রীছমিরুদ্দীন আহম্মদ, কলিকাতা মাদ্রাশা ; শ্রীশারদানাথ খাঁ, বগুড়া ; শ্রীঅতুলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, গোপালপুর ; শ্রীসতীনাথ বসু, বাগেরহাট ; শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র মিত্র, কলিকাতা ; শ্রীমুক্তিদারঞ্জন রায়, কিশোরগঞ্জ।**

### নূতন।

১। আমার প্রসাদে কেহ ধনরত্ন পায়,
কৃপায় আমার কারো তৃষ্ণা দূরে যায় ;
তিনটী অক্ষর মম সুন্দর শরীরে,
প্রথম ছাড়িলে সবে ঘৃণা করে মোরে।
দ্বিতীয় ছাড়িলে পরে বালক উল্লাসে,
ছাড়িলে তৃতীয় বর্ণে ন্যূনতা প্রকাশে।
কালেতে সুলভ আমি অকালেতে নই,
বলতো সুবোধ শিশু আমি কেবা হই।

২ একি দেখি সর্ব্বনাশ! ডাকাতে ঘিরিল বাড়ী
ঘেরা হ'তে ঘর পালালো, গৃহীর গলায় দড়ি!
বলতো কেমন করে?

৩। আমি যদি না থাকি, ত' হ'লে রক্ষা থাকে না ; কিন্তু তবুও মানুষ আমাকে দুচোখে দেখ্‌তে পারে না। আমার প্রথম ও তৃতীয় অক্ষর এক সঙ্গে লইলে থাকবার যায়গা হয়, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অক্ষর এক সঙ্গে লইলে খেলাবার জিনিশ হয়। বলতো আমি কে?

৪। রাখালের বাপ আমার সমস্তটা ; তিনি এক দিন আফীশ্‌ হইতে আসিয়া আমার প্রথম ও দ্বিতীয় দিয়া দেখিলেন, রাখাল তাঁহার হুকুম না মানিয়া তাহার ভগ্নীর প্রথম ও তৃতীয় লইয়া খেলা করিতেছে ; তিনি রাগিয়া রাখালকে আমার দ্বিতীয় ও তৃতীয় মারিলেন।

৫। গ্রীষ্মকালে পথ হাটিয়া যে মানুষ বাড়ীতে আসে তাহাকে পাখী বলা যায় কি না? পাখীতে তাহাতে তফাত কি?

## সখা সংক্রান্ত নিয়মাবলী।

১। 'সখা'র অগ্রিম বার্ষিক মূল্য এক টাকা। মফঃস্বলে ডাকমাশুল সমেত এক টাকা চারি আনা। প্রতি খণ্ডের নগদ মূল্য /১০ মাত্র। ডাকের নোট, মণি অর্ডার, বা অর্দ্ধ আনার টিকিটে মূল্য পাঠাইতে হইবে।

২। পত্রিকাস্থ চিত্রের সংখ্যা কিছুই নির্দ্দিষ্ট থাকিবে না, তবে প্রত্যেক সংখ্যায় যাহাতে অন্ততঃ একখানি চিত্র থাকে আমরা সেদিকে দৃষ্টি রাখিব।

৩। বালক বালিকাদিগের রচনা উৎকৃষ্ট হইলে তাহা সাদরে গৃহীত হইবে ; তবে সুদীর্ঘ হইলে তাহা প্রকাশিত হইবে না।

৪। শিক্ষক এবং অভিভাবকদিগের পরামর্শ প্রভৃতি সাদরে গৃহীত হইবে।

৫। বালকবালিকাদিগের উপকারে আসিতে পারে, কেহ এরূপ কোন রচনা বা কোন সম্বাদ কিম্বা সত্য ঘটনার বিশেষ বিবরণ আমাদিগের নিকট পাঠাইলে আমরা তাহা সাদরে প্রকাশ করিব।

৬। সখা-সংক্রান্ত সমস্ত পত্রাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইতে হইবে ; কেবল রচনা পরামর্শ প্রভৃতি, সম্পাদকের নামে কার্য্যালয়ের ঠিকানায় পাঠান আবশ্যক।

৭। ঠিকানার পরিবর্ত্তন, নামের গোল বা কার্য্যসম্বন্ধীয় অন্য কোন অসুবিধা হইলে মোড়কের উপরে যে নম্বর দেওয়া থাকিবে, তাহার উল্লেখ করিয়া পত্র লিখিতে হইবে।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে মুদ্রিত এবং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট, "সখা" কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

প্রথম ভাগ। মে ১৮৮৩, বৈশাখ ১২৯০। ৫ম সংখ্যা।

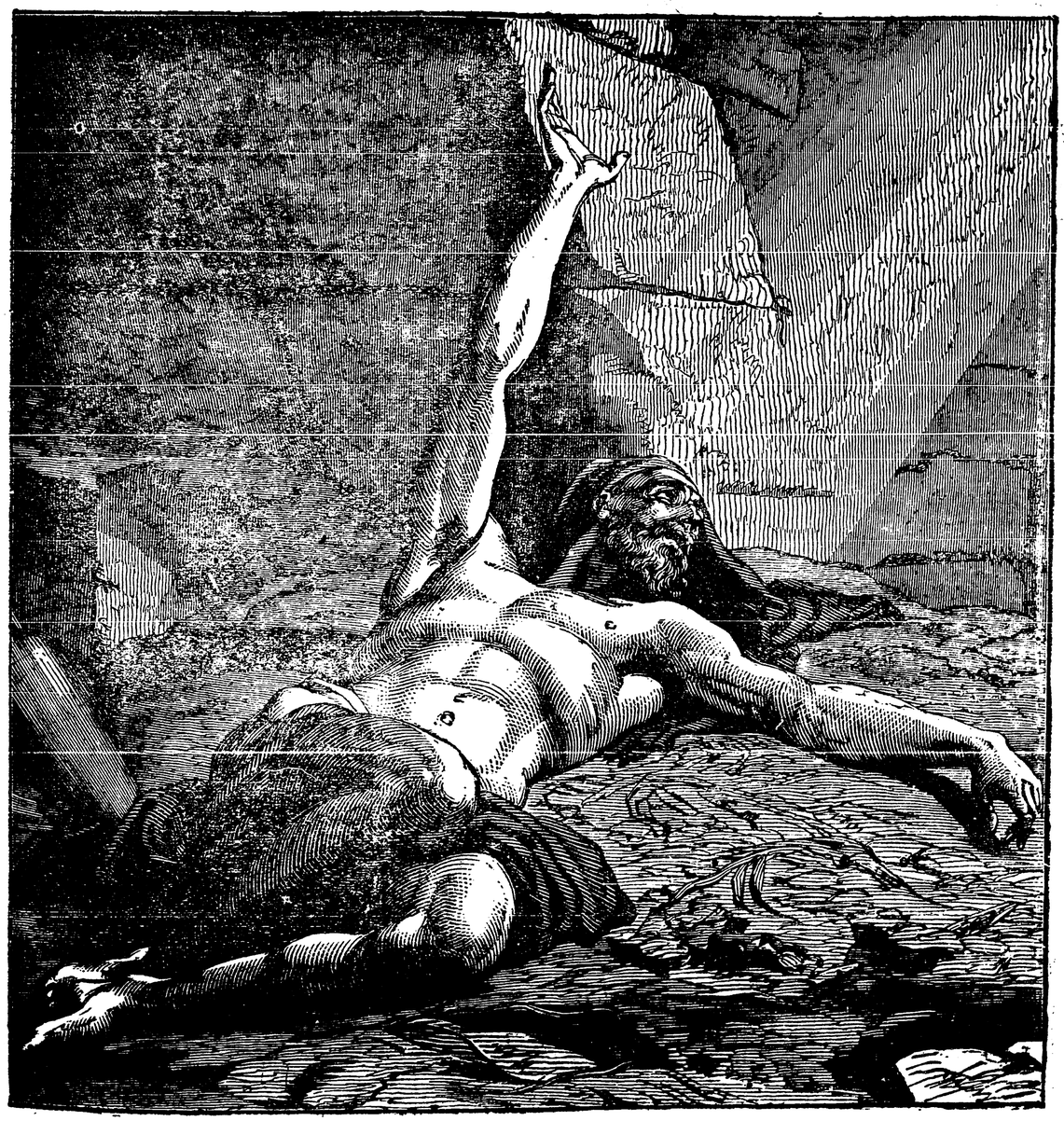

# ভীমের কপাল।

## ৬ষ্ঠ অধ্যায়।

পাঠিকাগণ বোধ হয় কিছু আশ্চর্য্য বোধ করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন "তাইতো, কেমন হ'লো? টাকা না নিয়েই চলে গেল! ব্যাপারটা কি?"। সুতরাং অধিক বিলম্ব না করিয়া এই খানেই বলিয়া রাখি ব্যাপারটা কি? যে নৌকা ভীমেন্দ্র ইতিপূর্ব্বে স্থির করিয়াছিল, তাহার মাঝিরা প্রথমতঃ স্বীকৃত ছিল বটে, কিন্তু ভীমেন্দ্র চলিয়া গেলে, তাহারা পরামর্শ করিল যে ওরূপ ছেলেমানুষকে লইয়া যাওয়া উচিত নয়, এই স্থির করিয়া তাহারা নৌকা খুলিয়া পরপারে গিয়া বাঁধিয়া থাকিল। এদিকে আর একখানি নৌকা সেই ঘাটে আসিয়া বাঁধিয়াছিল, এ নৌকা বগুড়ার পুলীশের দারগা বাবুর। গঙ্গাধর বাবু কোন সরকারী কাজে সুজনখালীর নিকটে আসিয়াছিলেন; রাত্রিতেই তাঁহার ফিরিয়া যাইবার কথা;—তিনি পুলীশের লোক, চোর ডাকাত ধরিবার জন্য সর্ব্বদা সাবধানে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। মাঝিরা তাঁহার অনুমতি পাইয়াছিল, "আমি নৌকায় উঠিলেই নৌকা খুলিয়া দিবে, কোনও কথাবার্ত্তার প্রয়োজন নাই—তাহা না হইলে কাজ উদ্ধার করা কষ্টকর হইয়া উঠিবে;" আবার যখন ভীমেন্দ্র নৌকায় উঠিয়াছিল, বাবুটীরও সেই সময় আসিবার কথা ছিল; সুতরাং ভীমেন্দ্র নৌকায় উঠিবা মাত্রই মাঝিরা নৌকা খুলিয়া দিল। পূর্ব্বে বলিয়াছি ভীমেন্দ্র শীতে কষ্ট পাইয়াছিল, কিন্তু সে ভীমেন্দ্রের দোষ;—নৌকায় বেশ বিছানা ছিল, কিন্তু ভীমেন্দ্রের তাহা ব্যবহার করিতে সাহস হইল না। অর্দ্ধেক পথে গিয়া যখন মাঝিরা দেখিল ভীমেন্দ্র তাহাদের বাবু নহে, তখন তাহারা ভাবিল "এখন যদি ফিরিয়া যাই, তাহা হইলে দারগা বাবু বিরক্ত হইবেন, যদি বগুড়া পর্য্যন্ত যাই, তাহা হইলেও বিরক্ত হইবেন,—তবে একবার বগুড়ায় ঘরে যাওয়াই ভাল।" এই ভাবিয়া তাহারা ভীমেন্দ্রকে লইয়া আসিয়াছিল। ভীমেন্দ্রকে নামাইয়া দিয়া মাঝিরা কিছুকাল বিশ্রাম করিল এবং আবশ্যক দ্রব্যাদি ঘর হইতে লইয়া পরে দারগা বাবুকে কি বলিবে ভাবিতে ভাবিতে নৌকা ছাড়িয়া দিল।

ভীমেন্দ্র নগর মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। করতোয়া নদীর তীরে বগুড়া নগর অবস্থিত। স্থানে স্থানে নদীর ধারের শোভা অতি মনোহর—বিশেষতঃ যাহারা নূতন আসিয়াছে তাহাদের পক্ষে। ভীমেন্দ্র এ শোভা দেখিবার জন্য দাঁড়াইল না। সেই আত্মীয় স্বজন শূন্য স্থানে ভীমেন্দ্র ক্ষুধার জ্বালায় মলিন মুখে একাকী বেড়াইতে লাগিল। প্রাতঃকালে অনেক বাবু বেড়াইতে বাহির হইয়াছেন, তাঁহারা কেহই ভীমেন্দ্রকে কিছুই জিজ্ঞাসা করিলেন না, ভীমেন্দ্রও কাহাকে কোন কথা বলিল না। এক জন ১৫ বৎসরের বালক কতক্ষণ এইরূপে বেড়াইতে পারে? পরিশ্রান্ত হইয়া ভীমেন্দ্র একটা ঝাউগাছের তলে বসিয়া পড়িল। বাতাসের সহিত মাথা নাড়িয়া ঝাউগাছগুলি হুঁ হুঁ করিয়া যেন ভীমেন্দ্রের দুঃখে দুঃখ প্রকাশ করিতেছিল। ভীমেন্দ্র সেই শব্দ শুনিতে শুনিতে ঘুমাইয়া পড়িল। এই সময়ে মুন্সেফ আদালতের উকিল হরিপদ বাবু এই রাস্তায় যাইতেছিলেন, তিনি দেখিলেন একটী শীর্ণকায় বালক পথের পার্শ্বে পড়িয়া রহিয়াছে। সেই নগরের মধ্যে হরিপদ বাবু ব্রহ্মজ্ঞানী বলিয়া সকলের নিকট পরিচিত। যাঁহারা হরিপদ বাবুকে চিনিতেন না, তাঁহার অনেক সময় তাঁহাকে গালাগালি দিতেন, কিন্তু তাঁহাকে যাঁহারা চিনিতেন, তাঁহারা সকলেই



শ্রদ্ধা করিতেন। হরিপদ বাবু অধিক লেখাপড়া জানিতেন না বটে, কিন্তু সকলেই তাঁহাকে বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান বলিয়া জানিত। উকিল হইলেই প্রবঞ্চক হইতে হয় যাঁহাদের বিশ্বাস, তাঁহারা শুনিলে কি মনে করিবেন জানি না, হরিপদ বাবু অসত্যের, প্রবঞ্চনার ছায়াতেও থাকিতেন না, যে মোকদ্দমা মিথ্যা বলিয়া হরিপদ বাবুর বিশ্বাস হইত, যথেষ্ট অর্থের আশা থাকিলেও তাহাতে তিনি হাত দিতেন না। হরিপদ বাবুর আর একটী অসাধারণ গুণ এই ছিল যে তিনি সকল ধর্ম্মকেই শ্রদ্ধা করিতেন, কখনও কোনও ধর্ম্মকে পরিহাস করিতেন না, এই জন্যই হরিপদ বাবু ব্রাহ্ম হইয়াও সকলের প্রগাঢ় শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। হরিপদ বাবু নিকটে আসিয়া ডাকিলেন "ওহে, তুমি কে এখানে ঘুমুচ্ছো?" ভীমেন্দ্র জাগিয়া উঠিয়া বসিল। হরিপদ বাবু পুনশ্চ ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিলে ভীমেন্দ্র বলিল "আমি কে, কোথায় আছি, তা কিছুই জানি না।" এইরূপ উত্তরে হরিপদ বাবু কিছু অপ্রস্তুত হইলেন, বলিলেন "তুমি কে তাও জান না, কোথায় এসেছ তাও জান না? ভাল, এখানে এলে কি করে?"

ভীমেন্দ্র বলিল, "তাও জানি না।"—ভীমেন্দ্র এইরূপে কথার উত্তর দিতেছে কেন বোধ হয় পাঠক পাঠিকারা বুঝিতে পারিয়াছেন। দুটী কারণে ভীমেন্দ্র এইরূপ করিতেছে, প্রথম কারণ কিরূপে নিজের পরিচয় দিলে বাবুটী চিনিতে পারিবেন তাহা, ভীমেন্দ্র ভাবিয়া পাইতেছিল না, কোন্ স্থানে এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছিল, ভীমেন্দ্র বাস্তবিকই তাহা জানিত না; তাহার পর এই স্থানে আসিবার ব্যাপার এত আশ্চর্য্য যে যদিও পাঠক পাঠিকা কি ঘটনা হইয়াছে তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন, ভীমেন্দ্র এখনও তাহা বুঝিতে পারে নাই; দ্বিতীয় কারণ ভীমেন্দ্র ক্ষুধার জ্বালায় মৃতপ্রায় হইয়াছে, এখন সবিশেষ বলিতে কোনরূপ ইচ্ছা নাই। হরিপদ বাবু বালকের চেহারা দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন বালকটী কোন বিপদে পড়িয়াছে; তখন তিনি স্নেহের সহিত তাহার হাত ধরিলেন এবং বলিলেন "আমার বাড়ীতে এস; কিছুকাল বিশ্রাম করিলে, তাহার পর সকল কথা শুনিব।" ভীমেন্দ্র কলের পুতুলের ন্যায় উঠিল এবং ভাবিতে ভাবিতে, হরিপদ বাবুর সঙ্গে সঙ্গে গেল।

বাড়ীর কর্ত্তা ধার্ম্মিক হইলে বাড়ীর কেহই যে অসৎ থাকিতে পারে না, হরিপদ বাবুর বাড়ী তাহার এক প্রমাণ। ভীমেন্দ্র যখন হরিপদ বাবুর বাড়ীতে গেল, তখন হরিপদ বাবুর ছেলে মেয়েগুলি ছুটিয়া আসিল এবং 'ইনি কে, বাবা?' 'আমাদের বাড়ীতে থাকবেন কি?' ইত্যাদি কথা বলিয়া ৫ মিনিটের মধ্যেই ভীমেন্দ্রকে আপনার লোক করিয়া তুলিল। একটী ছেলে বলিল "বাবা, এঁকে কি ব'লে ডাকবো?" হরিপদ বাবু মহামুস্কিলে পড়িলেন, হাসিয়া বলিলেন "আচ্ছা, ডাকবার বন্দোবস্ত পরে হবে, আগে ওঁর জলখাবারের বন্দোবস্ত কর দেখি, উনি বোধ হয় অনেক ক্ষণ কিছু খান নাই।" ছেলেরা যেন বিদ্যুতের মত হরিপদ বাবুর বাড়ী আলো করে ছুটিয়া গেল। মায়ের নিকট হইতে পয়সা লইয়া একটী বড় ছেলে দোকান হইতে খাবার লইয়া আসিল; একটী মেয়ে আসন ও জলের গেলাশ আনিল—যাহারা কিছুই লইয়া যাইতে পারিল না, তাহারা বড় দুঃখিত হইল, এবং এই দুঃখের কিছু উপশম করিবার জন্য আগে গিয়া খবর দিল "বাবা, খাবার আস্‌ছে!" গোঁয়ার ভীমেন্দ্র অসুখের অবস্থায় দীনদয়াল ও তরুর নিকট যে স্নেহ পাইয়াছিল, দেখিল এখানে তদপেক্ষা কম নহে, বরং অধিক।—হরিপদ বাবুর আয় তত অধিক নহে—অথচ পরিবারে লোক সাত আটটী, সুতরাং হরিপদ বাবুর একটী বই দাসী নাই। হরিপদ বাবু টাকা হাতে হইলে একেবারে অনেক দিনের

জন্য জিনিশ কিনিয়া রাখিয়া দেন, তাহাতে পয়সার সুবিধা হয়।—হরিপদ বাবুর স্ত্রী নিজে রন্ধন করেন, ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখান, এবং ঘরদ্বার সজ্জিত করেন।—এই সকল কার্য্য সমস্ত দিন করিয়াও বসন্তবালা দেবীর মুখ কখনও মলিন দেখা যায় নাই।—ফলতঃ আলস্য বলিয়া একটী কথ হরিপদ বাবুর বাড়ীতে শুনা যাইত না।—এইরূপ স্নেহের মধ্যে আসিয়া পড়িয়া ভীমেন্দ্রের গোঁয়ার প্রকৃতি যে কোথায় গেল, তাহার স্থিরতা রহিল না।—সকল ছেলেমেয়েরাই ভীমেন্দ্রকে 'দাদাবাবু' বলিয়া ডাকে, এখন ভীমেন্দ্র কাহার উপর রাগ প্রকাশ করিবে? ভীমেন্দ্র বালকবালিকাদিগকে নিজের ভাই বোনের মত ভাল বাসিতে শিখিয়াছে; ভালবাসায় তাহার মন গলিয়া জল হইয়া গিয়াছে—সে মনে আর রাগের বা তেজের স্থান কোথায় হয়? পাঠক পাঠিকা, জান কি কে প্রায়ই গোঁয়ার বা একগুঁয়ে হয়? যে কাহারও জন্য ভাবে না, যে মনে করে তাহার জন্য কেহ ভাবে না, সেই কঠিন হৃদয় হইয়া উঠে। কিন্তু যখন ভাল বাসিবার লোক ভগবান যুঠাইয়া দেন, যখন আমার আপনার জনের জন্য ভাবিতে এবং তাহাদিগকে ভাল বাসিতে ভগবান শিক্ষা দেন, তখন আর গোঁয়ারের ভাব থাকেনা। ভীমেন্দ্র একথা বুঝিল।—ভীমেন্দ্র আর একটা বিষয় দেখিয়া আশ্চর্য্য বোধ করিল—সেই বাড়ীর ছেলেমেয়েগুলি বাপ মায়ের সহিত মিলিয়া প্রত্যহ ব্রহ্মসঙ্গীত গান করে, এবং ঈশ্বরের নাম করে। ভীমেন্দ্রের এতদিন বিশ্বাস ছিল, গান করাটা একটু খারাপ কাজ, সুতরাং বাপ-মায়ের সাক্ষাতে গান করা কখনই হইতে পারে না; তাহার আরও বিশ্বাস ছিল যে ঈশ্বরের নাম করা, ধর্ম্মকর্ম্ম করা, এ সকল বৃদ্ধদের কাজ, ছেলেদের নহে; সুতরাং এখানে তাহার বিপরীত দেখিয়া কিছু অবাক্ হইল। ভীমেন্দ্র কখনও ঈশ্বরের নাম করিতে শিক্ষা করে নাই, সুতরাং হরিপদ বাবুর বাড়ীতে যখন উপাসনা হইত, তখন ভীমেন্দ্র এক পাশে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত, এবং ভাবিত "এ বাড়ীর ছেলে মেয়েগুলি পর্য্যন্ত যে ভাল একি এই ঈশ্বরের নাম করার গুণে? তাহা যদি হয় তবেতো ঈশ্বরোপাসনা ভাল।" ভীমেন্দ্র এইরূপ ভাবিত কিন্তু উপাসনা কি রূপে করিতে হয়, জানিত না বলিয়া কখনও উপাসনা করিত না!

এইরূপে পাঁচ ছয় দিন হরিপদ বাবুর বাড়ীতে কাটিয়া গেল। দীনদয়াল বাবুদের বাড়ী হইতে ভীমেন্দ্র দীনদয়ালকে দুঃখিত করিয়া, তরুকে কাঁদাইয়া, সকলকে ব্যস্ত করিয়া পলাইয়া আসিয়াছিল, ভীমেন্দ্র এখান হইতে পলাইবার কোনও চেষ্টা করিল না; কিন্তু কিছুকাল পরে কলিকাতায় যাইবার জন্য অত্যন্ত মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল।—এক দিন বসন্তবালাদেবী রন্ধন গৃহে আপনার কার্য্য করিতেছিলেন, এমন সময় ভীমেন্দ্র সেইখানে গেল। ভীমেন্দ্রকে সেইখানে দেখিয়া ছেলেগুলি দুটী একটী করিয়া সেইখানে গিয়া যুটিল। ইহাদের ছাড়িয়া যাইবার কথা কেমন করিয়া গৃহিণীকে বলিবে ভাবিয়া ভীমেন্দ্রের চোখে জল আসিল। একটী ছোট বালিকা তাহা দেখিতে পাইয়া ছোট মুখটী কাল করিয়া মায়ের কাছে ছুটিয়া গেল, এবং মায়ের মুখে হাত দিয়া বলিল "ওমা! মা! দাদাবাবুল্ খিদে পেয়েছে—দাদাবাবু কাঁদ্‌ছে।" সরলার বিশ্বাস ক্ষুধা না পাইলে মানুষ কাঁদে না; কারণ হরিপদ বাবু কখনও বালক বালিকাদিগকে প্রহার করিতেন না। বসন্তবালা ভীমেন্দ্রের মুখের দিকে তাকাইলেন, দেখিলেন চোখের কোণে জল শুষ্ক হইয়া রহিয়াছে। ব্যস্ত হইয়া বসন্তবালা জিজ্ঞাসা করিলেন "ভীমেন্! বাবা, তুমি কাঁদ্‌ছো কেন?" পাঠক পাঠিকা



দিগের মধ্যে বোধ হয় সকলেই জানেন দুঃখের সময় যদি কেহ দুটো মিষ্ট কথা বলে, তাহা হইলে দুঃখটা আর ও যেন অধিক বোধ হয়—আর চোখের জল রাখা যায় না। ভীমেন্দ্র বাটীর গৃহিণীর এইরূপ ব্যস্ততা দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিল, কিছুই বলিল না। অবশেষে অতি-কষ্টে বলিল "আমি অনেক কাল মাকে দেখি নাই আমার বিধবা মা আমার জন্য না জানি কত কত পাইতেছেন; আমার কলিকাতায় যাইতে ইচ্ছা করে; কিন্তু—।" ভীমেন্দ্র আর বলিতে পারিল না। ছেলেমেয়েদের কোমল হৃদয়ে ভীমেন্দ্রের রোদনে আঘাত লাগিল, তাহারাও কাঁদিতে লাগিল। বসন্তবালা দেবী আঁচলের কোণে চক্ষু মুছিলেন। অবশেষে হরিপদ বাবু আফীশ হইতে বাড়ীতে আসিলে স্থির হইল যে ভীমেন্দ্রকে কলিকাতায় পাঠাইয়া দেওয়া হইবে, কিন্তু ভীমেন্দ্রকে মধ্যে মধ্যে—বৎসরের মধ্যে অন্ততঃ ১ বার—স্কুল ছুটি হইলে বগুড়ায় আসিতে হইবে; যাতায়াতের সমস্ত ব্যয় হরিপদ বাবু দিবেন। ভীমেন্দ্র যে চলিয়া যাইতেছে ছেলেদের একথা জানান হইবে না। এইরূপ বন্দোবস্তের পর হরিপদ বাবু ভীমেন্দ্রকে কিছু পথের খরচ দিলেন, একটী বাক্স পূরিয়া কিছু কাপড় ও খাবার দিলেন। হরিপদ বাবু ভীমেন্দ্রকে একখানি গরুর গাড়ী করিয়া দিলেন, তৎকালীন নিয়মানুসারে ভাড়া আগেই দিলেন এবং ভীমেন্দ্রের বাক্সটী তাহাতে তুলিয়া দিলেন। ভীমেন্দ্রের টাকা পয়সার থোলেটী বাক্সের মধ্যে পূরিয়া দিল;—পরিচিত গাড়োয়ান, ভয় কি? এইরূপ বন্দোবস্ত করিয়া কর্ত্তা ও গৃহিণীর নিকট বিদায় লইয়া, ঈশ্বরের নাম করিয়া (ভীমেন্দ্র যাত্রার সময় ঈশ্বরের নাম করিল, কিন্তু তাহা গৃহিণীর অনুরোধে) ভীমেন্দ্র বগুড়া পরিত্যাগ করিল।

ক্রমশঃ

---

## রামায়ণের উপদেশ।

### হরিশ্চন্দ্রের গল্প।

ধন্য মায়ের স্নেহ! এমন মাকে কত নিষ্ঠুর বালক অত্যাচার করিতে, কষ্ট দিতে ছাড়ে না। ওরে নির্ব্বোধ বালক! মা কি ধন আজ তাহা চিনিতেছ না; কিন্তু যে দিন মা মরিয়া যাইবেন—যে দিন 'আহা' বলিবার আর দুটী লোক থাকিবে না,—যখন 'মা' এই মিষ্ট কথা আর মুখে বলিতে পাইবে না—তখন বুঝিতে পারিবে, কি ধন ছিল, কি ধন গেল! আমরা মাকে যথেষ্ট কষ্ট দিয়াছি—এখন ভাবনার বোঝা মাথায় পড়িয়াছে;—যখন কষ্টে অস্থির হইয়া ঘরে ফিরিয়া যাই—(হতভাগা আমাদের মা নাই)—সেই ভাবনায় প্রাণের সহিত দুটো মিষ্ট কথা বলে এমন লোক নাই যখন দেখি, তখন কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে ইচ্ছা হয়,—"মা আমার! এতকাল তোমাকে কষ্ট দিয়াছি—সেই দুঃখে কি মা আমাকে ছাড়িয়া গেলে? ফিরিয়া আইস;—তোমাকে যে কষ্ট দিয়াছি, তার দশগুণ কষ্ট দিয়া যদি খুসী হও, মাথা পাতিয়া দিলাম—তবু ও ফিরিয়া আইস। আমি যে এখন বড় হইয়াছি,—ভাবনা, পাহাড়ের মত চারধারে আমাকে ঘেরিয়া ফেলিয়াছে;—এ সময়ে আপনার ভাবিয়া প্রাণের টানে দুটো স্নেহের কথা কে বলে?"—শৈব্যার মাতৃ স্নেহ দেখিয়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের পাহাড়ের ন্যায় মন ও গলিয়া গেল; তিনি অগত্যা শৈব্য ও রোহিতাশ্ব উভয়কে লইয়া চলিয়া গেলেন। হরিশ্চন্দ্র কিছুই বলিলেন না;—ভয়ানক দুঃখে কান্না পায় না—কেবল দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িলেন, কিন্তু তাহাতেই তাঁহার প্রাণের তলা পর্য্যন্ত পুড়িয়া গেল। শৈব্যা রোহিতাশ্বকে কোলে লইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে রাজার নিকট বিদায় লইলেন; একদিন যাঁহার শত শত দাসী ছিল, সেই শৈব্যা আজ পরের ঘরে দাসীর কাজ করিতে গেলেন।

এদিকে বিশ্বামিত্র দিন গণিতেছিলেন, কখন রাজাকে তাড়া দিবার দিন আসিবে—কাজেই সময় মত কাশীতে দেখা দিলেন। গিয়া দেখেন অর্দ্ধেক টাকা যোগাড় হইয়াছে;—তখন বিশ্বামিত্রের আর রাগ দেখে কে? বলিলেন "এই যতটুকু বেলা আছে, এর মধ্যেই যোগাড় করে রাখ, নইলে বড় ভদ্রস্থতা নাই; আমি এখন স্নান করে আসি।" এই বলিয়া বিশ্বামিত্র চলিয়া গেলেন। হরিশ্চন্দ্র নিজেকে বিক্রয় করিবার জন্য সেই দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে কাশীর বাজারে বাজারে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন কিন্তু কেহই তাঁহাকে কিনিতে চাহে না। অবশেষে এক চণ্ডাল সেই খানে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার অপরিষ্কার কালীর মত কাপড়ে চর্ব্বির গন্ধ, গলায় হাড়ের মালা, চোখ বসিয়া গিয়াছে, চুলে এত ধুলো দেখিলেই বোধ হয় যেন সমস্ত রাস্তাটা পা দিয়া না হাটিয়া মাথায় হাটিয়া আসিয়াছে, লম্বা লম্বা চুল কপাল ঢাকিয়া, চোখ ঢাকিয়া পড়িয়াছে, তাহার ভিতর দিয়া পেচকের মত মিটির মিটির করিয়া তাকাইতে তাকাইতে, মূলোদাঁতে হাসিতে হাসিতে চণ্ডাল সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল "কে চাকর বেস্তিচে? মুই তোকে কিনমু। বালো অইচে; এড্ডা চাকর পালিতো মুই বেঁচে যাই। তোর দাম কতরে?" চণ্ডালের ভাবভঙ্গী দেখিয়াই হরিশ্চন্দ্রের বিরক্তি হইল, কিন্তু তিনি স্থির ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কে বাপু"? চণ্ডাল আবার মূলোদাঁতে হাসিল, কপালের চুল সরাইয়া হরিশ্চন্দ্রের পা অবধি মস্তক পর্য্যন্ত বিশেষ করিয়া দেখিল, এবং বলিল "মুই বড্ডিলোক, হকোল মশানের কর্তা—মোরে না পুছ ক'রে কোনো মড়া কেউ পোড়াতি পারে না—তোর দাম কত?" হরিশ্চন্দ্র বলিলেন "দামের কথা শেষে হবে; তোমার কি কাজ কর্‌তে হবে, আগে তাই বল।" শ্মশানের কর্ত্তা বলিলেন—"মোর ঝা কাম হকোলি তোকে কর্‌তি অবে। শোর চরাবি, মড়ার কাপড় যড়ো কর্‌বি, ঝে মড়া পোড়াতি আসবে, তার কাছে হোলো কাহন কড়ি লবি। লে, লে হব মোকে দিবি। এখন বল্ তোর দাম কত।" হরিশ্চন্দ্র বলিলেন "৪ কোটী মোহর।" চণ্ডাল বলিল "তুই ঝা চাস তাই তোকে দিচ্ছি;এখন আয় মোর সাথে আয়।" এই কথা বলিয়া চণ্ডাল হরিশ্চন্দ্রকে ৪ কোটীর মোহর দিল;—বিশ্বামিত্র ৭ কোটী সোণা লইয়া বাজাইতে বাজাইতে স্বস্থানে চলিয়া গেলেন।

বিশ্বামিত্র কোথায় গেলেন, তাহা আমাদিগের জানিবার প্রয়োজন নাই। ইহার পর হরিশ্চন্দ্র ও শৈব্যার কি হইল, তাহাই দেখা যাউক। চণ্ডালের চাকর হইয়া হরিশ্চন্দ্র তাহার সমস্ত কার্য্য করিতে লাগিলেন, শ্মশানে মৃত দেহের কাপড় ইত্যাদি তুলিয়া রাখেন, যাহারা পোড়াইতে আসে তাহাদিগের নিকট পয়সা লন, এবং অন্যান্য সময়ে শূকর চরান। বিধাতা কেন যে অনেক সময় মহাধার্ম্মিকদিগকে মহাক্লেশে ফেলেন আর মহাপাপীরা পরের সর্ব্বনাশ করিয়া, পৃথিবীকে জ্বালাতন করিয়াও পায়ের উপর পা রাখিয়া মহাসুখে জীবন কাটায় এ সকল প্রথম প্রথম বড় আশ্চর্য্যের বিষয় বলিয়া মনে হয়; কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যায় যে ধার্ম্মিকদিগের এইরূপ পরীক্ষা তাঁহাদের উপকারের কারণ। স্বর্ণ অগ্নিতে পোড়াইলে যেমন অধিক উজ্জ্বল হয়, প্রদীপের আলো যেমন গভীর অন্ধকারেই অধিক শোভা পায়, ধার্ম্মিকের চরিত্র ও সেইরূপ বিপদাপদের মধ্যেই পরীক্ষিত হইয়া সুন্দর শোভা ধরে। সমস্ত বিপদাপদের মূলে এইরূপে দেখিলে দেখা যায় যে সেখানেও ঈশ্বরের দয়া! এই জন্যই ধার্ম্মিক পুরুষগণ ভয়ানক বিপদে পড়িলেও হাত দুটী যুড়িয়া বলিয়া থাকেন, 'ঘোর বিপদেও ব'লব তোমায় দয়াময়!'



শ্মশানে ও অন্যান্য অপরিষ্কৃত স্থানে চণ্ডালের কার্য্য করিয়া হরিশ্চন্দ্রের আর পূর্ব্বের ন্যায় শ্রী রহিল না; কিছুকাল পরে তাঁহাকে আর চেনা যায় না; সামান্য চণ্ডালের ন্যায় অযোধ্যার পূর্ব্বের রাজা এইরূপে ধর্ম্মের জন্য জীবন যাপন করিতে লাগিলেন।

এদিকে মহারাণী শৈব্যা রাজকুমার রোহিতাশ্বকে লইয়া ব্রাহ্মণের বাড়ীতে দাসীর কার্য্য করিতে লাগিলেন, রোহিতাশ্ব ব্রাহ্মণের দেবপূজার ফুল, বিল্বপত্র সকল খুজিয়া আনে এবং শৈব্যা ঘরের অন্যান্য কার্য্য করেন। এইরূপে অনেক দিন যায়; এক দিন রোহিতাশ্ব ফুল সংগ্রহ করিতে গিয়া বিপদে পড়িল। যে গাছ হইতে রোহিতাশ্ব ফুল আনিতে গিয়াছিল, সেই গাছে সাপ ছিল; রোহিতাশ্ব ফুলের জন্য গাছ নাড়িবা মাত্র সর্প তাহাকে দংশন করিল। বালকের সমস্ত শরীর জ্বলিয়া যাইতে লাগিল, সে বিষের জ্বালায় অস্থির হইয়া দৌড়িয়া গৃহে আসিল, এবং 'মা! আমার কি হ'ল' বলিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িল। শৈব্যা পাগলিনীর ন্যায় তাহাকে 'ভয় কি' 'ভয় কি' বলিয়া কোলে করিলেন, কিন্তু প্রাণ তখন বাহির হইয়া গিয়াছে। আহা! মায়ের প্রাণ কি তাহা বুঝে! শৈব্যা ব্রাহ্মণ-প্রভুর অনুগ্রহে চিকিৎসক পাইলেন, কিন্তু মৃত্যু যাহাকে ধরিয়াছে, চিকিৎসক তাহার কি করিবে? আহা! রাজরাণী পথের ভিখারিণী হইয়াও যে একমাত্র পুত্রের মুখ চেয়ে বেঁচেছিল, আজ সেই বুক-চেরা ধন তাকে ফাঁকি দিয়া গেল। কি কষ্ট! যত প্রতিবেশীর মেয়েরা আসিয়াছিল, সকলেই শৈব্যার মিষ্ট ব্যবহারে তাঁহার বাধ্য ছিল, সকলেই সেই 'সোণার চাঁদ' ছেলের জন্য দুঃখ করিতে লাগিল, কিন্তু ব্রাহ্মণের অধিক দয়া হইল না। তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়াছে—ব্রাহ্মণ বলিলেন "বাছা! তোমার ছেলেকে শ্মশানে ফেলে এসো! আমার বাড়ীতে রাত্রিতে মড়া থাকিতে পারিবে না।" শৈব্যা কাঁদিতে কাঁদিতে উঠিলেন। মৃতপুত্র কোলে করিয়া শৈব্যা শ্মশানের দিকে চলিলেন। তোমরা দেখ, কে কোথায় আছে, একবার চেয়ে দেখ! রাজ রাজেশ্বরী আজ মৃতপুত্র কোলে ক'রে শ্মশানের দিকে যাইতেছেন। আহাহা! বিধাতার নিয়ম বুঝা ভার। কেন আজ শৈব্যা এত ক্লেশে পড়িলেন! আমি কেন তাঁহার ক্লেশের ভাগী হইতে পারিলাম না! যদি আমার দ্বারা তাঁহার কষ্টের কিছু শান্তি হইত, তাহা হইলে আমি যে মহা আহ্লাদে তাহা করিতাম। যাহারা চিরকাল সুখে কাটাইয়াছে, তাহাদের হঠাৎ এই অবস্থা-পরিবর্ত্তনের ক্লেশ যে সহ্য হয় না! শৈব্যা শ্মশানে গেলেন, যে শ্মশানে হরিশ্চন্দ্র কার্য্য করিতেন, এ সেই শ্মশান। অন্ধকার রাত্রি; তাহাতে মেঘাচ্ছন্ন;—কাঁদিতে কাঁদিতে শৈব্যা সেই শ্মশানে গেলেন। হরিশ্চন্দ্র অন্য অন্য দিনের ন্যায় আজও শ্মশানে কার্য্য করিতেছিলেন, হঠাৎ কান্নার শব্দ শুনিতে পাইয়া সেই দিকে ফিরিলেন; তাঁহার কোমল মন উথলিয়া উঠিল। হরিশ্চন্দ্র যখন অন্ধকারের মধ্যে অল্প অল্প দেখিতে পাইলেন, যে একটী স্ত্রীলোক মৃত বালককে কোলে করিয়া আসিতেছে, তখন তাঁহার মনে নানারূপ আশঙ্কা হইতে লাগিল। 'আমার রোহিতাশ্ব নয়তো!' হায়রে দুঃখ! মহারাজ হরিশ্চন্দ্র, দেখ কি! তোমারই রোহিতাশ্ব ওই গেল! তুমি চিনিতে পারিলে না! হরিশ্চন্দ্রের মনে দুঃখ হইল, কিন্তু দুঃখেতে পাছে আপন প্রভুর নিয়মানুসারে কড়ি ও কাপড় লইতে ভুলিয়া যান, এই জন্য দুঃখ দূর করিলেন। যেখানে শৈব্যা কাঁদিতেছিলেন, হরিশ্চন্দ্র সেই খানে আসিলেন; এবং অতি কষ্টে চক্ষের জল সম্বরণ করিয়া বলিলেন 'ওগো আমার কড়ি দাও'। বিদ্যুতের আলোতে সেই হস্ত দুখানি দেখিতে পাইয়া শৈব্যা চিনিতে পারিলেন এবং 'মহারাজ! সর্ব্বনাশ হইয়াছে,'

বলিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তখন হরিশ্চন্দ্রের যে ক্লেশ তাহা কে বর্ণনা করিবে। কাটা ছাগলের মত হরিশ্চন্দ্র ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলেন, এবং শৈব্যাকে বাতাস দিয়া যাহাতে তাঁহার জ্ঞান হয় তাহার জন্য চেষ্টা করিতে আরম্ভ করিলেন। শৈব্যা চক্ষু মেলিলেন, কিন্তু আবার সেই শোকের আগুণ জ্বলিল। আর কত কষ্ট তাঁহারা সহ্য করিবেন? যখন কষ্টের চূড়ান্ত হইল, তখন ঈশ্বর হরিশ্চন্দ্রকে দেখা দিলেন; দৈব ঔষধের গুণে রোহিতাশ্বের প্রাণ বাঁচিল। রোহিতাশ্ব অবাক্ হইয়া পিতামাতাকে শ্মশানে আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। তখন ঈশ্বর হরিশ্চন্দ্রকে আশীর্ব্বাদ করিয়া অদৃশ্য হইলেন। হরিশ্চন্দ্র, শৈব্যা, রোহিতাশ্ব সকলে মিলিয়া নগরের দিকে আসিতেছিলেন, এমন সময় বিশ্বামিত্র সেই খানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আবার বিশ্বামিত্র আসিতেছেন দেখিয়াই শৈব্যার প্রাণ উড়িয়া গেল। বিশ্বামিত্র বুঝিতে পারিয়া আশ্বাস বাক্যে কহিলেন "ভয় নাই। যাহারা ঈশ্বরের অনুগ্রহ পায়, পৃথিবীতে তাহাদের ভয় কি? আজ তোমাদের সুদিন। সত্যধর্ম্মে স্থির থাকিয়া তোমরা পৃথিবী ও স্বর্গ দুই ই জয় করিয়াছ। আর ক্লেশে প্রয়োজন নাই। তোমাদের রাজ্য তোমরা লও, তোমাদিগকে দান করিলাম।" এই বলিয়া বিশ্বামিত্র ঋষি চলিয়া গেলেন। রাজা হরিশ্চন্দ্র পুনর্ব্বার রাজা হইলেন। রামায়ণে হরিশ্চন্দ্রের চরিত্রের মত চরিত্র আর একটীও নাই। কিসে হরিশ্চন্দ্রের চরিত্রের এত খ্যাতি? একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যায় হরিশ্চন্দ্রের চরিত্র আমাদিগকে এই শিক্ষা দিতেছে যে বিধাতা আমাদিগকে পরম সুখে অথবা ভয়ানক দুঃখে যে অবস্থাতেই রাখুন না কেন, যদি সেই সকল অবস্থাতেই তাঁহারই চরণে মন রাখিয়া ধর্ম্মপথে থাকিতে পারি, তাহা হইলে ইহকাল ও পরকালে নিশ্চয়ই সুখী হইতে পারিব, এবং সেই সুখী হইবার এক মাত্র উপায়।

রামায়ণে হরিশ্চন্দ্রের বিষয়ে আরও এক উল্লেখ দেখা যায়। হরিশ্চন্দ্রের ধর্ম্মের গুণে হরিশ্চ আপনার সমস্ত প্রজার সহিত স্বর্গে গিয়াছিলেন কিন্তু স্বর্গীয় কোন ঋষি জিজ্ঞাসা করিলেন "বাপুহে তুমি স্বর্গে আসিলে কোন গুণে?" তখন হরিশ্চ নিজে যে যে কার্য্য করিয়াছেন, তাহা বলিতে লাগিলেন। অমনি হরিশ্চন্দ্রের পতন হইল ইহার তাৎপর্য্য এই যে যতই সৎকার্য্য কর না কেন, একমাত্র অহঙ্কারই সকলকে নষ্ট করে। অত এব উপদেশ এই, যে কার্য্য করিবে, তাহাতে তো মার নিজের বল না দেখিয়া ঈশ্বরের দয়া দেখিবে 'আমিই এই কার্য্য করিলাম' ইহা না ভাবিয়া মনে করিও 'ঈশ্বরের দয়াতে এই কার্য্যটী হইল কারণ তাঁহার দয়া না হইলে কি কোন কার্য্য হয়? এইরূপে সমস্ত কার্য্য ঈশ্বরকে দিলে অহঙ্কারের হস্ত হইতে বাঁচিয়া যাইবে।

---

## মাকড়সা। ৫

এনেকে মাকড়সা মারাকে অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম মনে করেন। "মাকড়সা মেরোনা" বলিলে তাঁহারা হয় তো চমকিয়া উঠেন। মাকড়সার পূর্ব্ব পুরুষ কেহ বড়লোক ছিল না, সুতরাং বেচারা আমাদের নিকট আদর পায় না।

মাকড়সা দেখিতে অনেকটা কাঁকড়ার মত। পিপ্‌ড়ে প্রভৃতির সঙ্গেও কিছু সাদৃশ্য আছে। একটা গোল আঁক দিয়া তার চারিদিকে আটখানি পা বসাইয়া দিলেই মনে করিতে পার একটী কাঁকড়া হইল। কাঁকড়ার পেছনে আর একটী গোলাকার রেখা সংযুক্ত কর মাকড়সার কাছাকাছি যাইবে। মাকড়সার মাথায় বড় পাগ্‌ড়ী থাকিলে পিপ্‌ড়ে জাতীয় পোকার মত দেখা যাইত— তবে ঠ্যাং দুখানা বেশী হইত। মাকড়সার মুখে ভয়ানক দুটী অস্ত্র; তার দু একটী "চিম্‌টী" খাইলে হয় তো বড় সুবিধা বোধ করিবেন না। এই দুইটীকে



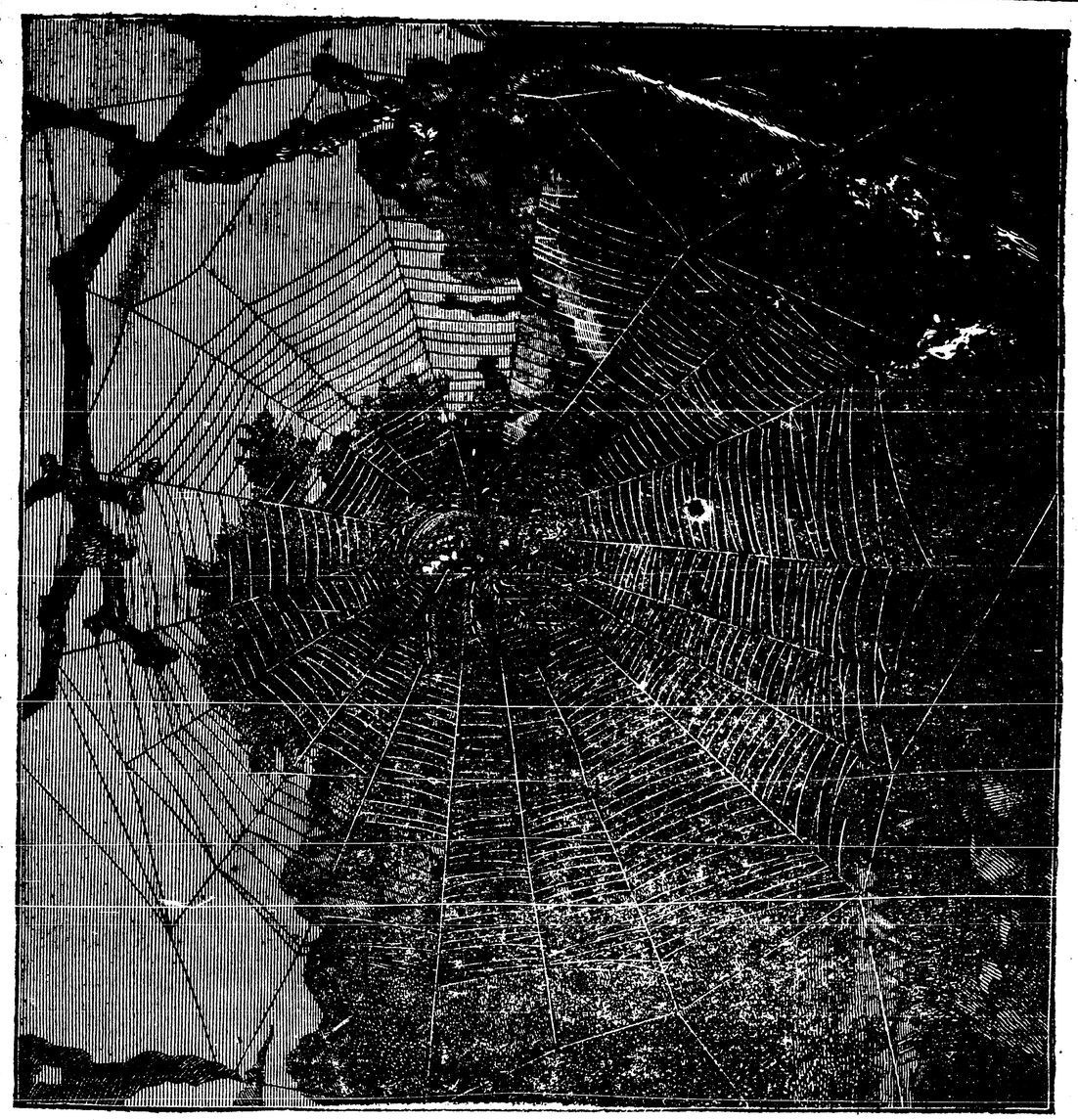

মাকড়সার সাঁড়াশী (দাঁত নয়!) বলা যাইতে পারে। যুদ্ধ এবং শিকারের সময় এই গুলি কাজে আসে। মাথায় বড় বড় দুটি চোখ। তার 'আশপাশে' খুঁজিলে ছোট ছোট আরো ৪।৫টী দেখিতে পাইবে। যদি জিজ্ঞাসা কর "এত চোখ কেন?" আমি বলিব "জানি না।"

মাকড়সার নাম লইলেই তাহার জালের কথা মনে পড়ে। জালে দুই কাজই চলে; বাড়ী করিয়া থাকা হয়, শিকারেরও সাহায্য হয়। মাকড়সার পেটের উপর গরুর বাঁটের মত ছোট ছোট কয়েকটী বাঁট আছে। এই বাঁটের মুখ দিয়া এক প্রকার আঠা বাহির হয় তাহাই বাতাসে শক্ত হইয়া দড়ির কাজ করে। এই দড়ি দিয়া জাল তৈরি হয়। এর এক একটা এত সরু যে চোখে দেখা যায় না, তবুও বড় বড় মাকড়সা তাহাতে ঝুলিয়া থাকে। কোন হতভাগ্য পোকা একবার যদি মাকড়সার জালে পড়িল তবে তাহার রক্ষার সম্ভাবনা অল্পই থাকে। হুড়োহুড়ি যত বেশী

করে ততই গোলমাল আরো বাড়িতে থাকে। শেষে নিরুপায় হইয়া পড়ে। জালওয়ালা এতক্ষণ মধ্য হইতে শান্তভাবে চাহিয়াছিল। যাই দেখিল ঘোগাড়টা পাকাপাকি হইয়াছে অমনি আস্তে আস্তে কাছে আসিল। দড়ি সঙ্গেই আছে; চারিদিক উত্তম রূপে দেখিয়া অম্লান-বদনে হতভাগ্যকে বাঁধিতে লাগিল। বাঁধা শেষ হইলে আহার। মাথা ছিড়িয়া শরীরের রস চুষিয়া লয়, আর কিছু খায় না। মাঝে মাঝে দুই একটা বোলতা আসিয়া জালে পড়ে। তখন আমাদের ইনি মনে করেন আপদ গেলেই বাঁচি! বোলতা চড়্ পড়্ করিয়া জালের খানিকটা ছিঁড়িয়া পালায়।

জালের কোন অংশ ছিড়িয়া গেলে 'লোকটা' যত্ন পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ তাহা মেরামত করিয়া রাখে। এক জাল অকর্ম্মণ্য হইয়া গেলে আর একটা করিয়া লয়। এই রূপে দড়ির পূঁজি ফুরাইয়া যায়। তখন প্রতিবেশী কেহ থাকিলে তাহাকে তাড়াইয়া দিয়া তাহার জাল দখল করে। অন্যের জাল নিকটে না থাকিলে কি করে? গোল্ডস্মিথ সাহেবের মনেও এই প্রশ্ন হইয়াছিল। তিনি একটা মাকড়সার পেছনে লাগিলেন। সে তাঁহার থাকিবার ঘরেই বাড়ী করিয়াছিল। তিনি তাহার সমস্ত ভাঙ্গিয়া তাহাকে সেখান হইতে তাড়াইয়া দিলেন। সে বার বার জাল গড়িতে লাগিল, সাহেব ও ভাঙ্গিতে ত্রুটি করিলেন না। একটা পোকার পেটে আর কত দড়ি থাকে! ভাল মানুষ নিরুপায় ভাবিয়া অগত্যা নিকটস্থ জাল দেখিতে গেল। জালের কর্ত্তা 'যুদ্ধং দেহি' বলিয়া প্রচণ্ড লড়াই করিলেন। কিন্তু সাহেবের মাকড়সারই জয় হইল। সাহেব ইহা দেখিয়া ঘরের সমস্ত জাল ছিড়িয়া দিলেন। এবার বেচারা বড় বিপদে পড়িল। কিন্তু ছোট জন্তু বলিয়া বুদ্ধি কম নয়। সাহেবের কাগজ পত্রের মধ্যেই বাড়ী করিল। ক্ষুধা হইলে এক যায়গায় মড়ার মত পড়িয়া থাকিত, কোন পোকা কাছে আসিলেই তাহাকে ধরিয়া ফেলিত। ক্রমশঃ—

---

# ফুঁদিয়ে প্রদীপ নিবাইও না।

## (প্রাপ্ত)

আমি ছেলে বেলায় বড় দুরন্ত ছিলাম কাহাকেও বড় একটা গ্রাহ্য করিতাম না। কিন্তু ঈশ্বরের কেমন মহিমা বলিতে পারি না, মাকে বড় ভাল বাসিতাম, তাঁহার কথা শুনিতাম। তিনি ধমকাইতেন না তাই বলিয়া হউক, বা আর কোন স্বাভাবিক কারণ থাকাতেই হউক কখনও তাঁহার অবাধ্য হইতে সাহস হইত না। আমি যা ধরিতাম, তা ছাড়িতাম না। তবে মা বারণ করিলে আর যেন তাহা করিতে প্রবৃত্তি হইত না।

এক দিন সন্ধ্যার সময় মা রান্নাঘরে প্রদীপ জ্বালিয়াছেন, ঘরটী আলোতে 'ফুট ফুটে' হইয়াছে, অন্ধকার চোরের মতন কোন্ কোণে লুকাইয়াছে। মা সেই ঘরে বসিয়া কি কাজ করিতেছেন, আমি সেই সময় "খিদে পেয়েছে" "খিদে পেয়েছে" বলে তাঁর কাছে গেলাম; মা আমার কথার উত্তর দিলেন না, তাই তাড়াতাড়ি একটু রাগ করিয়া বলিলাম "আচ্ছা যেমন আমায় খাবার দিলে না, তেমনি তোমার কাজ পণ্ড করছি—আমি তোমার প্রদীপ নিবাইয়া দিই।" যেমন বলা; অমনি কাজ করা। আমি প্রদীপ নিবাইয়া দিলে মা বলিলেন "যা! প্রদীপটা নিবাইয়া ফেল্‌লি! দেখ দেখি কত কাজের ক্ষতি হইল। তা যা করেছিস্ তা করেছিস্, তা প্রদীপটা ফুঁদিয়া নিবাইস্ নিত?" আমি বলিলাম "ফুঁদিয়াই নিবাইয়াছি।" মা বলিলেন "হারে হাবা ছেলে, ফুঁদিয়া কি প্রদীপ নিবাইতে



আছে?" আমি বলিলাম "কেন তাতে দোষ কি মা?" মা বলিলেন "তা তুমি জানিবে কি ক'রে? ওতে যে মুখে দুর্গন্ধ হয়। কথা কইতে গেলে মুখ দিয়া ভক্ ভক্ করে গন্ধ বেরোয়। কেউ তোমার সহিত কথা কহিতে চাহিবে না, যদিও বা কথা কয়, তাও নাকে মুখে কাপড় দিবে। তখন মনে কত কষ্ট পাবে, মনে ভেবে দেখ দেখি।" আমার মনে একটু দুঃখ হইল, মনে ভাবিলাম, কি কুকর্ম্মই করিয়াছি! সে দিন হতে স্থির করিলাম এমন কাজ আর করিব না। আমি আর কোন উত্তর করিলাম না।

রাত্রিটা নিদ্রায় কাটিয়া গেল। সকালে ঘুম ভাঙ্গিল, কালিকার রাত্রির কথাটা মনে পড়িয়া বড় ভয় হইল। তবে আজ আমার সঙ্গে কেহ কথা কহিতে আসিলে নাক মুখে কাপড় দিবে? দু বার তিন বার মুখের গন্ধ লইবার জন্য জোরে নিশ্বাস টানিলাম, কিছু বুঝিতে পারিলাম না। তাড়াতাড়ি মাকে বলিলাম "মা দেখত আমার মুখ হতে গন্ধ বাহির হচ্চে কি না।" মা একটু হাসিয়া আমার মুখের ঘ্রাণ লইয়া বলিলেন, "গন্ধ হয়নি, এক দিনে তত গন্ধ হয় না।" একটু সুস্থ হইলাম, প্রাণটা যেন বাঁচিল। সেই থেকে আর ফুঁদিয়া প্রদীপ নিবাই না।

ও কথা এখন ছাড়িয়া দিই। আসল কথাটা বলি। মা যাহা বলিয়াছেন, যে ফুঁদিয়া প্রদীপ নিবাইও না, ইহা বড় সত্য। আজ কাল বিজ্ঞান তাহা অপেক্ষা ভয়ানক কথা বলে। মাতো কেবল মুখের দুর্গন্ধের ভয় দেখাইয়াছিলেন, কিন্তু বিজ্ঞান তাহার চেয়ে শক্ত ভয় দেখায়। এখন জানিয়াছি, যে উহাতে কঠিন পীড়া, এমন কি প্রাণনাশ পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে। কেরোসিন তৈলের দীপ ফুঁদিয়া নিবাইতে গিয়া মানুষ মারা পড়িয়াছে শুনিয়াছি।

সকলেই জানেন যে প্রদীপ নিবাইলে একটা বিশ্রী দুর্গন্ধ বাহির হয়। ঐ দুর্গন্ধময় পদার্থটা বড় ভয়ানক জিনিশ। ইংরাজিতে উহার নাম কার্ব্বনিক এসিড। বাঙ্গালায় কেহ উহাকে দ্ব্যম্ল অঙ্গারক কেহ বা কেবল অঙ্গারক বাষ্প বলেন। অনেক অঙ্গারক বাষ্প যেখানে থাকে সেখানে মানুষ বাস করিলে তাহার প্রাণ নষ্ট না হউক, শক্ত রোগ জন্মিতে পারে। যাত্রা শুনিতে গেলে গরম বোধ হয়—সর্দ্দিগর্ম্মি লাগে। তাহার কারণ ঐ অঙ্গারক বাষ্প। আমরা যে বায়ু নিশ্বাস দ্বারা গ্রহণ করি তাহাতে উহার ভাগ নাই বলিলেই চলে,—৫০০০ ভাগে ৩।৪ ভাগ থাকে মাত্র। উহাই বিশুদ্ধ বায়ু। বিশুদ্ধ বায়ু শরীরের রক্ত পরিষ্কার করে। যখন বায়ুতে অঙ্গারক বাষ্পের ভাগ বেশী হয়, তখন তাহা নিশ্বাসে টানিয়া লইলে শরীরের মধ্যে যাইয়া রক্ত দূষিত করে। রক্ত দূষিত হইলে সকল পীড়াই জন্মিতে পারে। রোগ হইলে জীবনের কত অপকার এক বার ভাবিয়া দেখ। যদি আমি প্রতিদিন ফুঁদিয়া প্রদীপ নিবাই তাহা হইলে অঙ্গারক বাষ্প নিশ্বাসের সহিত শরীরের ভিতরে যাইবে, রক্ত দূষিত করিবে, কত রোগ জন্মাইবে, কত কষ্ট দিবে। এক আধ দিনে যদিও জানিতে পারা না যাক্ কিন্তু রোজ রোজ এইরূপ করিলে একটু একটু করিয়া অঙ্গারক বাষ্প শরীরের মধ্যে ঢুকিয়া একটু একটু করিয়া রক্ত দূষিত করিবে, কঠিন পীড়া জন্মাইয়া দিবে। দেখ এই একটা সামান্য কাজে কত অনিষ্ট করে। তাই বলি একাজটা কিছু নয় বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া উচিত নহে। আমাদের দেশের মেয়েরা যদিও বিজ্ঞান জানেন না, কিন্তু তাঁহারা কেমন বৈজ্ঞানিক দেখ। যাহা মেয়েরা অগ্রাহ্য করিয়া উড়াইয়া দেন না, তুমি কি তাহা উড়াইয়া দিবে? ফুঁদিয়া প্রদীপ নিবান অভ্যাসটা বড় মন্দ। সাবধান!

---

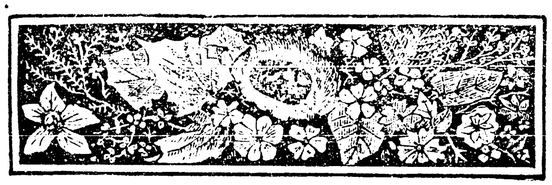

## বালিকাদিগের বিশেষ পৃষ্ঠা।

ঠিকাগণ! আপনারা যে আমাদিগের ঘরে বেতন না লইয়া নিজের ইচ্ছায় রন্ধন করেন এবং ঘরের অন্যান্য সমস্ত কার্য্য করেন, ইহাতে কি শুধু আমাদেরই সুখ, আপনাদিগের কি নাই? যখন আমার ভগ্নী অথবা আমার মাতা, অথবা আমার স্ত্রী, আমারই সুখের জন্য নিজে কষ্ট স্বীকার করিয়াও অনেক দ্রব্য প্রস্তুত করেন বা অনেক কাজ করেন তখন আমার ক্লেশের বোঝা কত কমিয়া যায়, প্রাণে কত আরাম হয়, তাহা কি আপনারা বুঝিতে পারেন? কিন্তু ইহাতে কি শুধু আমাদিগেরই আনন্দ, আপনাদিগের কি ইহাতে বিলক্ষণ আনন্দ নাই? সে মূর্খ যে বলে 'নাই!' "আমারই ভাই অথবা আমারি পুত্র, অথবা আমারি স্বামী আমার সামান্য পরিশ্রমের গুণে মনের সুখে, শরীরের সুখে কাল কাটাইবেন," এই চিন্তাতেও কোন্ স্ত্রীলোকের মন না উৎসাহিত হইয়া উঠে? জগদীশ্বর স্ত্রীলোককে ঘরের গৃহিণী করিয়া বাস্তবিকই যেন পৃথিবীর দুঃখের বোঝা অর্দ্ধেক কমাইয়া ফেলিয়াছেন। সমস্ত গৃহকর্ম্মের মধ্যে রন্ধন একটী প্রধান কর্ম্ম;—স্ত্রীলোকেরা ইহাতে যত পরিপক্ক, পুরুষেরা প্রায়ই তত নহেন। যাঁহারা ধনী তাঁহারা অনেক সময় ব্রাহ্মণ রাখিয়া এই ভাল কাজ করেন না। রন্ধন যে স্ত্রীলোকদিগের সকল অবস্থাতেই করিতেই হইবে এরূপ বলিতেছি না, তবে ভগিনী, মাতা, স্ত্রী, অথবা কন্যা নিজ হাতে কোন দ্রব্য সামান্য ভাবে রন্ধন করিলেও ভ্রাতা, পুত্র, স্বামী, বা পিতার তাহা আহার করিতে যত মিষ্ট লাগিবে, হাজার ব্রাহ্মণে ঘিয়ের 'শ্রাদ্ধ' করিলেও কি তত মিষ্ট লাগিতে পারে? এই জন্যই, যাঁহারা ব্রাহ্মণের হাতে সমস্ত রন্ধনের ভার দিয়া নিজেরা কিছুই করেন না, আমরা তাঁহাদিগের এই কাজকে তত ভাল মনে করি না। আজ আমরা একটী পরম সুন্দর দ্রব্য প্রস্তুত করিবার নিয়ম পাঠিকাদিগকে শিখাইয়া দিব, যাঁহারা জানেন না তাঁহারা শিখিয়া প্রস্তুত করিয়া দেখিবেন। অল্পবয়স্কা পাঠিকাদিগের জন্য যদিও এইটী লিখিত হইতেছে, তথাপি আশা করি ইহাতে অনেক অধিকবয়স্কা পাঠিকারও উপকার হইতে পারিবে।

### চন্দ্রপুলি প্রস্তুত করিবার নিয়ম।

আগে এই কয়েকটী জিনিশ যোগাড় করিয়া রাখঃ—(১) একটা ঝুনো নারিকেল; (২) খানিকটা ছানা; (৩) খানিকটা দোবরা চিনি, অভাবে যত ভাল পরিষ্কার পাওয়া যায়, সেইরূপ চিনি; (৪) ২।৩ ঝিনুক দুধ; (৫) খানিকটা ক্ষীর; (৬) অল্প একটু ঘি; (৭) পেস্তা, কিস্‌মিস, বাদাম; (৮) মিশ্রির গুঁড়ো; (৯) কিছু কলাপাতা; (১০) এক যোড়া কাঁচি বা একখানা ছুরি, বা বঁটি; (১১)গোটাকয়েক বাটী; (১২) গোটা দুই কড়াই; (১৩) শিল নোড়া।

তাহার পর নারিকেলের উপরটা ছোবড়া ছাড়াইয়া বেশ করিয়া চাঁছিতে হইবে, তাহার উদ্দেশ্য এই, তাহা না হইলে ছোবড়ার গুঁড়ো সকল উড়িয়া কুরিবার সময় আসিয়া পড়িবে। এইরূপ বেশ পরিষ্কার করিয়া ভাঙ্গিয়া কুর্‌তে হবে। তৎপরে খুব কাদার মত না হয়, একটু শক্ত থাকে, এই ভাবে বাটিতে হইবে, এবং ছানাও (যতটুকু দিলে ভাল হয় মনে হইবে' সেই আন্দাজে) নিংড়ে বাটিতে হইবে। এই দুটী বাটা জিনিশ একপাশে রাখিয়া দাও। এদিকে দোবরা চিনি জলে গুলিয়া চড়ান আবশ্যক; চিনি যখন ফুটে উঠিবে, তখন ২।১ ঝিনুক দুধ ছড়াইয়া দিবে; ইহাতে গাদ উঠিতে থাকে। গাদ শেষ হইলে, ঢালিয়া ছেঁকে লইয়া একটা বাটীতে রাখ।

ইহার পর কড়াটীকে বেশ পরিষ্কার করিয়া বা অন্য একটা পরিষ্কার কড়ায়, নারিকেল এবং ছানার আন্দাজে এই রস চড়াও। রসটা বেশ ঘন হয়ে আসিলে নারিকেল, ছানা, আর তাহার উপযুক্ত ক্ষীর দেওয়া আবশ্যক। অনন্তর খন্তি বা অন্য কোন যন্ত্র দিয়া খানিকক্ষণ নাড়িতে থাক; যখন দেখিবে বেশ পাক্ হইয়াছে অর্থাৎ এমন হইয়াছে যে ঘি হাতে মাখিয়া উনুনের উপরের জিনিশ গুলি হাতে পাকাইলে হাতে লাগিয়া যায় না, তখন নামাইয়া পেস্তা, বাদাম, কিস্‌মিস্ পরিমাণমত দিয়া নাড়িতে হইবে। নাড়িতে নাড়িতে সবগুলি বেশ মিশিয়া গেলে, দুটো কলাপাতার ভিতরে ফেলিয়া দুহাত দিয়া চন্দ্রের আকার করিয়া ঠেলিতে হইবে। এই কার্য্য শেষ হইলে কাঁচি দিয়া কাটিয়া, প্রত্যেক পুলির উপরে মিশ্রির গুড়ো ছড়াইয়া দিবে।

ওঃ নূতন বছরের আমোদ দেখ!!

## নববর্ষ।

বাহবা! বাহবা! হোঃ! হোঃ! হোঃ! ছেলে বাবুরা একেবারে হেসেই কুটপাট! বলি এত হাসি কেন? নূতন বছর এসেছে, বলেই বুঝি বাবুরা আহ্লাদে আটখানা হ'য়ে উঠেছ? বেশ! বেশ!

নূতন বৎসর আসিয়াছে। 'সখা'র পাঠক পাঠিকাগণের আর এক বৎসর বয়স বাড়িল। এই বালকবালিকারা যেমন নূতন পোষাক পরিয়া আহ্লাদে হাসিতেছে, আমরাও আজ সেইরূপ মনের আহ্লাদে, নূতন পোষাক পরিয়া পাঠক পাঠিকাদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া, সকলকেই আমাদিগের মনের আদর এবং মঙ্গল ইচ্ছা জানাইতেছি; আশীর্ব্বাদ করি নূতন বৎসরে সকলে সুখে থাকুন।

একটী বৎসর চলিয়া গেলে—দেশের সকলেই আনন্দ করে। বাড়ীর গৃহস্থ, দোকানের দোকানী, নৌকার মাঝি, সকলেই নূতন বছরে আপন আপন থাকিবার স্থান সাজায় এবং আনন্দ করে। যাঁহারা লেখাপড়া শিখিতেছেন, নূতন বৎসরের প্রথমে তাঁহারা আপন আপন ভাই ভগ্নী বা ভাল, বাসার অন্য দশজনকে নানারূপ নূতন জিনিশ কিনিয়া দিয়া থাকেন। আমরাও নূতন বৎসরে আনন্দিত হইয়াছি কিন্তু পাঠক পাঠিকাদিগকে কিছু উপহার দি, এমন সাধ্য অমাদের নাই। তবে নূতন পোষাক পরিয়া সকলের নিকট আসিয়া এই মনের কথা জানাইতেছি যে "ছবিতে চিত্রিত বালকবালিকাদিগের ন্যায় আপনাদিগের সকলের নূতন বৎসর ওইরূপ মনের সুখে কাটুক।"

কিন্তু এই আনন্দের মধ্যে একটী কথা না বলিলে যথার্থ 'সখা'র কার্য্য করা হয় না। সমস্ত বৎসর কাটিয়া গেল—সকলের একবৎসর বয়স বাড়িল—কিন্তু এই এক বৎসরে 'সখা'র পাঠক পাঠিকাদিগের মধ্যে কে কতখানি উন্নতি করিয়াছেন, কে কতখানি লেখা পড়া অধিক শিখিয়াছেন, কে কতখানি ভাল হইয়াছেন, তাহা ভাবিয়া দেখিবার এই সময়। যদি একটী বৎসর মিছামিছি নষ্ট হইয়া থাকে, তাহা হইলে আনন্দ করা উচিত হইবে কি? সেই হাসুক, যাহার বছর ভাল গিয়াছে। যাহা হউক, যে অবস্থাতেই হউক না কেন, নূতন বৎসরের প্রথমে সকলে প্রতিজ্ঞা করুন 'যেন এই বৎসর সকলে ভাল কাজ করিয়া, ভাল হইয়া, নিজের উন্নতি করিয়া কাটাইতে পারি।' পরমেশ্বর 'সখা'র পাঠক পাঠিকাদিগের ভাল ইচ্ছার সহায় হউন, 'সখা'-সম্পাদকের এই আন্তরিক প্রার্থনা।

## নূতন বৎসরের সুখবর।

খার পাঠক পাঠিকাগণ শুনিয়া সুখী হইবেন যে আমাদিগের কোন বন্ধুর স্ত্রী ইচ্ছা করিয়াছেন সখার পাঠক পাঠিকাদিগের উৎসাহের জন্য কিছু পুরস্কার দিবেন। তিনি এসম্বন্ধে আমাদিগকে যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহা প্রকাশ করা গেল:—

"শিশুদিগের উৎসাহের জন্য আমি ইচ্ছা করিয়াছি দ্বাদশ বৎসরের ন্যূনবয়স্ক যে বালক কিম্বা বালিকা আপনার পত্রে মুদ্রিত ধাঁধা সকলের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উত্তর দিতে সক্ষম হইবে, তাহাকে বৎসরান্তে ৫ পাঁচ টাকা পারিতোষিক দিব। আশা করি আপনি আমার প্রস্তাবে সম্মত হইবেন।"

শুভাকাঙ্ক্ষিণী

অলকাসুন্দরী রায়।

বোধ হয় বলাবাহুল্য যে আমরা অত্যন্ত আহ্লাদের সহিত আমাদিগের মাননীয়া পত্রপ্রেরিকার প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছি, এবং তাঁহার নিকট আমাদিগের কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। 'সখা'র পাঠক পাঠিকাগণের মধ্যে যাঁহাদের বয়স ১২ বৎসরের কম তাঁহারা এইবার চেষ্টা দেখুন। যে যতগুলি ধাঁধার উত্তর দিতে পারেন, আমাদিগের নিকট পাঠাইয়া দিবেন, আমরা তাহার একটী হিসাব রাখিতে স্বীকৃত আছি। বৎসরের শেষে যাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইবে, তিনিই এই পুরস্কার পাইবেন। ধাঁধার উত্তর গুলি কাহারও সাহায্য না লইয়া নিজে নিজে বাহির করিতে হইবে, এবং পত্রিকা প্রকাশের পর ১৫ দিনের মধ্যে আমাদিগের কার্য্যালয়ে পাঠাইয়া দিতে হইবে।

### আর একটী আশার কথা।

আমরা শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম যে 'সখা'র অল্পবয়স্ক একজন গ্রাহক নিজের সুখের ক্ষতি করিয়া 'সখা' গ্রহণ করিতেছেন। আমাদিগের কোন বন্ধু লিখিয়াছেন যে এই বালকটী মাতার নিকট হইতে জলখাবারের জন্য একটী টাকা পাইয়াছিল, কিন্তু সে তাহা জলখাবারের জন্য খরচ না করিয়া তাহা দ্বারা 'সখা'র গ্রহক হইয়াছে। বালকদিগের মধ্যে যে এইরূপ জ্ঞান লাভ করিবার ইচ্ছা দিন দিন বাড়িতেছে, সুখের একটু ক্ষতি করিয়াও যে বালকগণ নূতন নূতন বিষয় শিখিবার চেষ্টা করিতেছেন, ইহা অত্যন্ত আনন্দের বিষয়, তাহাতে সন্দেহ কি?

বোধ হয় পিতা মাতা এইরূপ সৎকার্য্যে বাধা না দিয়া বরং উৎসাহই দিবেন, কারণ সেই বালকই বড় হইয়া ভাল হয়, যে এই রূপে বাল্যকাল হইতেই শিক্ষার জন্য একটু একটু কষ্ট স্বীকার করা অভ্যাস করে। প্রত্যেক বালক বালিকারই উচিত এইরূপ দৃষ্টান্ত দেখিয়া চলেন।

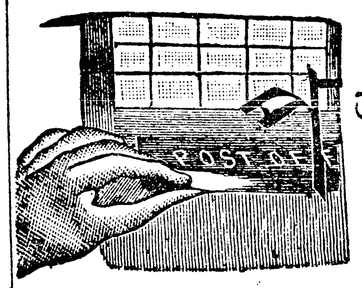

## ত্র প্রেরকদের প্রতি।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ—যে মাসে পত্রের বিষয়ে উল্লেখ করিতে হইবে তাহার পূর্ব্ব মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে পত্রগুলি এখানে আসা আবশ্যক। যাঁহাদের পত্রের বিষয়ে কিছু লেখা নাই, তাঁহারা জানিবেন যে তাঁহাদিগের পত্র হয় মনোনীত নহে, নতুবা স্থানাভাব।

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ভাগলপুর।—একটী মাত্র গৃহীত হইল।

শ্রীশরৎকুমার সরকার, ঘোড়ামারা,—৪টীর উত্তর হইয়াছে।

শ্রীতুলসীচরণ দে, কাদিহাটী।—প্রথমটী ভাল হইয়াছে, অন্যগুলি নয়, কিন্তু স্থানাভাব।

শ্রীঅমূল্যধন মুখোপাধ্যায়, কাদিহাটী। বাণানের দিকে আর একটু মন দিলে ভাল হয়। হেঁয়ালী মনোনীত নহে।

শ্রীসুশীলাবালা মুখোপাধ্যায়, কাদিহাটী। এই রূপ প্রশ্ন পাইলে আমরা বড়ই সুখী হই, তবে কোন কোন বালক বা বালিকা যেমন সম্পাদকের বিদ্যা বুদ্ধি পরীক্ষা করিবার জন্য যত রাজ্যের 'বিদ্‌ঘুটে' প্রশ্ন সকল করিয়া থাকেন, সেরূপ না করাই যথার্থ সুশীল বা সুশীলার কার্য্য। প্রশ্নগুলির উত্তর এই:—১। যখন আকাশে মেঘ উঠে, তখন সেই মেঘের মধ্যে তড়িৎ নামে একরূপ জিনিশ জন্মে—আবার তাহার ঠিক্ নীচে পৃথিবীতে ও তড়িৎ জন্মে। তড়িতে তড়িতে পরস্পরের দিকে একটু যেন ভালবাসার টান আছে, তাই পরস্পরের কাছে যাইতে চায়। এইরূপ টান যদি দুখণ্ড মেঘের মধ্যস্থ তড়িতে হয় তাহা হইলে আর পৃথিবীর লোকের বজ্রপাতের ভয় থাকে না; কিন্তু যখনই পৃথিবীর তড়িতে আর একখণ্ড মেঘের তড়িতে ভয়ানক টান হইল, অমনি মেঘের তড়িৎ পৃথিবীতে চলিয়া আসে। এই আসিবার নামই বজ্রপাত। এক মেঘ হইতে অন্য মেঘে যাইবার সময় তড়িতের তেজে যে আলো হয়, তাহাকেই আমরা বিদ্যুৎ বলি; আর যে শব্দটী আমরা শুনিতে পাই তাহাও এই তড়িতের দ্বারাই উৎপন্ন হয়। যখন ভয়ানক তেজে, ভয়ানক বেগে বাতাসের মধ্য দিয়া মেঘের তড়িৎ পৃথিবীতে নামে, তখন বাতাস হঠাৎ দুভাগ হইয়া তড়িৎকে পথ দেয়, কিন্তু তাহার পরেই সেই দুভাগ বাতাস খুব জোরের সহিত 'ঘষাঘষি' করিয়া মিশিয়া যায়। এই মিশিবার সময়েই দুভাগের 'ঘষাতে' যে শব্দ হয়, আমরা তাহাই শুনিতে পাই। বিদ্যুৎ বজ্রপাতের আগে হয়, একথা না বলিয়া বোধ হয় ইহাই বলা অধিক সঙ্গত যে শব্দ হইবার আগে আমরা বিদ্যুৎ দেখি। ইহার কারণ আর কিছুই নহে কেবল এই, যে শব্দ যত তাড়াতাড়ি চলে আলোক তাহা অপেক্ষা অধিক তাড়াতাড়ি যায়, এই জন্যই আমরা আগে বিদ্যুৎ দেখি, পরে শব্দ শুনি। বোধ হয় সকলেই জানেন যে যখন হাওয়া এক দিকে বহিতেছে, তখন যদি কেহ তাহার অন্য দিকে খানিকটা দূরে (মনে করুন নদীর একপাশে) দাঁড়াইয়া, দক্ষিণ বা উত্তর পাশে, একজন ধোবা কাপড় পরিষ্কার করিতেছে, তাহা দেখেন, তাহা হইলে দেখিবেন, কাঠের উপর কাপড় পড়িবার খানিক পরে শব্দটা কাণে আসে। এই দুই স্থলের কারণই এক। বজ্রপাত বলিলে সচরাচর সকলে মনে করে একখণ্ড লোহা মাথায় পড়িয়া মানুষ মরে, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে; তড়িতের তেজে শরীরের ভিতর এমন ভয়ানক একটা ঝাঁকুনি লাগে যে তাহাতে তখনই প্রাণ বাহির হয়। ২। বিদ্যুতের দ্বারা অনেক উপকার হয়, যাহা জানি; এমনও অনেক উপকার থাকিতে পারে যাহা বিদ্যুতের সৃষ্টিকর্ত্তাই জানেন। একটী উপকার;—ইহাতে সমস্ত বায়ুমণ্ডলের দূষিতভাবটী শোধরাইয়া দেয়; দ্বিতীয় উপকার,—ইহাতে অনেক পীড়া ভাল করে; তৃতীয় উপকার,—মানুষের জন্য দেশে বিদেশে 'খবরাখবর' লইয়া বেড়ায়, ইত্যাদি, ইত্যাদি। ৩। স্ফটিক প্রাসাদের ন্যায় প্রস্তাব থাকিবে কি না, তাহা বলা যায় না। আমাদের বিলাতের লেখিকার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। তবে বিদেশের কথা বলার আগে, দেশের নানারূপ খবর দিলে ভাল হয় না কি? আমরা তাহারই চেষ্টা করিতেছি।



শ্রীশ্যামাচরণ রায়, কাড়াপাড়া—পূর্ব্বের রচনা প্রকাশিত হইবে না, স্থির করা গিয়াছে। আপনার শেষের পত্রের বিষয় আগামীবারে আলোচিত হইতে পারে, কিন্তু তৎপূর্ব্বে আপনার বয়স কত তাহা জানা আবশ্যক, কারণ বালক ভিন্ন অন্য কেহ এই পত্রিকায় আলোচনা করিতে পারিবেন না।

শ্রীনলিনাঙ্গ রায়, কাড়াপাড়া।—স্থানাভাব, বিশেষতঃ লেখা কাগজের একপিঠে এবং আরও পরিষ্কার হওয়া উচিত ছিল। 'সখা' বালকবালিকাদিগের কাগজ হইলেও বালকবালিকাদিগের লেখার দ্বারা আমরা 'সখা'কে পূরিয়া দিতে চাই না। বালকদিগের রচনায় অত সংস্কৃত শ্লোক কেন?

---

### ভ্রমসংশোধন।

এবারকার প্রথম পৃষ্ঠায় যে ছবিটী দেওয়া হইয়াছে, সেটী "শ্মশানে হরিশ্চন্দ্র" রাজার ছবি—স্থানাভাবে পূর্ব্বে লেখা হয় নাই।

---

### ধাঁধা।

#### পূর্ব্ববারের প্রশ্নগুলির উত্তর।

১। কমলা—লক্ষ্মী, লেবু। ২। জাল দিয়ে মাছধরা। ৩। বাতাস। ৪। উকীল। ৫। দুয়েরই পাখা আছে, প্রভেদ এই পাখীর পাখা শরীরে, বাবুর পাখা হাতে, বাতাস খাইতেছেন।

নিম্নলিখিত স্থান সকল হইতে উপরের উত্তর গুলি সমস্ত পাওয়া গিয়াছে;—বালিকা সমিতি, বেথুন স্কুল; যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ব্যাসডাঙ্গা; সুবোধচন্দ্র মহলানবিশ, কলিকাতা; শ্যামাচরণ রায়, কাড়াপাড়া; বিহারীলাল গোস্বামী এবং হরিভূষণ গুপ্ত, পাবনা।

### নূতন।

১। একটী সাড়েচার বৎসরের বালক 'সখা'র পাঠক পাঠিকাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছে—
'বাঘ নয়, ভালুক নয়, আস্ত মানুষ গেলে"—কে?

২। একজন শিক্ষকের অনেকগুলি ছেলে, তাহাদের মধ্যে একজন খুব চালাক। শিক্ষক একদিন রাগিয়া তাহার আক কাড়িয়া লইলেন, এবং তাহাকে সিদ্ধ করিয়া খাইয়া ফেলিলেন। বলতো খাওয়াটা কি রকম হইল?

৩। এমন সাতটী কথা কি যাহাদের প্রথম অক্ষর গুলি একসঙ্গে লইলে একজন লাট সাহেবের নাম, এবং শেষের অক্ষর গুলি একসঙ্গে লইলে অন্য একজন লাট সাহেবের নাম হয়? কথাগুলির বিশেষ পরিচয় এই—

| | | |
|---|---|---|
| ১ম কথাটী, ইংরাজী | — | কার্য্য বিবরণ। |
| ২য় কথাটী | — | অত্যন্ত। |
| ৩য় কথাটী | — | ৯০০। |
| ৪র্থ কথাটী | — | বাণান। |
| ৫ম কথাটী | — | সর্ব্বদা। |
| ৬ষ্ঠ কথাটী | — | ২ নয়। |
| ৭ম কথাটী | — | প্রস্তুত করিব। |

৪। নিম্নলিখিত পত্র খানির মধ্যের শূন্যস্থান পূর্ণ কর, কেবল সাবধান হইবে যে প্রথম শূন্য স্থানটী যে কথাটী বা কথাগুলির দ্বারা পূর্ণ করিবে, দ্বিতীয় স্থানটী, সেই কথার উল্টা কথা দিয়া পূর্ণ করিতে হইবে; যথা, প্রথমটী পূর্ণ করিতে যদি 'তন' লাগে, তাহা হইলে দ্বিতীয়টী পূর্ণ করিতে, 'নত' বসাইতে হইবে।—

ভাই যদু—

তোমার পত্র পাইলাম। অখিল এবং—সে দিন—তে স্নান করিতে গিয়া বড় বিপদে পড়িয়াছিল।—ও সঙ্গে ছিল, কিন্তু—কোন বিপদে পড়ে নাই। তাহারা যখন যাইতেছিল, তখন আমি বলিলাম তোমরা এখন—; কিন্তু আমার—না শুনিয়া,—সেই—রাতিই—তে গেল।—একটু শুনিয়াছিল, কিন্তু অখিল কোনমতে না শুনিয়া তাহাকে টানিয়া লইয়া গেল।—রফল ও পাইয়াছেন;—রফল এই হইয়াছে যে গিয়া যাই নাবিয়াছেন, অমনি,—গুলি মাছ সেই ঘাটে ছিল, তাহারা অখিলের পায়ের—অংশ ছিঁড়িয়া লইয়াছে, এবং—কে—র মধ্যে ফাদায় ফেলিয়া দিয়াছে। অখিল এখন খোড়া হবে পড়ে আছে। সত্বর যে আ—হবে তাহার সম্ভাবনা নাই; বলিতে কি এখন সে—র মত পড়ে থাকে। আর অধিক কি লিখিব, ইতি। তোমার স্নেহের হেমচন্দ্র।

## সখা-সংক্রান্ত নিয়মাবলী।

১। সখার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য কলিকাতা ও মফস্বলে এক টাকা মাত্র। প্রতি খণ্ডের নগদ মূল্য ⁄১০ মাত্র। পোষ্টাল নোট, মণি অর্ডার বা অর্দ্ধ আনার ডাকটিকিটে, "সখা-কার্য্যাধ্যক্ষ" এই নামে সখার মূল্যাদি পাঠাইতে হইবে। ডাকটিকিটে মূল্য পাঠাইলে প্রত্যেক টাকায় কমিশন বলিয়া ⁄০ এক আনা পাঠাইতে হইবে।

২। পত্রিকাস্থ চিত্রের সংখ্যা কিছুই নির্দ্দিষ্ট থাকিবে না। তবে প্রত্যেক সংখ্যায় যাহাতে অন্ততঃ একখানি চিত্র থাকে আমরা সেদিকে দৃষ্টি রাখিব।

৩। বালকবালিকাদিগের রচনা উৎকৃষ্ট হইলে তাহা সাদরে গৃহীত হইবে; তবে সুদীর্ঘ হইলে তাহা প্রকাশিত হইবে না।

৪। শিক্ষক এবং অভিভাবকদিগের পরামর্শ প্রভৃতি সাদরে গৃহীত হইবে।

৫। বালকবালিকাদিগের উপকারে আসিতে পারে, কেহ এরূপ কোন রচনা বা কোন সংবাদ কিম্বা সত্য ঘটনার বিশেষ বিবরণ আমাদিগের নিকট পাঠাইলে আমরা তাহা সাদরে প্রকাশ করিব।

৬। সখা-সংক্রান্ত সমস্ত পত্রাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইতে হইবে; কেবল রচনা পরামর্শ প্রভৃতি সম্পাদকের নামে কার্য্যালয়ের ঠিকানায় পাঠান আবশ্যক।

৭। ঠিকানার পরিবর্ত্তন, নামের গোল বা কার্য্যসম্বন্ধীয় অন্য কোন অসুবিধা হইলে মোড়কের উপরে যে নম্বর দেওয়া থাকিবে সেই নম্বরের উল্লেখ করিয়া পত্র লিখিতে হইবে।

৮। ধাঁধার উত্তর, আলোচনার বিষয়, বা সখায় প্রকাশ করিবার জন্য পত্র প্রভৃতি, পূর্ব্বের মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে আমাদিগের কার্য্যালয়ে পৌছা আবশ্যক।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে মুদ্রিত এবং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট "সখা" কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

প্রথম ভাগ। জুন, ১৮৮৩। ৬ষ্ঠ সংখ্যা

## ভীমের কপাল।

৭ম অধ্যায়।

বগুড়া হইতে কলিকাতা যাইতে হইলে চৈতন্যগ্রাম পর্য্যন্ত গরুর গাড়ীতে আসিতে হয়। তথায় বিশ্রাম না করিয়া গরুর পক্ষে চলা কষ্ট, সুতরাং তৎকালে এইরূপ নিয়মই ছিল যে বগুড়া হইতে কলিকাতায় আসিতে হইলে চৈতন্যগ্রামে গিয়া গাড়ী বিদায় দেওয়া হইত। পূর্ব্বে নৌকা করিতে গিয়া যেরূপ ঠকিয়াছিল ভীমেন্দ্রের তাহা স্মরণ ছিল, সুতরাং সে এবার মনে করিয়া 'কাহার গাড়ী' একথা জানিয়া রাখিয়াছিল। সন্ধ্যাবেলা গরুর গাড়ীর আড্ডায় গিয়া ভীমেন্দ্র দেখিল দু তিন খানা গাড়ী প্রস্তুত রহিয়াছে, ভীমেন্দ্র একখানার নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিল 'একি খোদাবক্সের গাড়ী?' গাড়োয়ান বলিল হাঁ! ভীমেন্দ্র নিশ্চিন্ত মনে গাড়ীতে উঠিল—গাড়োয়ান গরু যুতিয়া গাড়ী হাঁকিতে লাগিল।

ভীমেন্দ্র কখনও গরুর গাড়ীতে চড়ে নাই, সুতরাং যখন এক একবার মাথা নীচের দিকে পা উপর দিকে যাইতে লাগিল, এক এক বার যখন গড়াইতে গড়াইতে গাড়ীর এপাশ ওপাশ করিতে হইল, তখন ভীমেন্দ্রের কিছু ক্লেশ বোধ হইল। যাহা হউক এইরূপে সমস্তরাত্রি কাটিয়া গেল, ভীমেন্দ্র অর্দ্ধ জাগরণে অর্দ্ধ নিদ্রায় রাত্রি কাটাইল। প্রাতঃকালে ভীমেন্দ্র গাড়োয়ানকে জিজ্ঞাসা করিল 'আর কতদূর আছে?' গাড়োয়ান বলিল "আর ১ ক্রোশ; এক ঘণ্টার মধ্যে পৌছিব।"অবশেষে একটী বড় গ্রাম বা বন্দর দেখা যাইতে লাগিল। ভীমেন্দ্র মনে করিল 'ঐ চৈতন্যগ্রাম';—জিজ্ঞাসা করিল 'ঐ বুঝি দেখা যায়?' গাড়োয়ান বলিল "হাঁ বাবু!" যথা সময়ে গাড়ী থামিল। ভীমেন্দ্র নামিয়া বলিল "গাড়োয়ান! বাক্সটা কই?"গাড়োয়ান কহিল "কই, আমার এই গাড়ীতে কেউ কোন বাক্স দেয় নাই ত!" ভীমেন্দ্র মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। তাহার গাড়োয়ানের সহিত যে কথা বার্ত্তা হইল, তাহা বলিবার প্রয়োজন নাই। তাহার মর্ম্ম এই; এস্থান চৈতন্যগ্রাম নহে—ভীমেন্দ্র এবারেও ভুল করিয়া অন্য গাড়ীতে আসিয়াছিল। বগুড়ার এক পার্শ্বে খোদাবক্স নামে একজন মুসলমান বাস করিত, তাহার অনেক গুলি ভাড়াটিয়া গরুর গাড়ী ছিল। সকলগুলিই 'খোদাবক্সের আড্ডার গাড়ী' এই নামে পরিচিত। সুতরাং বিশেষ করিয়া গাড়োয়ানের নাম জিজ্ঞাসা না করাতেই এই গোলমাল ঘটিয়াছিল। যে দিন ভীমেন্দ্র চৈতন্যগ্রামে যাইবার জন্য খোদাবক্সের একটা গাড়ীতে বাক্স তুলিয়া দিয়াছিল, সেই দিনই আর একটা গাড়ীতে বগুড়ার মুন্সেফ বাবুর একটী দূর সম্পর্কীয় ভাইপোর রশুল-

পুর যাইবার কথা ছিল। এখন পাঠক পাঠিকা বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছেন ভীমেন্দ্র কোথায় আসিয়া পড়িয়াছে। রশুলপুরে ভীমেন্দ্র আসিল, কিন্তু তাহার যে বাক্সের মধ্যে টাকা, খাবার, সমস্তই রহিয়াছে সে বাক্স না পাইয়া ভীমেন্দ্র বড়ই দুঃখিত হইল। তখন সে ভাবিল "ভাল, এই গাড়ীতেই বগুড়ায় ফিরিয়া যাই না কেন?" গাড়োয়ানকে এই কথা জিজ্ঞাসা করাতে গাড়োয়ান বলিল "আমার গরুকে না ঠাণ্ডা করে আমি যেতে পারি না। পরশু আমি এখান থেকে যাব।" তবেইত বিপদ! অন্য গাড়ী করিতে হইলে নিয়মানুসারে আগেই ভাড়াটী দিতে হয়; ভীমেন্দ্র টাকা কোথায় পাইবে? তখন সে গাড়োয়ানের নিকট বিদায় লইয়া খানিকটা দূরে গিয়া ভাবিতে বসিল। রশুলপুরের বাজার দেখিলে বোধ হয় যেন রশুলপুর খুব একটা প্রকাণ্ড গ্রাম, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। সেই গ্রামে সপ্তাহের মধ্যে দুদিন হাট বসে, নানা স্থান হইতে নানারূপ দ্রব্যের আমদানি এবং এবং অনেক লোকের জনতা হয়; এই জন্য বাজারটি খুব বড়। ফলতঃ রশুলপুর একখানি ক্ষুদ্র-গ্রাম। তাহাতে চাষা, জেলে, ইত্যাদি জাতি ভিন্ন অন্য জাতির বাস নাই। ভীমেন্দ্র ভাবিতে লাগিল, কি ভাবিল তাহা ভীমেন্দ্রই জানে; বোধ হয় কলিকাতা হইতে মামার বাড়ীতে যাত্রা এইখান হইতে আরম্ভ করিয়া সকল কথাই ভীমেন্দ্রের মনে পড়িয়া গিয়াছিল। পল্লীগ্রামে অপরিচিত একটী লোক আসিয়াছে, ভীমেন্দ্রের আসিবার অল্পকালের মধ্যেই এই সংবাদ গ্রামময় ছড়াইয়া পড়িল। তখন গ্রামের প্রাচীনলোকেরা ৪।৫ জন ভীমেন্দ্রের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা আসিয়া দেখিলেন ভীমেন্দ্র মাথায় হাত দিয়া ভাবিতেছে; দেখিয়াই তাঁহারা খানিকক্ষণ স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন। রশুলপুরের দরিদ্র ছোট লোকদিগকে 'তিনি' 'তাঁহারা' এরূপভাবে উল্লেখ করিতেছি কেন, জানিতে চাও? ইহাঁদের মত ভদ্র, নিরহঙ্কারী, নির্ব্বিবাদী, সহজ-সন্তুষ্ট লোক আমি আর দেখি নাই। রশুলপুরের চাষাদের সহিত যে একবার আলাপ করিয়াছে সেই তাঁহাদের গুণের প্রশংসা করিয়াছে। যাঁহারা মনে করেন ধর্ম্ম, সৎভাব, প্রভৃতি কেবল বড়লোকের মধ্যেই দেখা যায়, তাঁহাদিগের যে অত্যন্ত ভুল, রশুলপুরের চাষাদের জীবন দেখিলেই তাহা বুঝা যায়। ইনি ভদ্র, উনি অভদ্র, এরূপ প্রভেদ যদি কেবল বংশেতেই হইত, তাহা হইলে এই চাষাদের মান্য করিতাম না। আমি ভদ্রবংশে এরূপ ছোটলোক দেখিয়াছি, যাহাদিগকে 'তুই' বলিয়া কথা বলিতেও ঘৃণা বোধ হয়; আর রশুলপুরের ঐ যে ৫ জন চাষা ভীমেন্দ্রের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন, উহাঁদের পবিত্র জীবন দেখিয়া উহাঁদের প্রতি ভক্তি না দিয়া কি থাকিতে পারা যায়? পাঠক! তুমি যদি নীচবংশে জন্মিয়া থাক, লজ্জিত হইও না—রশুলপুরের এই চাষাদের মত হও; আমি তোমাকে ভদ্র বলিব। আর যদি ভদ্রবংশে জন্মিয়া ভদ্রোচিত গুণ না পাইয়া থাক, তবে তোমাকে ছোট লোক ভিন্ন কি বলিব?

বদন জেলে, কেরামতালি চাষা, হারাণ কামার, জগন্নাথ তেলী এবং ভগীরথ নাপিত সেই গ্রামের মধ্যে প্রধান লোক বলিয়া পরিচিত।—ইহাঁদের কার্য্যদক্ষতা এবং ধর্ম্মভয় যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারাই ইহাঁদের দ্বারা আপনাদের আবশ্যকীয় কাজ করাইয়া লইতে আরম্ভ করিয়াছেন। ফলতঃ এই সকল "ছোট লোকেরা" তাহাদের সৎচরিত্র এবং পরিশ্রমী হস্তের গুণে মহাসুখে কাল কাটাইতেছিল। তুমি বিদ্বান, তুমি হয়ত নিজের বিদ্যায় মনে মনে অহঙ্কৃত হইয়া আমার এইরূপ বর্ণনায় হাস্য করিবে, কিন্তু তোমাকে একটি কথা বলিয়া রাখি—লেখা পড়া শিখিয়া বড় বড় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দশের প্রশংসা-ভাজন হও, তাহাতে দুঃখ কি?



কিন্তু যদি সৎচরিত্র এবং শ্রমশীলতা এই দুটী জিনিশের তোমার অভাব হয়, যদি যথেচ্ছাচারকে এবং আলস্যকে তোমার অঙ্গের ভূষণ করিয়া থাক, যদি উদরান্নের জন্য শারীরিক পরিশ্রমকে তুমি ছোটলোকের কাজ মনে করিয়া তাহা হইতে বিরত থাক, তাহা হইলে তোমার বিদ্যা তোমার সুখের কারণ না হইয়া, গলগ্রহ মাত্র হইয়া উঠিবে।

ভীমেন্দ্র খানিকক্ষণ পরে মাথা তুলিয়া দেখিল কয়েকজন প্রাচীন লোক কাছে দাঁড়াইয়া আছেন; ভীমেন্দ্র কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না; ভীমেন্দ্র অপরিচিত লোকের চাউনি সহ্য করিতে পারিত না; একবার ভাবিল অন্যত্র চলিয়া যাই, আবার কি ভাবিয়া মাথা হেট করিয়া বসিয়া রহিল। তখন হারাণ কামার এবং ভগীরথ নাপিত একটু অগ্রসর হইয়া আসিলেন। অনন্তর উভয়ে কি পরামর্শ করিয়া, হারাণ কামার ভীমেন্দ্রের নাম, বয়স, অবস্থা, সেখানে আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ভীমেন্দ্র নিজের দুর্ভাগ্যের কথা বলিল। বুড়ো কেরামতালি এই দুঃখের কথা শুনিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, বলিলেন "আল্লা কখন কাকে কোন্ দুঃখে ফেলেন, তা তিনিই জানেন।—সে বার মকবুলালির ছেলে খেতাবদিন যে কোথায় গেল, আর তাকে পাওয়া গেল না। হয়ত মারা পড়েছে। আল্লাতালা আমাদের বুড়োদের না নিয়ে ছেলেদের কেন যে নেন তা বুঝি না।" এই কথা বলিতে বলিতে কেরামত ছুটিয়া আসিয়া ভীমেন্দ্রকে বলিলেন "বাবা! এস আমাদের বাড়ীতে কি যেখানে খুশি, এস—এখানে তুমি [illegible] অবশেষে স্থির হইল, ভীমেন্দ্র হারাণ কামারের বাড়ীতেই থাকিবে। সকলে আসিয়া তাহাকে রোজ দেখিয়া যাইবে, এবং হাটের দিন বাবুরা আসিলে ভীমেন্দ্রকে কলিকাতায় পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিবে। 'বাবুরা' এ কথার অর্থ এই যে রশুলপুরের বাজার যাঁহার সম্পত্তি, প্রতি হাটবারে তাঁহার দুজন প্রধান কর্ম্মচারী সকলরূপ গোলমাল নিবারণের জন্য সেখানে উপস্থিত থাকেন। ইহাঁরাই 'বাবুরা' এই নামে পরিচিত। এইরূপ স্থির হইলে অসহায় ভীমেন্দ্র হারাণ কামারের সহিত তাঁহার বাড়ীতে গেল। অন্যান্য চাষারাও আপন আপন কর্ম্মে গেল। ক্রমশঃ—

## গিল্‌ফয় সাহেবের অদ্ভুত সমুদ্র-যাত্রা।

আমরা—'ইউনাইটেড্ ষ্টেট্‌স্' কোথায় জান? পৃথিবীর মান চিত্রের বাঁ ধারের গোলাকারটির নাম নূতন মহাদ্বীপ। নূতন মহাদ্বীপের বড় দেশটা আমেরিকা। আমেরিকার মাঝখানটা খুব সরু; দেখিতে দুইটী দেশের মত দেখায়। এই দুইটীর উপরেরটীর নাম উত্তর আমেরিকা আর নীচেরটীর নাম দক্ষিণ আমেরিকা। উত্তর আমেরিকার যত দেশ, ইউনাইটেড্ ষ্টেট্‌স্ তার মধ্যে সকলের বড়!

ইউনাইটেড্ ষ্টেট্‌সে গিল্‌ফয় সাহেবের বাড়ী। গিল্‌ফয় সাহেব বড় মজার লোক। বয়স ৩৩ বৎসর হইবে। সাহেব এই বয়সটা প্রায় জাহাজে থাকিয়াই কাটাইয়াছেন। জাহাজে চড়িয়া কত দেশে গিয়াছেন, কত তামাসা দেখিয়াছেন, কিন্তু একা ছোট নৌকায় প্রশান্ত মহাসাগর পার হন নাই, এই [illegible] হাত হইল। ৫৫ মোন জিনিস ধরে। নাম রাখিলেন পাসিফিক্। সাহেব বলিলেন জলবিহার করিয়া করিয়া অষ্ট্রেলিয়া যাইব। অষ্ট্রেলিয়া আমেরিকা হইতে প্রায় ৬০০০ মাইল দূরে!

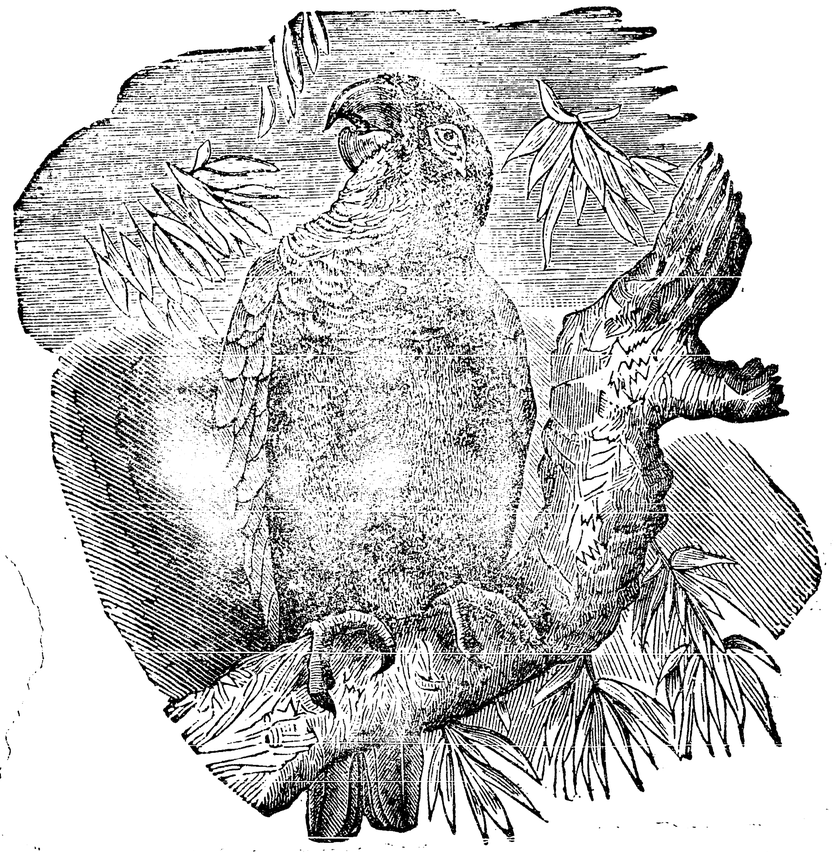

কিন্তু মণিরাম কে ? কোন বালক ? না বাড়ীর কোন আত্মীয় স্বজন, কেউ ? না। তবে মণিরাম কে ? মণিরাম একটী সুন্দর কাকাতুয়া পাখী। শাদা ধব ধব করিতেছে, মাথায় হল্‌দে ঝুটি। পাখীটী অনেক কেলে, বয়স ৫৬ বৎসর হইয়াছিল। তাহার কত গুণ ! সে হাঁসের মত ক্যাঁ ক্যাঁ করিত, শিশুর ন্যায় [illegible] দিত, বিড়ালের ন্যায় ম্যাও ম্যাও করিয়া ডা- [illegible] ঘেউ করিত, বালি- [illegible] মশশা [illegible] গান গাইত, ফোৎ ফো [illegible] ভয়ানক হাঁচি দিত, রেলের বাঁশীর শব্দ করিত, এবং হিরণ্ময়ী ও কর্ত্তা এবং গৃহিণীর সঙ্গে মাঝে মাঝে লুকোচুরী খেলিত।

বাড়ীর সকলের মধ্যে হিরণ্ময়ীর সঙ্গেই মণিরামের কিছু অধিক ভাব ছিল। হিরণ্ময়ীর বয়স ১৩। ১৪ বৎসর। দুঃখ কাহাকে বলে সে তাহা জানেনা ; এক গাল পান চিবাইয়া হা হা করিয়া হাসিয়া হাসিয়া হিরণ সমস্ত দিনই বাড়ীময় আমোদ করিয়া ফিরিত। মণিরামকে খাবার দিবার ভার হিরণের উপর ছিল। সে পাখীকে খাবার দিত, কখনও তাহার ধারাল ঠোঁটে চুমো খাইত, কখনও তাহার সহিত খেলা করিত এবং [illegible] আমার' 'যাদু আমার' বলিয়া আদর [illegible] বাধ্য হইত [illegible] ত্যক্ত করিয়াছে মণিরাম কখনও তাহাকে [illegible] বাসে নাই। মণিরামের অন্য ক্ষমতা বেশী থাক না থাক নষ্ট করিবার ক্ষমতাটী বেশ ছিল। যেখানেই তাহাকে বসাইয়া রাখ সে কিছু না কিছু নষ্ট করিয়া বসিয়া আছে। প্রথমে পোষাপাখী বলিয়া মণিরামকে শিকলে বাঁধা হয় নাই, কিন্তু খোলা বেড়াইতে পাইয়া যখন সে বাড়ীঘরের ক্ষতি করিতে লাগিল, তখন তাহাকে পায়ে শিকল বাঁধিয়া রাখা হইতে লাগিল।



বিকাল বেলা তাহাকে অল্প সময়ের জন্য ছাড়িয়া দেওয়া হইত কিন্তু সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বেই আবার পায়ে শিকল পরিয়া, মণিরামকে সেই অবস্থাতেই সমস্ত রাত্রি রান্নাঘরে থাকিতে হইত। মণিরাম রান্নাঘরে একা থাকিতে ভাল বাসিতেন না, কাজেই যাই দেখিতেন সকলে তাঁহাকে ফেলিয়া চলিয়া গেল, অমনি সুর চড়াইয়া, গলা কাঁপাইয়া বলিতেন "রান্নাঘরে কেও ?—একাকিনী !"

বাড়ীতে যখন লোক জন আসিত তখন মণিরামের জাঁক দেখে কে ! মণিরাম তখন মাথা উঁচু করিয়া, ঝুটি বাঁকাইয়া বলিয়া উঠিত "হা ! হা ! কর্ত্তাকে চাই ?" যাঁহারা আসিতেন তাঁহারা সকলেই মণিরামকে আদর করিতেন—মণিরাম ও তাহাই চাহিত। যদি কখনও দেখিত যে অনেক লোক আসিয়াছে কিন্তু কেহই তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিতেছে না, তাহা হইলে মণিরাম প্রথমে আস্তে, আস্তে, তার পরে একটু জোরে, তারপর আরও একটু জোরে, তার পর ভয়ানক চীৎকার করিয়া বলিত "আহা বেচারা ! আহা বেচারা" ; চীৎকার এত বেশী হইত যে এই জন্য মণিরামকে কখন কখন শাস্তি পাইতে হইয়াছে ; কিন্তু অভ্যাস কোথায় যায় ?

সে যাহা হউক দুই বৎসর পূর্ব্বে মণিরাম হিরণদের একটা মস্ত উপকার করিয়াছিল। একদিন দুপুর বেলা কর্ত্তা আফিসে গিয়াছেন, হিরণের মা কি একটু দরকারে পাড়ায় গিয়াছিলেন, হিরণ কোথায় কি তামাসা দেখিতে গিয়াছে, বাড়ীতে শুধু ঝি আর মণিরাম। এমন সময়ে এক চোর কিছু 'যোগাড়' দেখিবার আশায় চুপি চুপি রান্নাঘরে ঢুকিয়া যায় ; মণিরাম তাহা দেখিতে পাইল। অমনি সে বলিয়া উঠিল "রান্নাঘরে কেও ? একাকিনী !" বেচারা চোর ভাবিল, বুঝি কেউ দেখিতে পাইয়াছে ; তখন তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া পড়িল ; পায়ের শব্দ শুনিয়া ঝি ছুটিয়া আসিল, তখন চোর ভায়া কি করেন ? লজ্জার ভয়ে মার দৌড় ! সেদিন মণিরামের আদর দেখে কে ! সে দিন মণিরামের খাবারটা খুব ভালরকমেরই হইয়াছিল।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি মণিরাম খুব কাশিতে পারিত। এক দিন মণিরাম বাগানে বসিয়া আছে এমন সময়ে বাগানের মালী সেই খানে কাজ করিতে আসিল। বেচারা বুড়োমালীর কাশির ব্যারাম ছিল ; তাহাকে কাজ করিতে করিতে অনেক বার থামিয়া কাশিতে হইত। মালীর দু একবারের কাশির শব্দ শুনিয়াই মণিরামের মজা লাগিয়া গেল ; মণিরাম ও তখন কাশিতে আরম্ভ করিল। মালী যত কাশে মণিরাম ও তত কাশে, মালী ভাবিল বুঝি কেহ ঠাট্টা করিতেছে। কিন্তু যখন দেখিল যে সে মণিরাম, অমনি রাগিয়া দাঁত কিড়িমিড়ি করিয়া, হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল "উঁঃ গা—ধা ! যদি সত্যি সত্যি কাশ হ'ত তবে টের পেতে।"

এমন আমুদে পাখীকে কে না ভাল বাসে ? কিন্তু এই আমোদ আর অধিক দিন রহিল না। এক দিন খাঁচার মধ্যে মণিরামের মাথা ঢলিয়া পড়িল—মণিরামের ভয়ানক অসুখ হইয়াছিল। এই অসুখের মধ্যে ও হিরণের সাধের পাখী দুবার তিন বার "আহা বেচারা !" "আহা বেচারা !" বলিবার চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু তাহার ঠোঁটের কথা ঠোঁটেই রহিয়া গেল। কর্ত্তা কতবার তাহাকে কথা কহাইবার চেষ্টা করিলেন, কত ঔষধ পত্র করিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। ৫৬ বৎসর বয়সে মণিরাম মরিয়া গেল। হিরণ্ময়ী কাঁদিয়া

কাঁদিয়া চোখ্ ফুলাইয়া শেষে মুখ ভার করিয়া বসিল। কর্ত্তা, গৃহিণী এবং বাড়ীর সকলেরই দুঃখ হইল। যাহাকে ভালবাসা যায় সে চলিয়া গেলে কাহার না মনে কষ্ট হয়?

---

## প্রকৃতির শোভা।

১

আকাশে উঠেছে তারা
বাগানে ফুটেছে ফুল।
থোকা থোকা ফল ঝোলে
ডালে ডাকে পাখীকুল॥

২

নিশি করে ঝক্ মক্
নদী করে কুল কুল!
পুরাণ পুকুর পারে
ফুটেছে বকুল ফুল॥

৩

মাঠেতে করেছে শোভা
থোকা থোকা পাকাধান।
প্রহরী চাষার ছেলে
মনে সুখে করে গান॥

৪

সপ সপ বায়ু বয়
পাতা করে মর্ মর্।
ঝন্ ঝন্ ধান বাজে
হেলে দুলে নাচে খড়।

৫

আকাশে উঠিয়ে চাঁদ
আলোক করিছে দান।
পুলকেতে পৃথিবীর
হাসি হাসি মুখ খান॥

৬

আধঘুমে জেগে উঠে
চাষার কোলের ছেলে
মধুমাখা আধ বোলে
ডাকিতেছে মা মা বলে॥

৭

ঘন ঘন পেঁচা ডাকে
ভয়ে কাঁপে পাখীগণ।
বালক বালিকা বুড়ো
ঘুমে সব অচেতন॥

৮

কালি হবে বাকি পড়া
আজি পড়া রেখে দাও।
হয়েছে অনেক রাতি
বই রেখে ঘুম যাও॥

---

## সুরেন্দ্র বাবুর কারাবাস।

"সখার" পাঠকেরা বোধ হয় প্রায় সকলেই বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভাল করিয়া জানেন। সুরেন্দ্র বাবু কলিকাতার ছেলেদের দেবতা। তিনি কলিকাতার যুবকদলের মনে একটী নূতন ভাব আনিয়া দিয়াছেন। দশ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহাদের আপনার যে একটা দেশ আছে, ইহা ভাল করিয়া বাঙ্গালী যুবকেরা জানিতেন না। মাতৃভূমির ঠিক অর্থ তাঁহারা বুঝিতে পারিতেন না। সুরেন্দ্র বাবুর বক্তৃতা করিবার ক্ষমতা অসাধারণ; এবং এই ক্ষমতাগুণে তিনি বাঙ্গালীর প্রাণে স্বদেশ ও স্বজাতির জন্য ভালবাসা জন্মাইয়া দিয়াছেন। ইংরাজেরা আমাদের দেশ শাসন করেন; আমাদের আইন কানুন তাঁহারাই প্রস্তুত করেন; আমাদের নিকট হইতে টাকা আদায় করিয়া আমাদের টাকা তাঁহারাই আপনাদিগের ইচ্ছামত ব্যয় বা অপব্যয় করেন, আমাদিগের তাহাতে কোন হাত নাই। ইহাতে অনেক সময় দেশের ঘোর অনিষ্ট হয়। ভাল কাজে যে টাকার প্রয়োজন অনেক সময় মন্দ কাজে সে টাকা খরচ হয়। তার পর আমরা নিজেরা নিজেদের আইন কানুন তৈয়ার করিতে পারি না বলিয়াও অনেক সময় বিশেষ অনিষ্ট হয়। ইংরাজেরা বিদেশী লোক, ভিন্ন ভাষায় কথা বলেন, তাঁহাদের ধর্ম্ম স্বতন্ত্র ও আমরা যে ভাবে খাই, থাকি তাঁহারা সে ভাবে খান, থাকেন না। কাজে কাজেই আমাদিগের যে কি দরকারী ও কি দরকারী নহে, ইহাঁরা সহজে তাহা বুঝিতে পারেন না। সুতরাং আমাদের দরকার মত আইন কানুনও সব সময় তৈয়ার হয় না। তার পর দেশের বড় বড় কাজ যত—যাহাতে অধিক চিন্তা, অধিক বিদ্যাবুদ্ধির প্রয়োজন ও যাহাতে বেশী মাহিয়ানা পাওয়া যায়, তাহাও সবই প্রায় তাঁহাদের দখলে। ইংরাজেরা আমাদের দেশের উপকার করিয়াছেন; তাঁহারা দেশে আছেন বলিয়া এখনও আমাদের অনেক উপকার হইতেছে; কিন্তু ক্রমে ক্রমে আমাদের যতই চোখ্ ফুটিতেছে, যতই আমরা জ্ঞান ও শিক্ষা পাইতেছি ততই সমস্ত কাজ চালাবার ভার আমাদিগের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া উচিত। এই সকল ভাব দেশের যুবকগণের ও জনসাধারণের মনে প্রধানতঃ সুরেন্দ্র বাবুই গাঁথিয়া দিয়াছেন। দশ বৎসর পূর্ব্বে আমরা এ কথা ভাবিতাম না; দশ বৎসর পূর্ব্বে দেশের শাসন-কার্য্য যাহাতে ভাল হয়, অপর অপর জাতির মত যাহাতে আমরাও আমাদের নিজেদের হাতে আমাদের স্বদেশের শাসনভার পাইতে পারি, এবিষয়ে লোকের মনোযোগ প্রায় ছিল না বলিলেও হয়। সুরেন্দ্র বাবু বক্তৃতা করিয়া ও কাগজে লিখিয়া আমাদের এই কর্ত্তব্যভাব সজাগ করিয়াছেন। বিগত আট নয় বৎসর কাল তিনি প্রাণপণে আমাদের জন্য, তাঁহার স্বদেশের উপকারের জন্য অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন। তিনি আমাদের পরম বন্ধু; তিনি সমস্ত ভারতবর্ষের পরম হিতৈষী। মাতৃভূমির দুঃখ ক্লেশ দেখিয়া তাঁহার প্রাণ সর্ব্বদা কাঁদে, ও দেশের নরনারীর ঘোর দুর্দ্দশা দেখিয়া তিনি সর্ব্বদা হৃদয়ে অত্যন্ত আঘাত পান। ধন্য সেই ব্যক্তি যে আপনার মাতৃভূমির ও আপনার স্বজাতির দুঃখ দুর্দ্দশা দেখিয়া প্রাণে ভয়ানক ক্লেশ পায়। দেশের জন্য যে এক ফোঁটা চোখের জল ফেলে, সে পুণ্যবান। তাহার এই সামান্য এক এক ফোঁটা চোখের জল স্বর্গে ভগবানের নিকটে মুক্তাফলের মত শোভা পাইয়া থাকে!

বেঙ্গালী নামক একখানি অতি সুন্দর ইংরাজি সাপ্তাহিক পত্র আছে। সুরেন্দ্র বাবু এই পত্রের সম্পাদক। কিছু দিন হইল ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়ান নামক আর একখানি ইংরাজি সাপ্তাহিক পত্রে হাইকোর্টের জজ নরিস সাহেবের নামে কয়েকটী কথা লেখা হয়। নরিস সাহেব আজ প্রায় নয় মাস হইল এ দেশে আসিয়াছেন। প্রথমে লোকে তাঁহার একটী ভাল কাজ দেখিয়া বড়ই সুখী হয়। চৌরঙ্গীর রাস্তায় তিনি এক দিন গাড়ীতে যাইতেছিলেন; এমন সময়ে আর এক জন সাহেবের গাড়ীর ধাক্কা লাগিয়া একটী বৃদ্ধা মেয়েমানুষ আহত হয়; সাহেব তাহার দিকে একবারও ফিরিয়া চাহিলেন না; সাঁ সাঁ করিয়া গাড়ী হাঁকাইয়া চলিলেন; নরিস সাহেবের প্রাণে আঘাত লাগিল। নিষ্ঠুর-হৃদয় সাহেবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ জোরে গাড়ী চালাইয়া তাঁহাকে ধরিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়, এই হতভাগ্য স্ত্রীলোকটীকে হাঁসপাতালে পাঠাইয়া দেওয়া কি আপনার উচিত নয়?" নিষ্ঠুর সাহেব বলিয়া উঠিল,—"এদেশের সাহেবদের গাড়ীর চাপে কোনও দেশীয় লোক পড়িলে, তাহাকে হাঁসপাতালে পাঠাইবার নিয়ম নাই।"—উচ্চমনা নরিস এই কথা শুনিয়া অবাক্ হইলেন। নিজে গাড়ী করিয়া বৃদ্ধাকে হাঁসপাতালে পাঠাইয়া দিলেন। এ সংবাদ শুনিয়া দেশশুদ্ধ লোক আহ্লাদে আটখানা হইয়া পড়িল। কিন্তু এ দেশে আসিয়া সাহেবেরা অনেক দিন ভাল থাকিতে পারেন না। নরিসেরও স্বভাব উল্টাইতে লাগিল। তিনি দেশীয়দিগের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিতে লাগিলেন; এবং সময়ে সময়ে তাহাদিগের উপর অপমান অত্যাচারও করিতে আরম্ভ করিলেন। "ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়ান" পত্রে তাঁহার অনেকগুলি নিন্দার কথা বাহির হইল। সুরেন্দ্র বাবু তাঁহার বেঙ্গালী পত্রে ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়ানের লিখিত একটী প্রবন্ধ তুলিয়া দেন। "ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়ান" লিখিয়াছেন যে নরিস সাহেব জোর করিয়া হিন্দুদের দেবতা শালগ্রাম ঠাকুরকে খোলা কাচারিতে আনিয়াছেন। সুরেন্দ্র বাবু এই কথা উপলক্ষ করিয়া নরিস সাহেব হাইকোর্টের জজিয়তির উপযুক্ত নন, এ কথা বলেন। বহুদিন হইল বিলাতে জেফ্রিজ নামে অতিশয় অধার্ম্মিক ও অত্যাচারী এক জন বিচারক ছিলেন; সুরেন্দ্র বাবু এই প্রবন্ধে নরিস সাহেবের অত্যাচার, অবিচারের কথা বলিবার সময় এই জেফ্রিজ ও তাঁহারই মতন অত্যন্ত অধর্ম্মপরায়ণ স্কগ্স্ নামে অন্য এক জন জজের নাম করেন। "ইংলিশম্যান" নামে ইংরাজদের একখানা খবরের

কাগজ আছে। এই খবরের কাগজ চিরকালটা বাঙ্গালীদের সঙ্গে শত্রুতা করিয়া কাটাইয়াছে। সুরেন্দ্র বাবুর উপরি উক্ত লেখাটী নকল করিয়া "ইংলিশম্যান" পত্র লেখেন যে এতদ্দ্বারা হাইকোর্টের অপমান করা হইয়াছে। জজ নরিসের ইংলিশম্যানের কথা পড়িয়া মনে হইল,—"তাইত!" আর অমনি তিনি বেঙ্গালী পত্রের সম্পাদক সুরেন্দ্র বাবু ও ঐ পত্রের ছাপাওয়ালা বাবু রামকুমার দের উপর সমন অর্থাৎ আদালতে আসিবার হুকুম জারি করিলেন। সুরেন্দ্র বাবু সমন পাইয়াই, হাইকোর্টে আসেন, এবং তথায় জানিতে পান যে ব্রাহ্মপাবলিক ওপিনিয়ান শালগ্রাম সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা সত্য নহে। অর্থাৎ জজ নরিস জোর করিয়া শালগ্রাম আনেন নাই। কিন্তু উভয় পক্ষের সম্মতি লইয়া তাঁহাদের ইচ্ছামতেই তিনি হিন্দুদের একজন দেবতাকে হাইকোর্টের বারান্দায় আনিয়া উপস্থিত করেন। পর দিন প্রধান বিচারপতি গার্থ সাহেব, নরিস সাহেব ও অপর দুইজন ইংরাজ জজ ও আমাদের দেশের রত্ন জজ রমেশচন্দ্র মিত্রকে লইয়া সুরেন্দ্র বাবুর বিচার করিতে বসেন। সুরেন্দ্র বাবুকে লোকে এত ভাল বাসে, ও এই বিচার কিরূপ হইবে সে বিষয়ে লোকের এত উৎকণ্ঠা হইয়াছিল যে বিচারের দিন হাইকোর্টের গার্থ সাহেবের এজলাসে, বারান্দায়, উঠানে পর্য্যন্ত তিল ফেলিবার স্থান ছিল না। কেবল হাইকোর্টের প্রকাণ্ড বাড়িটী যে লোকে পরিপূর্ণ হইয়াছিল তাহা নহে; বাহিরের রাস্তায়, ও পাশের মাঠে পর্য্যন্ত হাজার হাজার লোক জড় হইয়াছিল।

কোনও বিষয়ে ভুল হইয়াছে জানিতে পারিলে তাহা অবিলম্বে স্বীকার করা ও তৎক্ষণাৎ তাহা শোধরাইবার চেষ্টা করা উচিত। ইহাতে সত্যপ্রিয়তা প্রকাশ পায়; ইহাদ্বারা চরিত্রের মাহাত্ম্য প্রমাণ হয়। যথার্থ বীরত্বের লক্ষণই এই। সুরেন্দ্র বাবু ব্রাহ্মপাবলিক ওপিনিয়নের যে কথা সত্য বলিয়া লইয়াছিলেন, তাহা ঠিক সত্য নহে জানিতে পারিয়া, আপনার ভুল স্বীকার করিলেন। এবং ভুল-বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া জজ নরিসের প্রতি যে কটু কথা ব্যবহার করিয়াছেন তাহার জন্যও দুঃখ প্রকাশ করিলেন। কিন্তু তাঁহাকে এই রূপ ভাবে বিচার করিবার ক্ষমতা হাইকোর্টের নাই; এ কথাও সঙ্গে সঙ্গে বলিলেন। তবে ক্ষমতা আছে কি না এ বিষয় ভাল করিয়া তর্ক বিতর্ক করিতে হইলে অনেক আইন কানুন, অনেক নজির ও অনেক খাতা পত্র খুঁজিতে হইবে; সুতরাং তিনি জজদিগের নিকট কিছুকালের জন্য তাঁহার মোকদ্দমা মুলতবি অর্থাৎ থামাইয়া রাখিতে প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু তিনি যে বারিষ্টার নিযুক্ত করিয়াছিলেন তিনি সুরেন্দ্র বাবুর এই প্রার্থনায় দুকথা বলা উচিত বোধ করিলেন না। সুতরাং তিনি এ বিষয়ে বেশি কিছু বলিলেন না। জজেরা এই প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিলেন,—ও পরদিন সুরেন্দ্র বাবুকে বিনা পরিশ্রমে দুইমাস কাল প্রেসীডেন্সী জেলে (হরিণবাড়ীতে) কয়েদ থাকিতে হুকুম দিলেন।

এই কারণেই আজ আমাদের প্রিয় সুরেন্দ্র বাবু কারাগারে। "সখা" বালক বালিকাদিগের পত্র, তাঁহার আইন কানুন লইয়া বিচার করিবার প্রয়োজন নাই। সুতরাং সুরেন্দ্র বাবু অন্যায় করিয়াছেন কি না, হাইকোর্টের তাঁহাকে এই রূপ শাস্তি দিবার অধিকার আছে কি না, অথবা যে দোষে কিছুদিন পূর্ব্বে এই হাইকোর্টেই ইংরাজ টেইলর সাহেবের কেবল জরিমানা হইয়াছিল, ও ইংলিশম্যান পত্রের সম্পাদক-সাহেব ক্ষমা চাহিয়া মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন, সেই অপরাধে বাঙ্গালী সুরেন্দ্র নাথের দুইমাস কারাদণ্ড ন্যায় হইয়াছে কি অন্যায় হইয়াছে, তাহার আলোচনা আমরা করিব না। কিন্তু সুরেন্দ্র বাবু দেশের হিতৈষী, সুরেন্দ্র বাবু ছেলেদের—'সখা'র অনেক পাঠকের—শিক্ষক, তাই সুরেন্দ্র বাবুর অপমানে আমরা দুঃখিত হইয়াছি; সুরেন্দ্র বাবুর অবমাননায় সমস্ত বাঙ্গালা অবমানিত হইয়াছে, এ কথা বলিব।



কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, "আমরা সুরেন্দ্র বাবুর দুঃখে দুঃখ প্রকাশ করিতেছি।" তাঁহারা ভ্রান্ত। সুরেন্দ্র বাবুর আবার দুঃখ কি? আপনার কর্ত্তব্য কাজ করিয়া যে কষ্ট পায় তাহার কি দুঃখ? দেশের উপকার করিতে গিয়া যাঁহার কষ্ট হয়, তাঁহার জন্য আমরা কাঁদিব কেন? সুরেন্দ্র বাবু পুণ্যবান, দেশের জন্য তিনি জেলে গিয়াছেন। তাঁহার আজ আনন্দের দিন, তাঁহার আজ গৌরব করিবার সময়। আমরা তাঁহার গৌরবে আপনাদিগের গৌরব হইল মনে করিতেছি। তাঁহার শাস্তিতে এই হতভাগা জাতির কাল মুক আজ উজ্জ্বল হইল! পাঠক! পাঠিকা! তোমার হতভাগ্য মাতৃভূমির জন্য এক ফোঁটা চক্ষুজল ফেলিতে শেখ! এক দিন তোমার দ্বারাও ভারতের কারাগার পবিত্র হইবে, এক দিন তোমার নিজের ক্লেশে দেশের দুর্গতি দূর হইবে; এক দিন তোমার গৌরবেও তোমার জাতির মুখ উজ্জ্বল হইবে!

---

## ঠাকুরদাদার গল্প।

একদিন বিকালে নবীন বাবু তাঁহার ছোট ছোট দৌহিত্র, পৌত্র গুলিকে সঙ্গে করিয়া গঙ্গাতীরে বেড়াইতে গেলেন। গঙ্গার জল কেমন বায়ু বেগে নাচিতেছে, ছোট ছোট ঢেউ গুলি কেমন কল কল করিয়া তীরে আসিয়া আঘাত করিতেছে, আবার ফিরিয়া যাইতেছে। সকলেই তথায় বসিয়া শোভা দেখিতে লাগিলেন। বালক বাবুদের তাহা ভাল লাগিল না। নলিন একটী প্রজাপতিকে ধরিতে ছুটিলেন, বিনয় জলে ঢিল ফেলিয়া মজা দেখিবেন বলিয়া ঢিলের সন্ধানে চলিলেন, কিশোরী ঠাকুরদাদার জুতা লইয়া দূরে পলায়ন করিল। নবীন বাবু বিনয়কে কাছে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "আচ্ছা বল দেখি গঙ্গায় এত জল কোথা হইতে আসিল?" বিনয় বসিল, কিছু ক্ষণ ভাবিয়া বলিল "কেন, চির কালই ত আছে! আমি আর বছরে এসে ও দেখেছি গঙ্গায় ত এত জলই ছিল।" কিশোরী ও গল্প শুনিতে আসিয়া জুতা রাখিয়া বসিল, ক্রমে নলিন ও আসিয়া যুটিল—তাহারা গল্প বড় ভাল বাসে।

কিশোরী।—"আচ্ছা জল ত ক্রমাগতই চলিতেছে, এক বারও স্থির হয় না, তবে ফুরায় না কেন? এ কথাটী আজ আমাকে বুঝাইয়া দাও না।" নবীন বাবু।—"আমি ও সেই কথা জিজ্ঞাসা কচ্ছিলাম, দেখি নলিন কি বলে।" নলিন বলিল "পিসী বলিয়াছেন গঙ্গা যে ঠাকুর, ঠাকুরের বুঝি আবার জল ফুরায়?" নবীন বাবু একটু হাসিয়া বলিলেন "তবে মন দিয়া শুন। নলিনের পিসীর বাড়ীতে গঙ্গা আছে তোমরা জান। সে এই গঙ্গা, সেবার সেই যে তোমরা নৌকায় করিয়া সেখানে গিয়াছিলে।"

সকলে।—মনে আছে।

নবীন বাবু।—এখন বুঝিলে যদি কেহ ক্রমাগত উত্তর দিকে নৌকা করিয়া যায়, তবে গঙ্গার দুধারে কত গ্রাম, কত সহর, কত বন, কত পুরাতন ভাঙ্গা মন্দির, কত কত সুন্দর বাগান, কত বিস্তীর্ণ মাঠ, প্রভৃতি দেখিতে দেখিতে যায়। ক্রমিক এক গ্রাম ছাড়াইয়া অন্য গ্রামে, এক দেশ হইতে অন্য দেশে এই রূপে না থামিয়া যদি দিন রাত্রি চলে তথাপি ও এই গঙ্গা, এই রূপ স্রোত দেখিতে পায়।

বিনয়।—তবে কি গঙ্গার শেষ নাই?

কিশোরী।—তাও কিও কি কখন হয়? অবশ্য শেষ আছে।

নবীন বাবু।—শেষ আছে, আমরা কিন্তু গোড়ারদিকে দেখিতেছি, গঙ্গার উৎপত্তি কোথা?

কিশোরী—কেন? হিমালয় পর্ব্বতে, আমারা ত পড়িয়াছি?

নবীঃ—ঠিক বলিয়াছ, কিন্তু উহা যে কি রূপ পদার্থ তাহা বোধ হয় জাননা। এই রূপে অনবরত চলিতে চলিতে ক্রমে প্রায় ৫০০ পাঁচ শত ক্রোশ দূরে হরিদ্বার নামে একটী স্থান আছে।

নলিন—হাঁ হাঁ আমি জানি—মা বলেন 'হরিদ্বার গঙ্গাসাগর' তাই?

নবীঃ—হাঁ। সেই হরিদ্বারের নিকট গঙ্গা অতিশয় কম চওড়া। তারও পরে আরও সরু। তার পরে সেই হিমালয় পর্ব্বতের গা বহিয়া ঝির্ ঝির্ করিয়া পড়ে, তাহার নাম প্রস্রবণ বা ঝরণা। এখন বুঝিলে যে সেই ঝরণার জল ক্রমে একত্র হইয়া গঙ্গা হইয়াছে। এ জন্য হরিদ্বার এত সরু। ক্রমে যত নীচে আসে, অন্য অন্য সব ঝরণার জল ও সেই রূপে আসিয়া ইহার সঙ্গে মিশে; অন্য অন্য ছোট ছোট নদী আবার ইহাতে পড়ে, তাদের উপনদী বলে।

কিশোঃ—হাঁ, আমি জানি, যেমন যমুনা, শোণ, গণ্ডকী, বাঘমতী, কুশী। না দাদা?

নবীঃ—হাঁ ঠিক বলিয়াছ। এই সকল উপনদীর জলও সেই প্রকার ঝরণা হইতে আসে। ক্রমে ক্রমে গঙ্গা যত নীচে আসিয়াছে ততই অনেক উপনদী আসিয়া ইহাতে মিলিয়াছে ও ততই অধিক চওড়া হইয়াছে। যে দিকটা বেশী নীচু জল সেই দিকেই চলে, এজন্য গঙ্গা ক্রমে পর্ব্বত থেকে আসিতে আসিতে নীচে চলিয়াছে। যদি স্রোতের সঙ্গে বরাবর যাওয়া যায়, তবে শেষে এমন একটা স্থানে উপস্থিত হইব, যেখান হইতে কোন দিকেই কূল কিনারা দেখা যায় না চারিদিকেই অকূল জল ধূ ধূ করিতেছে, বড় বড় ঢেউ সকল উচু হইয়া উঠিতেছে, পড়িতেছে, জল মুখে দিবার যো নাই, বিকট লোণা।

কিশোঃ—সেই বুঝি সমুদ্র?

নবীন—হাঁ তার নাম গঙ্গাসাগর। এই খানে গঙ্গা বঙ্গ উপসাগরে পড়িয়াছে। এইখানে গঙ্গা ও সাগরে মিশিয়াছে বলিয়া ইহার নাম গঙ্গা সাগর। এই স্থানেই গঙ্গার যত জল সব হুহু শব্দে পড়িতেছে। চিরকালই গঙ্গার জল এই ৫০০ ক্রোশ পথ চলিয়া আসিয়া এখানে আসিয়া পড়ে। তুমি যদি আজ এখানে একটী বস্তু জলে ভাসাইয়া দাও, তবে উহা ভাসিতে ভাসিতে সেই গঙ্গাসাগরে গিয়া পড়িবে।

বিনঃ—দেখ দাদা, আমাদের খিড়কীর পুকুরের মোন দিয়া সেদিন বৃষ্টির পর যে জল চলেছিল তাতেও ঠিক এমনি মজা করেছিলাম। আমি একটা কচুরপাতা ছিঁড়িয়া দিলাম, পাতাটা ভাসিতে ভাসিতে পুকুরে পড়িল—সেখানে জল হুড় মুড় করিয়া পড়িতেছিল। কিন্তু তার পর দিন সকালে গিয়া আর খানায় জল দেখিতে পাইলাম না, বড় দুঃখ হল কিন্তু।

নবীঃ—ঠিক এও সেইরূপ; গঙ্গা মনে কর সেই রূপ একটা খুব বড় খানা, আর সাগর একটা প্রকাণ্ড পুকুর। গঙ্গার সব জলই সাগরে গিয়া পড়ে। কিন্তু তথাপি গঙ্গার জল ফুরায় না; কেন বলিব? বর্ষাকালে যে বৃষ্টি হয়, সে সমস্ত জল কোথা যায়? তার কতক পুকুরে ও অন্যান্য জলাশয়ে পড়ে, কতক বড় বড় খাল দিয়া গঙ্গায় পড়ে, কতক মাটিতে শুষিয়া যায়। এইরূপে বৃষ্টির জলের অধিকাংশ গঙ্গা ও পরে গিয়া সমুদ্রে পড়ে। এখন দেখিলে গঙ্গার জল কোথা কোথা হইতে আসে, সর্ব্ব প্রথমে হিমালয় পর্ব্বতের ঝরণাগুলি হইতে, পরে উপনদী হইতে, ও বৃষ্টির জল হইতে।

নলিন—ঝরণার জল কোথা থেকে আসে?



নবীঃ—বলিতেছি শুন। ঐ পর্ব্বত প্রায় ৫০০।৬০০ ক্রোশ পর্য্যন্ত আমাদের দেশের উত্তর দিক ব্যাপিয়া আছে। আর উহা পৃথিবীর অন্য সকল পর্ব্বত অপেক্ষা উচ্চ—এমন কি প্রায় ১০০০টী নারিকেল গাছ উপরি উপরি রাখিলে যত উচ্চ হয় তত। আর একটী নিয়ম আছে জান যে যত উপরে উঠা যায় ততই শীত অধিক। ভবে মনে কর, পর্ব্বতের উপরে কত শীতল। ভয়ানক শীত, এত শীত যে সেখানে জল জমিয়া বরফ হইয়া যায়। এখন দেখ গ্রীষ্ম কালে দক্ষিণ দিক হইতে ক্রমাগত বায়ু বহে, সেই বায়ু গিয়া হিমালয় পর্ব্বতে ধাক্কা লাগে। আমাদের দেশের দক্ষিণ দিকে, ভারত মহাসাগর, এই মহাসমুদ্র হইতে গ্রীষ্মের প্রচণ্ড উত্তাপে জল বাষ্প হইয়া উঠে, ঐ সকল সূক্ষ্ম জল কণাকে মেঘ বলে, ঐ মেঘ বায়ু অপেক্ষা হাল্কা এজন্য উহা বায়ুতে ভাসিতে থাকে। সুতরাং যখন বায়ু স্থির ভাবে থাকে তখন মেঘ ও নিশ্চল হইয়া থাকে, আর যখন বায়ু কোন দিকে বহে, তখন বায়ুতে ভাসিতে ভাসিতে মেঘরাশি ও সেই দিকে চলে; বুঝিতে পারিতেছ না?

নলিন—দাদা! মেঘেরাত শালপাতা খাইবার জন্য চলে? কেশব বলেছিল!

কিশোঃ—না না, সে বকল্ কথা শুনিও না। কেন আমরাত প্রথম সংখ্যার 'সখা'তে পড়িয়াছি "মেঘ সূক্ষ্ম জলকণা বৈ আর কিছুই নহে।"

নবীঃ—সত্যইত! তোমার বুঝি 'সখা' মন দিয়া পড়না? এখন শোন। গ্রীষ্মকালে দক্ষিণ-সাগর হইতে রাশি রাশি মেঘ বায়ুবেগে উত্তরদিকে চালিত হইয়া অবশেষে ঐ হিমালয় পর্ব্বতের গায়ে গিয়া ঠেকিয়া যায়, কেন না মেঘেরা অধিক উচ্চ দিয়া যায় না,—প্রায় আধ ক্রোশ, এক ক্রোশ বা দুই ক্রোশ উপর দিয়া যায়, কিন্তু হিমালয় প্রায় ২৷৷০ আড়াই ক্রোশ উচ্চ। সুতরাং ঐ সমস্ত মেঘ গিয়া ভয়ানক শীতল পর্ব্বত-শৃঙ্গে আটকায় ও প্রচণ্ড শীতে জমিয়া তৎক্ষণাৎ বরফ হইয়া যায়। এই কারণে অতি উচ্চ পর্ব্বতের চূড়াগুলি সুন্দর শুভ্রবর্ণে শোভিত, চিরকালই ধপ্ ধপ্ করে। ভাল; এই বরফ-রাশি ক্রমেই স্তূপাকার হইয়া পর্ব্বতের চূড়া ঢাকিয়া ফেলে। দিবাভাগে রৌদ্রে কতক গলিয়া যায়, কিন্তু সে এত অল্প যে তাহাতে ঐ স্তূপের কিছুই হ্রাস হয় না। আবার নূতন বরফ জমিয়া যায়। গ্রীষ্মকালে এই বরফ অনেক অধিক গলে ও পর্ব্বতের গা বহিয়া পড়ে—ইহাই নির্ঝর। আর এক প্রকারে নির্ঝরের উৎপত্তি হয়। যে সকল মেঘ কিছু নীচে গিয়া লাগে, যেখানে শীত কিছু অল্প, তাহারা তত জমিতে পায় না, বৃষ্টি হইয়া পড়ে। এ বৃষ্টিও বড় কম নয়, খুব বৃষ্টি হয়, সেই বৃষ্টির জল অল্পে অল্পে পর্ব্বতের গা বহিয়া পড়িতে থাকে, ক্রমে ২।৫ টী স্রোত একত্র হইয়া একটী নির্ঝর হয়। কিন্তু এ ঝরণাগুলি কেবল বর্ষাকালেই দেখা দেয়, তদ্ভিন্ন বরফজাত যে গুলি সেগুলি বারমাস থাকে, কিন্তু গ্রীষ্মকালে তাহাদের বলবৃদ্ধি হয়।

এখন বুঝিতে পারিতেছ, এই যে গঙ্গার জল হুড় হুড় কুল কুল করিয়া সতেজে চলিতেছে, কোথায়?—সমুদ্রে। আবার গ্রীষ্মকালে এই জলরাশি বাষ্পরূপে আকাশে উঠিবে, বায়ু অমনি পাল্কীবেহারা হইয়া ইহাদিগকে হিমালয় পর্ব্বতে লইয়া যাইবে, ইহারা যাইয়া কতক বৃষ্টি হইয়া নূতন ঝরণা প্রস্তুত করিবে, কতক জমিয়া বরফ কণা হইবে, ও ধীরে ধীরে রৌদ্রতাপে গলিয়া গিয়া পর্ব্বত বহিয়া নীচে নামিবে। সুতরাং নির্ঝর দুই প্রকার—বর্ষাকালীন ও চিরস্থায়ী। প্রথম গুলি বৃষ্টির জলে জন্মে, দ্বিতীয় গুলি অনবরত বরফ গলিয়া জন্মে। এই দুই প্রকার নির্ঝরই নদীর জলের মূল। সুতরাং দেখা যায়, যে সকল নদীর জল প্রথম প্রকার নির্ঝরের উপর নির্ভর করে তাহারা কেবল বর্ষাকাল ভিন্ন অন্য সময়ে শুকাইয়া যায়।

কিশোঃ—দাদা আমি কাকার সঙ্গে পাটনা যাবার সময়ে রেলের নীচে সে বার কত নদী দেখেছিলাম; তাতে জল নাই, কেবল সব বালি পড়িয়া আছে, কিন্তু তাহারা গঙ্গার অপেক্ষা ছোট।

নবীঃ—হাঁ সে সকল নদী প্রায়ই ছোট হয়। আর যে সকল নদীর জল দ্বিতীয় প্রকার প্রস্রবণের উপর নির্ভর করে তাহাদের বার মাস জল থাকে, তবে বর্ষাকালে তাহাদের জল বাড়ে (যেমন গঙ্গার) আবার শীতকালে কমিয়া যায়। কেন না বর্ষাকালে অনেক অধিক বরফ গলে ও অনেক জল দেশগুলির উপর দিয়া আসিয়া নদীতে পড়ে। সুতরাং তখন জল বাড়ে। শীতকালে কেবল বরফের উপর নির্ভর, তাও আবার কম গলে; সুতরাং জল কমিয়া যায়; কিন্তু একেবারে শুষ্ক হয় না কেন না তখনও বরফ গলে, এবং আর একটী কারণ আছে। সেটী এই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি বৃষ্টির যে জল মাটীতে পড়ে তাহার কিছু পৃথিবীর মধ্যে প্রবেশ করে। সে জলটা কোথা যায়? তোমরা আশ্চর্য্য হইবে, সে সমস্ত জলই প্রায় আবার নদীতে আসিয়া পড়ে। জলের একটী গুণ এই যে তাহা নীচু দেখিলেই সেই দিকে ছোটে। সূক্ষ্ম বৃষ্টির কণাগুলি মৃত্তিকার সূক্ষ্ম ছিদ্রমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, সেখানে অলস বালকের ন্যায় ঘুমায়না—ক্রমাগত নিজের কর্ত্তব্য কর্ম্মে নিযুক্ত থাকে। নিকটে যদি কোন নদী থাকে তবে সত্বরেই তাহার গর্ভে প্রবেশ করে, নতুবা কিছু বিলম্বে ক্রমে ক্রমে আসিয়া অবশেষে পড়িবেই পড়িবে। কেন না মৃত্তিকার নিম্নে কিছু দূর খনন করিলে হয়ত এমন একটা স্থানে পৌছান যাইবে যে তাহার ভিতরে জল আর তেমন প্রবেশ করিতে পারেনা, সুতরাং সম্মুখে বাধা পাইয়া পার্শ্বদিকে গড়াইয়া যায় এবং অবশেষে নদীতে আসিয়া পড়ে। এই কারণে বৃষ্টিপতনের অনেককাল পরেও ঐ জলের কিয়দংশ মৃত্তিকার মধ্য দিয়া নদীতে উপস্থিত হয়; এই জন্যই গঙ্গাতে বর্ষার অনেক পরেও জল থাকে। কি শীত, কি বর্ষা, কি গ্রীষ্ম, সকল ঋতুতেই গঙ্গার জল দেখা যায়; তবে পূর্ব্বোক্ত কারণে বর্ষাকালে জল অধিক বৃদ্ধি পায়। এখন বেশ বুঝিতে পারিয়াছ বোধ হয় যে গঙ্গার জল কোথা হইতে আসে ও অনবরত চলিয়া ও ফুরায়না কেন?

নলিন—হাঁ দাদা, বেশ বুঝিয়াছি, আর আমি পিসীমার মিছা কথায় ভুলিব না। এখন অবধি আমার যে সন্দেহ হবে, আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিব।

বিনয়।—আজ বিকালে বেড়াইতে আসিয়া কেমন নূতন কথা সকল শিখিলাম, রোজ আসিব। আরও সকলকে ডাকিয়া আনিব।

কিশোঃ—সব বুঝিয়াছি, কিন্তু দাদা, তুমি যে বলিলে যত উপরে উঠা যায়, ততই শীত অধিক, এটী আমি বুঝিলাম না। উপরে আরও গ্রীষ্ম অধিক হওয়াই সম্ভব, কেননা সূর্য্যের যত নিকটে যাওয়া যায়, ততই উত্তাপ অধিক হওয়াই সম্ভব। তবে উপরে শীত এত অধিক কেন? এ বড় আশ্চর্য্য কথা, আমাকে বলিতে হইবে।

নবীঃ—আজ বড় রাত্রি হইয়া পড়িয়াছে, আর এক দিন বলিয়া দিব। আজ চল বাড়ী যাই, আজ যে নূতন বিষয় শেখা হইল তাহার জন্য পরমেশ্বরকে সকলে ধন্যবাদ দাও।

সে দিন সকলে বাটী গেলেন।

## পত্রপ্রেরকের প্রতি।

অনেকে আপনাদের ইংরাজী বিদ্যা দেখাইবার জন্য আমাদিগকে Professor of Sakha, Secretary of Sakha, ইত্যাদি নূতন নামে পত্র লিখিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের প্রতি নিবেদন এই যে তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক Editor কিংবা Manager, Sakha এই নামেই পত্র লিখিবেন; বাঙ্গালায় "সখা সম্পাদক" বা "সখা কার্য্যাধ্যক্ষ" বলিয়া পত্র লিখিলে আমরা আরও সুখী হই।

# বালিকাদিগের বিশেষ পৃষ্ঠা।

## পোষাক।

বালিকাদিগের কিরূপ পোষাক হওয়া উচিত এই বিষয়ে আমাদিগকে কেহ কেহ 'সখা'য় লিখিতে বলিয়াছেন। আমরা আজ এই সম্বন্ধে আমাদের যাহা বলিবার আছে, তাহা বলিব।

অনেক স্থানে দেখিয়াছি মেয়েরা এমন পোষাক পরেন যে সমস্ত শরীর দেখা যায়, কিন্তু তবুও তাঁহাদের লজ্জা হয় না, কেননা এইরূপ সরু কাপড়ের দাম অনেক, এবং কাজেই এই সকল কাপড় পরিয়া নিমন্ত্রণে যাওয়া উচিত! পাতলা কাপড় পরিলে যে ভদ্রসমাজে লোকে লজ্জায় মুখ ফিরায় তাহা এই সকল মেয়েদের মনে থাকে না। তাঁহাদিগকে এই কথা বলিলে, তাঁহারা মুখে হাত দিয়া বলেন "ওমা! পোষাকী কাপড় পরিব, তার আবার লজ্জা কি!" আমরা এরূপ কথার উত্তর দিতে পারি না। আমাদিগের বিবেচনায়, পোষাকী কাপড় পাতলা হইলে, তাহা শক্ত করিয়া তুফের দিয়া পরা উচিত, এবং পরিবার কাপড় পাতলাই হউক আর পুরুই হউক, দশজনের নিকট যাইতে হইলে সর্ব্বদা একটী জামা গায়ে থাকা উচিত। যদি সুবিধা হয় তাহাহইলে হাটুর নীচে পর্য্যন্ত লম্বা, এবং হাতকাটা (কুনই পর্য্যন্ত) একটা জামা পরিয়া তাহার উপরে কাপড় পরিলে বড়ই ভাল হয়। আজকালকার কোন কোন মেয়ে সুশিক্ষিত বাপ বা ভাইয়ের যত্নে ভদ্র পোষাক পরিতে পান, কিন্তু আমাদের অধিকাংশ মেয়ে যেরূপ পোষাক পরেন, তাহাতে নিজের বাড়ীর লোকেরই সুমুখে যাওয়া কষ্ট, ঘরের বাহিরে, নিমন্ত্রণে যাওয়াত দূরের কথা। আজকাল যত লেখা পড়ার চর্চ্চা বাড়িতেছে, ততই মেয়েদের এ দিকে দৃষ্টি পড়িতেছে কিন্তু আমাদের ঘরের অধিক-বয়স্কা গৃহিণীরা আজিও জামা গায়ে দেওয়ার উপরে বিলক্ষণ বিরক্ত। আমি একটী সুশিক্ষিত লোকের স্ত্রীর কথা জানি, তিনি বাড়ীতে গেলেই, তাঁহার শাশুড়ী তাঁহাকে বলিতেন "জামাটা খোল,—ভদ্রলোক হও দেখি—কি মুসলমানের না খ্রীষ্টানের মেয়ের মত একটা জামা গায়ে!" এইরূপ বলিয়া অনেক সময় জামা খোলাইয়া তবে তিনি ছাড়িতেন। যাঁহাদের এরূপ মত যে গায়ে জামা না থাকিলেই ভদ্র, এবং থাকিলেই ভয়ানক অভদ্র হইতে হয়, তাঁহাদিগকে আমরা আর কি বলিব? তবে আমরা সহজ বুদ্ধিতে এই বুঝি যে মেয়েদের সমস্ত শরীর ঢাকিয়া পুরুষের নিকট বাহির হওয়া উচিত, কোন ক্রমেই খোলাগায়ে বাহির হওয়া উচিত নয়। কেহ কেহ বলেন "জামা গায়ে দিলে কাজ কর্ম্ম করিবে কেমন করিয়া?" তাহার উত্তরে এই বলিলেই হইবে যে যেরূপ হাতকাটা জামার কথা বলিয়াছি, তাহাতে কাজের কিছুই ক্ষতি হইতে পারে না। এইতো গেল লজ্জা-বারণের কথা। তাহার পর এইরূপ জামা থাকিলে শীতের সময় বেচারা মেয়েদের কত সুবিধা, কর্ত্তাদের একথা ভাবিয়া দেখা উচিত। ভাবিয়া দেখিলে, পূর্ব্বে যেরূপ জামার কথা বলিয়াছি সেইরূপ একটী জামা থাকিলে সবদিকেই ভাল হয়। এস্থলে গয়নার কথাও কিছু লেখা উচিত। আমাদের বিবেচনায় গয়নার ঘটা না করাই ভাল;—পোষাক যত 'সাদাসিধে' হয়, ততই ভাল। যাঁহাদের যথেষ্ট গয়না আছে, তাঁহারা এইরূপ গয়না পরিলেই চলিতে পারে, যথা:—কাণে দুল্ বা ইয়ারিং, কি মাকুড়ি; হাতে বালা, চুড়ি, কি শাঁখা; এবং গলায় চিক্ কি হার। আর অধিক গয়নার ঝম্ ঝম্, ঝমর্ ঝমর্ করার কোন প্রয়োজন আমরা দেখিনা; তবে অন্য কাহারও যদি অন্যমত হয়, তবে নাচার।

## ধাঁধা।

### পূর্ব্ববারের প্রশ্নগুলির উত্তর।

১। ইজের বডি বা জামা। ২। 'চালাক' এই কথাটী, হইতে 'আক' ছাড়িয়া দিলে, 'চাল' থাকে, চাল সিদ্ধ করিয়া খাইলেই ভাত খাওয়া হইল। ৩। কথাগুলি এই—রিপোট পরম, নয়শ, বাণান, হামেসা, দু(ই) নতে, রুচির। প্রথম অক্ষরগুলি এক সঙ্গে লইলে "রিপণ বাহাদুর" এবং শেষের অক্ষরগুলি এক সঙ্গে লইলে 'টমশন সাহেব' হইল। ৪।

ভাই যদু,—

তোমার পত্র পাইলাম। অখিল এবং (দীন) সে দিন (নদী)তে স্নান করিতে গিয়া বড় বিপদে পড়িয়াছিল। (নবীন) ও সঙ্গে ছিল, কিন্তু (নবীন) কোন বিপদে পড়ে নাই। তাহারা যখন যাইতেছিল, তখন আমি বলিলাম তোমরা এখন (থাক); কিন্তু আমার (কথা) না শুনিয়া, (তারা) সেই (রাতা) রাতিই (নদী)তে গেল। (দীন) একটু শুনিয়াছিল, কিন্তু অখিল কোন মতে না শুনিয়া তাহাকে টানিয়া লইয়া গেল। (না শুনা)র ফলও পাইয়াছেন; (না শুনা)র ফল এই হইয়াছে যে গিয়া যাই নাবিয়াছেন, অমনি (কতক) গুলি মাছ সেই ঘাটে ছিল, তাহারা অখিলের পায়ের (কতক) অংশ ছিঁড়িয়া লইয়াছে, এবং (দীন)কে (নদী)র মধ্যে কাদায় ফেলিয়া দিয়াছে। অখিল এখন খোড়া হয়ে পড়ে আছে। সত্বর যে আ(রাম) হবে তাহার সম্ভাবনা নাই; বলিতে কি এখন সে (মরা)র মত পড়ে থাকে। আর অধিক কি লিখিব, ইতি।

তোমার স্নেহের হেমচন্দ্র।

---

নূতন।

১। এই কথাগুলি সাজাইয়া একটি বাক্য রচনা করা দেখি; নূতন কথা বসাইতে পারিবে না এবং ইহার একটিও ছাড়িতে পারিবেনা;—

যদি, যদি, যদি, হইতে, থাকিতে, হয়, হয়, হয়, সুস্থ, প্রশংসাভাজন, প্রকৃত, সকল, প্রার্থনীয়. শারিরীক, মানসিক, বাঁচিয়া. হইয়া, করিয়া. করিও, মনুষ্যনাম, হস্ত ক্ষেপ, তবে, মনে, তাহাতে দশের, ঈশ্বরের কার্য্যকেই।

২। বলতো কোন্ জিনিশ খেতে খুব মিষ্ট, কিন্তু দেখালেই বা খেতে বল্লেই লজ্জা করে এবং কখনও কখনও রাগ হয়?

৩। ভাগ্য দোষে দিবা রাত্রি ঘুরিয়া বেড়াই,
অথচ ঘূরিতে কেহ নাহি দেখে ভাই!
কিন্তু নাহি যাই একা, যত লোকে পাই দেখা
সবারে সঙ্গেতে করি ভ্রমণেতে যাই।
মূলকথা রাজি, রাগী, কিছুই বুঝিনা,
কেবা খোঁড়া কেবা অন্ধ কিছুই জানিনা—
চির রোগী যেই জন কিম্বা মৃত, অচেতন
আমাকে ছাড়িয়া থাকে, হেন কোন জনা?
সঙ্গে করে লয়ে ঘূরি,—তাওকি জাননা!

৪। একটী লোককে তাহার বয়স জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল—"আমার ঠাকুর্দ্দাদার বয়স আমার বাবার বয়সের $\frac{৮}{৬}$; আমার বয়স বাবার বয়সের $\frac{৪}{৭}$; এক বৎসর পূর্ব্বে আমাদের তিন জনের বয়স এক সঙ্গে ৯×২০ ছিল,।" স্থির কর কাহার বয়স কত?

## সখা-সংক্রান্ত নিয়মাবলী।

১। সখার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য কলিকাতা ও মফস্বলে এক টাকা মাত্র। প্রতি খণ্ডের নগদ মূল্য /১০ মাত্র। পোষ্টাল নোট, মণি অর্ডার বা অৰ্দ্ধ আনার ডাকটিকিটে, "সখা-কার্য্যাধ্যক্ষ" এই নামে সখার মূল্যাদি পাঠাইতে হইবে। ডাকটিকিটে মূল্য পাঠাইলে প্রত্যেক টাকায় কমিশন বলিয়া /০ এক আনা পাঠাইতে হইবে।

২। পত্রিকাস্থ চিত্রের সংখ্যা কিছুই নির্দ্দিষ্ট থাকিবে না। তবে প্রত্যেক সংখ্যায় যাহাতে অন্ততঃ একখানি চিত্র থাকে আমরা সেদিকে দৃষ্টি রাখিব।

৩। বালকবালিকাদিগের রচনা উৎকৃষ্ট হইলে তাহা সাদরে গৃহীত হইবে; তবে সুদীর্ঘ হইলে তাহা প্রকাশিত হইবে না।

৪। শিক্ষক এবং অভিভাবকদিগের পরামর্শ প্রভৃতি সাদরে গৃহীত হইবে।

৫। বালকবালিকাদিগের উপকারে আসিতে পারে, কেহ এরূপ কোন রচনা বা কোন সংবাদ কিম্বা সত্য ঘটনার বিশেষ বিবরণ আমাদিগের নিকট পাঠাইলে আমরা তাহা সাদরে প্রকাশ করিব।

৬। সখা-সংক্রান্ত সমস্ত পত্রাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইতে হইবে; কেবল রচনা পরামর্শ প্রভৃতি সম্পাদকের নামে কার্য্যালয়ের ঠিকানায় পাঠান আবশ্যক।

৭। ঠিকানার পরিবর্ত্তন, নামের গোল বা কার্য্যসম্বন্ধীয় অন্য কোন অসুবিধা হইলে মোড়কের উপরে যে নম্বর দেওয়া থাকিবে সেই নম্বরের উল্লেখ করিয়া পত্র লিখিতে হইবে।

৮। ধাঁধার উত্তর, আলোচনার বিষয়, বা সখায় প্রকাশ করিবার জন্য পত্র প্রভৃতি, পূর্ব্বের মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে আমাদিগের কার্য্যালয়ে পৌঁছা আবশ্যক।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে মুদ্রিত এবং ৫০নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট, "সখা," কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

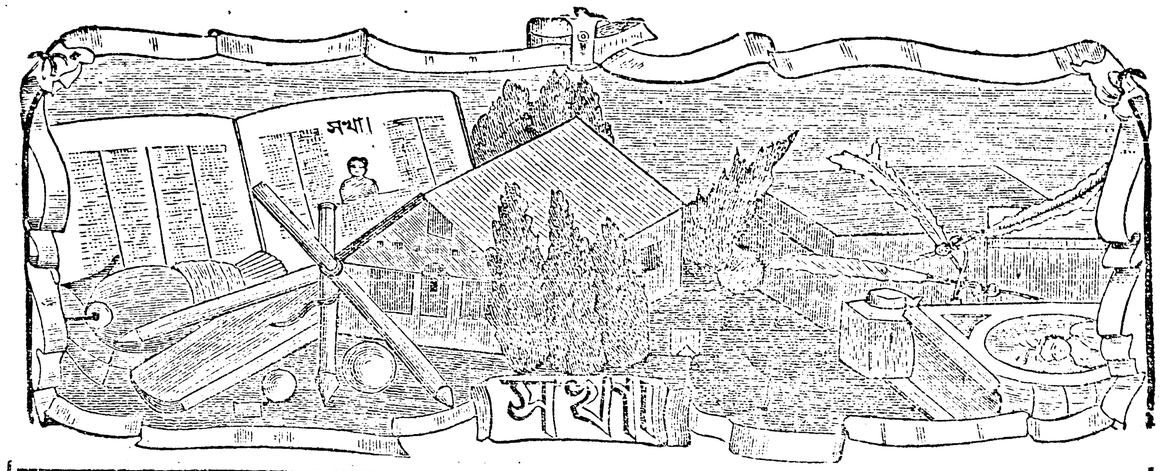




প্রথম ভাগ। জুলাই, ১৮৮৩। ৭ম সংখ্যা।

## ভীমের কপাল।

### অষ্টম অধ্যায়।

পাঠক পাঠিকা, তোমরা কি কেহ কখনও ভীমেন্দ্রের মত বিপদে পড়িয়াছ? ভীমেন্দ্র এতবার বিপদে পড়িল, কিন্তু যাঁহার বুদ্ধি আছে তিনি লক্ষ্য করুন, ঈশ্বর কতবার ভীমেন্দ্রকে বাঁচাইয়া রাখিলেন। ভীমেন্দ্র ভাবিতেছে তাহার কপাল দোষেই সে বিপদে পড়িতেছে এবং তাহার কপালগুণেই সে প্রত্যেকবারে মাথা রাখিবার স্থান পাইতেছে। আমরা বলি বিপদে পড়া তাহার অবিবেচনার ফল এবং ভীমেন্দ্র যে বিপদে আশ্রয় প্রাপ্ত হইতেছে তাহা জীবন মরণের সহায় জগদীশ্বরের কৃপা।—ভীমেন্দ্র আজিও কৃতজ্ঞ হইতে শিখে নাই; কাহারও নিকট উপকার প্রাপ্ত হইলে ভীমেন্দ্র ভাবিত তাহার নিজের কপালের জোরে সে উপকার পাইল। কিন্তু ঈশ্বর মানুষকে কত রকমে যে শিক্ষা দেন, তাহা কে বলিতে পারে? যে দুঃখী ছিল, ঈশ্বর তাহাকে দেখাইলেন, তাহার অপেক্ষাও দুঃখী পৃথিবীতে আছে, অমনি সে নিজের অবস্থায় সন্তুষ্ট ও ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞ হইল; যে ঈশ্বরের কথা, ধর্ম্মের কথা ভাবিত না, ঈশ্বর তাহার কোন ভালবাসার বন্ধুকে লইয়া গেলেন, অমনি সে ধর্ম্মের দিকে, ঈশ্বরের দিকে মন দিল; যে রোগের জালায় মৃতপ্রায় হইয়াছিল, ঈশ্বর তাহাকে শিখাইলেন—তাঁহারই উপর নির্ভর না করিলে মানুষ সুখী হইতে পারে না এবং হাত পা ছাড়িয়া ঈশ্বর যা করেন বলিয়া বসিয়া পড়িলে, সেই দুর্য্যোগেই ঈশ্বর মানুষের সহায় হন। এই জন্যই বলিতেছি মানুষের দুর্য্যোগে ঈশ্বরের সুযোগ। ভীমেন্দ্রের জীবনটী পড়িলেও তাই মনে হয়। পাঠক পাঠিকা, এ পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছেন, ঈশ্বর ভীমেন্দ্রকে কেমন করিয়া কতকগুলি বিষয় শিক্ষা দিয়াছেন,—প্রথম, সামান্য কারণে রাগ করা অনুচিত; দ্বিতীয় বিশেষ না দেখিয়া শুনিয়া কোনও কাজে হাত দেওয়া অন্যায়; তৃতীয়,—ভালবাসার লোক যত অধিক হয়, মানুষ ততই নিজের সুখ ভুলিয়া তাহাদের সুখের জন্য ব্যস্ত হয়। ভীমেন্দ্র বালক, এখনও তাহার অনেক শিখিবার ছিল—ঈশ্বরানুগ্রহে ভীমেন্দ্র সকলি শিখিয়াছিল। পাঠক পাঠিকাদিগকে সে সমস্ত বিষয়ই জানাইতেছি।

ভীমেন্দ্র হারাণ কামারের বাড়ীতে গেল। সেখানে গিয়া এক আশ্চর্য্য কাণ্ড দেখিল। কামারের বাড়ী অত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, ভীমেন্দ্র কল্পনাও করে নাই।—বাড়ীতে তিনখানা বই ঘর নাই, তাহাও অত্যন্ত বৃহৎ নহে; কিন্তু বাড়ীতে আসিলেই যেন একটু পবিত্রতার ভাব মনে হয়। উঠানটী

শাদা ধব্ ধব্ করিতেছে, তাহাতে কামার-গৃহিণীর যত্নে ঘাস জন্মিতে পারে না। ছেলে গুলি কখনও ময়লা কাপড় পরে না; কামারের স্ত্রী মধ্যে মধ্যে ক্ষার দিয়া সমস্ত কাপড় গুলি নিজ হাতে কাচিয়া থাকেন। হারাণ কামারের বাড়ীতে গেলে হারাণের মিষ্ট ব্যবহার, কামার-পত্নীর স্নেহ, ছেলেগুলির সহাস্য মুখ এবং বাটীর চারিপার্শ্বের পরিষ্কার শোভা দেখিয়া, বাস্তবিকই বোধ হয়—

"পবিত্রতা যেন বাস করেন বিরলে,
নগরের কোলাহল সহিতে না পারি।"

ভীমেন্দ্র এই কামারের বাড়ীতে গেল।—হারাণ কামার প্রাতঃকালে আরম্ভ করিয়া বেলা দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত আপনার কাজ করিতেন—তাঁহার কার্য্যে এত অধিক নিপুণতা ছিল যে তাঁহার হস্ত সর্ব্বদাই কার্য্যে পরিপূর্ণ থাকিত।—হারাণ কামার যখন বাড়ীতে আসিতেন, তখন ছেলেগুলি পিতার চুম্বন লাভের জন্য ছুটিয়া আসিত, গৃহিণী স্নানের জন্য তেল আনিয়া দিতেন, জ্যেষ্ঠ পুত্রেরা কেহ গামছা কেহ কাপড় আনিয়া দিত—বাড়ীর আদরে হারাণ প্রাতঃকালের সমস্ত পরিশ্রমের ক্লেশ ভুলিতেন—ফলতঃ হারাণের দুঃখ ছিলনা। দুঃখ ছিলনা, একি কথা বলিতেছি? এ পৃথিবীতে এমন লোক দেখিনা, যে কখনও দুঃখে পড়েনা। তবে এ কি কথা? ইহার অর্থ আছে। পাঠক পাঠিকা, জান কি, এ জগতে এমন লোকও আছেন যাঁহারা কখনও দুঃখ পান না? সেই লোকই সুখী যে জানে সুখ দুঃখ দুই ই ভগবান দিতেছেন।—সেই দুঃখী যে সুখকে ভগবানের দান আর দুঃখকে অপদেবতার দান ভাবে। সেই সুখী যে ঈশ্বরে বিশ্বাস করিয়া তাঁহারই দান ভাবিয়া দুঃখ ক্লেশ রোগ শোক অকাতরে সহ্য করে, সেই দুঃখী যে বিপদের সময় ঈশ্বরের মঙ্গল ভাব বুঝিতে পারে না।—এরূপ অবস্থায় ঈশ্বরে-বিশ্বাসী হারাণ কেন সুখী হইবে না। ভীমেন্দ্র এই খানে থাকিয়া চাষাকে ভাল বাসিতে শিখিল; কলিকাতায় থাকিতে "ছোট লোক" দিগের উপর যে ঘৃণা ছিল, হারাণ কামারের বাড়ীতে থাকিয়া ভীমেন্দ্রের সে ভাব রহিল না, ভীমেন্দ্র আস্তে আস্তে অল্পদিনের মধ্যেই বুঝিতে পারিল—ভগবান ভদ্রলোকের প্রতি অধিক সদয় চাষার প্রতি কম সদয় নহেন;—ভীমেন্দ্র বুঝিল চাষাও ভদ্রলোক হইতে পারে এবং কেবল পরিষ্কার কাপড় পরিয়া, মাথায় টেরি করিয়া, বুকে থোপ করিয়া চাদর বাঁধিয়া, গোলদীঘিতে, নদীর ধারে, এখানে সেখানে বেড়াইলেই ভদ্রলোক হয় না।—ভীমেন্দ্র চাষার সহিত চাষার ভাবে ৩।৪ দিন এই খানে থাকিল। বুড়ো কেরামতালি প্রভৃতি সকলেই ভীমেন্দ্রকে প্রত্যহ দেখিয়া যাইতেন, এবং যতদিন ভীমেন্দ্র রশুলপুরে ছিল কিসে তাহার সুখ হইবে, কিসে বিদেশে থাকার ক্লেশ যাইবে, তাহার চেষ্টা করিতেন। অবশেষে হাটের দিন উপস্থিত হইল। ৩ টার সময় হাট বসিল। আজ "বাবু"দের আসিবার কথা; ভীমেন্দ্র কতক আহ্লাদ কতক দুঃখের সহিত, কখন তাঁহারা আসিবেন, তাহার অপেক্ষা করিতে লাগিল। দুঃখের কারণ এই এত ভালবাসা যাহারা দেখাইল সেই সকল সরলহৃদয় দরিদ্র চাষাদিগকে ছাড়িয়া যাইতে হইবে। ভীমেন্দ্র অনেক শিখিয়াছে কিন্তু ভীমেন্দ্র কৃতজ্ঞতা শিখিতে পারে নাই—সুসভ্য লোকেরা যেমন মুখে ধন্যবাদ দিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন সে কৃতজ্ঞতার কথা বলিতেছি না। উপকার পাইলে উপকারীর প্রতি যে প্রাণের টান হয়, আমরা এখানে সেই কৃতজ্ঞতার কথা বলিতেছি।—কেহ কেহ হয়ত বলিবেন, ভীমেন্দ্র যে ছাড়িয়া যাইতে চাহিতেছেনা, ইহাইত তাহার প্রাণের টানের একটা প্রমাণ। তদুত্তরে আমরা বলি, তাহা নহে। এত-



কাল সুখে ছিল, এখন আবার কোথায় গিয়া আবার কোন্ বিপদে পড়িয়া ক্লেশ পায় মনের এই অনির্দ্দিষ্ট ভয়ের জন্য দুঃখী চাষাদের সহিত ভীমেন্দ্র হাটে গিয়াছিল—'ভদ্রলোক' কাজে কাজেই 'প্রধান' বলিয়া ভীমেন্দ্রের এখন আর কোন অভিমান নাই। সকল চাষাদের সহিত ভীমেন্দ্র হাটের মধ্যে একটা বটগাছ তলায় বসিয়া কিহয় কিহয় ভাবিয়া চারিদিকে দেখিতে লাগিল।—কিছুকাল পরে দেখিল একজন সুন্দর পুরুষ, মুখে শাদা দাড়ি, তিনি হাটের দিকে আসিতেছেন। তাঁহার বর্ণ কাল, কিন্তু তাহাতে এমনই একটু সৌন্দর্য্য আছে যে দেখিতে ইচ্ছা করে—হাতে কতকগুলি পুস্তক, অপর হাতে একটী ছাতা; বাবুটী হাটের নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন; ইনি পূর্ব্বে কখনও এখানে আইসেন নাই, আজ নূতন আসিয়াছেন—সুতরাং অল্পকালের মধ্যে তাঁহার চারিদিকে অনেক লোক জমিল। তিনি প্রথম আসিয়াছেন সুতরাং অনেকে গিয়া তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল, এইদলে ভীমেন্দ্রও ছিল। আমরা তাঁহার পরিচয় দিতেছি। ইনি খৃষ্টীয়ান ধর্ম্ম প্রচারক শ্রীযুক্ত বিপ্রদাস বসু; ইনি অনেককাল পর্য্যন্ত বেতন লইয়া প্রচার করিতেন, সম্প্রতি প্রাচীন বয়সে পেন্‌সন লইয়া অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। ৪০ বৎসর পর্য্যন্ত ধর্ম্ম প্রচার করিয়া ও অসাধারণ কষ্ট সহ্য করিয়াও ইনি বিশ্রাম করিতে চান না; ইহাঁর ইচ্ছা "ঈশ্বরের শরীর যত দিন ঈশ্বর রাখিবেন, ততদিন এ শরীরের দ্বারা তাঁহারই কার্য্য করিব।" বাবুটী সম্প্রতি বগুড়া হইতে আসিয়াছেন; হরিপদ বাবু ইহাঁর জামাতা; রশুলপুরের হাটে অনেক লোকের সমাগম হয় শুনিয়া তাঁহার যে ধর্ম্মে বিশ্বাস সেই ধর্ম্মের কথা লোককে শুনাইতে আসিয়াছেন। হরিপদ বাবু ইহাঁর জামাতা, এ কিরূপ কথা? হরিপদ বাবু ব্রাহ্ম, ইনি খৃষ্টীয়ান; তবে কিরূপে হরিপদ বাবু ইহাঁর জামাতা হইলেন, সে কথা বলা আবশ্যক। বিপ্রদাস বাবু হরিপদ বাবুর পাঠাবস্থায় তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন—প্রায়ই তাঁহাকে আপন বাটীতে ডাকিতেন। এই খানেই হরিপদ বাবুর সহিত বসন্ত বালার পরিচয় ও বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হয়। বিপ্রদাস বাবু এই ভাল বাসা দেখিয়া তাহাতে বাধা দেন নাই;—শেষ কালে বড় হইয়া যখন হরিপদ বাবু ও বসন্ত বালার পরস্পরকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা হইল, বিপ্রদাস বাবুর মন এত উদার যে তিনি তাহাতে মহাসুখে সম্মত হইয়া সেই ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীকেই কন্যা সম্প্রদান করেন। ভীমেন্দ্র এই কথা শুনিয়া ভক্তির সহিত তাঁহার দিকে তাকাইতে লাগিল। বিপ্রদাস বাবু ভীমেন্দ্রকে ওরূপ ব্যগ্র ভাবে তাকাইয়া থাকিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কে? দেখিয়া বোধ হইতেছে, ভদ্রলোক, এখানে কোথায় থাক?" ভীমেন্দ্র সমস্ত কথা বলিল;—ধর্ম্ম প্রচারক এই কথা শুনিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন "আমি বগুড়ায় ফিরিয়া যাইতেছি—যদি ইচ্ছা কর তাহা হইলে লইয়া যাইতে পারি।" ভীমেন্দ্র স্বীকৃত হইল। অনন্তর বিপ্রদাস বাবু একখানি পুস্তক খুলিয়া খানিক ক্ষণ পাঠ করিলেন। চাষারা অনেকে দাঁড়াইয়া শুনিল। অবশেষে তিনি ঈশা খৃষ্টের কথা বলিতে লাগিলেন। ঈশা খৃষ্টের নাম সেখানে কোন চাষারই কর্ণগোচর হয় নাই, সুতরাং যখন বিপ্রদাস বাবু কাঁদ কাঁদ ভাবে বলিতে লাগিলেন কেমন করিয়া ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ ঈশাখৃষ্ট ধর্ম্মের জন্য লোকের অত্যাচারে প্রাণ দিয়াছিলেন, তখন অনেকের অনেক দুঃখের কথা মনে পড়িয়া কান্না পাইতে লাগিল—অল্পকাল মধ্যে সেই সরল চাষাদের মধ্যে কান্নার স্রোত দেখা গেল;—ধন্য বক্তা! ধন্য বক্তৃতা! বক্তৃতা শেষ হইল—অনেকে বিপ্রদাস বাবুকে আস্‌ছে হাটে আসিতে বলিল—বিপ্রদাস বাবু আপনার কার্য্যের ফল দেখিয়া ঈশ্বরকে ধন্যবাদ

দিলেন।—ভীমেন্দ্র এইবার কৃতজ্ঞতা শিখিল। যাঁহার নিকট এমন সুন্দর ভাবের কথা শুনিল ভীমেন্দ্র তাঁহাকে ভক্তি না দিয়া থাকিতে পারিল না।—চাষারাও সকলে খুব আশ্চর্য্য হইয়া শুনিল। বিপ্রদাস বাবু আপনার কার্য্য শেষ করিয়া যাহারা যাহারা পড়িতে পারে, তাহাদের নিকট পুস্তক বিতরণ করিলেন। অবশেষে ভীমেন্দ্রকে বলিলেন, 'তুমি বগুড়াতে যাইতে ইচ্ছা করিলে আমার সহিত যাইতে পার।" ভীমেন্দ্র যাঁহাদিগের বাটীতে এতদিন ছিল, তাঁহাদের নিকট বিদায় লইয়া বিপ্রদাস বাবুর সহিত বগুড়া যাত্রা করিল। ক্রমশঃ—

## শিশু-স্বাস্থ্য রক্ষা।

### প্রথম উপদেশ।

### প্রাতঃ ক্রিয়া।

প্রাতঃকালে নিদ্রা হইতে উঠিবে; যাহাদিগের সকালে উঠিবার অভ্যাস আছে, তাহারা সবল, সুস্থ ও দীর্ঘজীবী হয়। বিলাতের এক জজ সাহেব তাঁহার কাছারীতে যত প্রাচীন সাক্ষী আসিত সকলেরই আহার ব্যবহারের নিয়ম জিজ্ঞাসা করিতেন, প্রাচীন সাক্ষীরা প্রায়ই বলিত, যে তাহারা অতি সকালে নিদ্রা হইতে উঠিয়া থাকে। তোমরাও ভোরে উঠিবে, তাহা হইলে তোমরাও অনেক দিন বাঁচিতে পারিবে।

নিদ্রা হইতে উঠিয়া মল মূত্র ত্যাগ করিবে। যাহাদিগের সকালে এই কাজ করিবার অভ্যাস আছে, তাহাদের শরীর সুস্থ থাকে ও পরিপাক শক্তি উত্তম হয়। এ বিষয়ে কোন নিয়ম না থাকিলে নানারূপ পেটের অসুখে ক্লেশ পাইতে হয়। তাহার পর চক্ষু ও মুখ শীতল জলে ধুইয়া ফেলিবে। অনেক বালক বালিকার তাহা অভ্যাস নাই। প্রত্যহ মুখ না ধুইলে মুখে দুর্গন্ধ হয় ও অনেক পীড়া হইতে পারে। দাঁত গুলি প্রত্যহ কয়লার গুঁড়ো কি মৃত্তিকা বা খড়ি দ্বারা পরিষ্কার করিবে, নতুবা দাঁত রুগ্ন ও মলিন হয়। মলিন দাঁত দেখিতে বড় অপ্রীতিকর। যদি দাঁত পানসিয়া বা ইহার গোড়া নরম হয়, তবে খড়ি ও ফটকিরি একত্র মিশাইয়া তদ্দ্বারা দন্ত পরিষ্কার করিবে। মুখ ধুইবার পরে চিরুণি বা ব্রুস্ দ্বারা চুল আঁচড়াইবে, এরূপ অভ্যাস থাকিলে মস্তকে উকুন কিম্বা খুসকী অর্থাৎ মরামাংস থাকিতে পারে না।

সকালে অতি অল্প পরিমাণে আহার করিবে। আম্র, কমলালেবু, কি অন্য কোন সুপক্ক ফল, রুটী ও মোহন ভোগ, ডিম্ব কি অন্য কোন পুষ্টিকর পদার্থই আহার করিবে। কতক গুলি মিষ্টান্ন দ্বারা উদর পূর্ণ করিবে না।

অনন্তর কোনরূপ ব্যায়াম করিবে, কিংবা খুব খানিকটা বেড়াইয়া আসিবে। এরূপ করিলে অনেকে মনে করেন সে পড়ার ক্ষতি হয়, ইহা নিতান্ত ভুল। কিঞ্চিৎ ব্যায়ামের পরে অতিশয় স্ফূর্ত্তির সহিত পড়িতে পারিবে।

অনন্তর অধ্যয়ন করিতে প্রবৃত্ত হইবে।

### দ্বিতীয় উপদেশ।

### অধ্যয়ন।

ছাত্রেরা বলেন যে তাঁহারা পড়ার বিঘ্ন করিয়া স্বাস্থ্যরক্ষায় মনোযোগ করিতে পারেন না। এ কথা নিতান্ত অসার। অধ্যয়ন ও শরীর রক্ষা উভয়ই যে সমান কর্ত্তব্য আমরা তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। বিশেষতঃ নিয়মিত রূপে চলিলে পড়ারই বা অনিষ্ট কেন হইবে। আমরা নিম্নে ছাত্রগণের জন্য একটী কার্য্যের তালিকা দিতেছি, তদনুসারে চলিলে শরীর ও মন দুইই রক্ষিত হইবে।

### ছাত্রগণের কার্য্যের তালিকা।

| | | |
|---|---|---|
| প্রাতঃকাল | ৫টা হইতে ৬টা | বাহ্যে ও মুখ ধোওয়া ইত্যাদি। |
| | ৬ ৭ | কিঞ্চিৎ জল খাইবার পরে ভ্রমণ। |
| | ৭ ৯ | অধ্যয়ন। |
| | ৯ ১১ | স্নান, আহার, স্কুলে গমন। |
| মধ্যাহ্ন | ১১ টা হইতে ৪ টা | স্কুল। |
| অপরাহ্ণ | ৪ ,, | ৫ জল খাওয়া ও ব্যায়াম। |
| রাত্রি | ৭ ,, | ১০ অধ্যয়ন। |
| ,, | ১০ ,, | ১১ আহার ইত্যাদি। |
| ,, | ১১ ,, | ৫ নিদ্রা। |

প্রায়ই বালকগণ ১০৷৷০ টা বা ১১ টার সময় স্কুলে যায়, এবং গড়ে ৬টার সময়ে রাত্রি প্রভাত হয়, সুতরাং স্নান, আহার, প্রাতঃক্রিয়া, ব্যায়ামাদির জন্য ৩৷৷ ঘণ্টা বিয়োগ করিলেও প্রাতঃকালে ২ ঘণ্টা পড়িবার সময় থাকে, বালকের পক্ষে ইহাই যথেষ্ট।

স্কুল হইতে আসিয়া শরীর ও মন ক্লান্ত হইয়া পড়ে সুতরাং তখন কোন রূপ খাবার খাইয়া কিছুকাল বিশ্রামের পরে ব্যায়াম করিবে। সন্ধ্যার পরে পড়িতে বসিয়া ৩ ঘণ্টা* পড়িয়া, আহারের পরেই শয়ন করিবে, আহারের পরে পাঠ করা অনুচিত।

পাঠগৃহ নির্জ্জন, বায়ুযুক্ত, শুষ্ক, ও শীতল হওয়া কর্ত্তব্য। একজনের একস্থানে বসিয়াই পাঠ করা উচিত। যাহা পড়িবে, অতিশয় মনোযোগ পূর্ব্বক পড়িবে, অন্য বিষয়ে মন দিলে পড়া হয় না। এই জন্যই মনোযোগী ছাত্রেরা দুই ঘণ্টায় যে পড়া করিতে পারে, অনাবিষ্ট বালকের পাঁচ ঘণ্টায়ও তাহা হয় না। সুতরাং মনোযোগী হইবে। পড়িবার পরে পঠিত বিষয় সকল মনে মনে আলোচনা করিবে, তাহা হইলে সকল পড়াই মনে আসিবে। এক বিষয় পড়িতে পড়িতে বিরক্তি হইলে অন্য বিষয় আরম্ভ করিবে। পড়িবার সময়ে নিদ্রা আসিলে অঙ্ককসা বা লেখা দ্বারা তাহা দূর করিবে, অতিশয় বিরক্তি বোধ হইলে পরিষ্কার বায়ুতে কিঞ্চিৎ বেড়াইয়া আসিবে।

অনেকে বৎসরের প্রথমে অলস হইয়া বসিয়া থাকেন, ও পরীক্ষার ২ কি ৩ মাস পূর্ব্বে দিবারাত্রি পরিশ্রম করেন, শরীরকে ক্লেশ দেন, ইহা বড় অন্যায়। যাহারা বৎসরের প্রথম হইতে মনোযোগ পূর্ব্বক বাড়ীতে ও স্কুলে পড়া শুনা করে, তাহারা পরীক্ষার সময়ে শরীর ক্ষয় না করিয়াও ভাল হইয়া থাকে।

পাঠ সময়ে যতদূর সম্ভব স্থির ভাবে বসিবে;—চেয়ারে বসিয়া পড়িলে অনেক ভাল হয়। অনবরত মস্তক হেট করিয়া লেখা কি পড়া উচিত নহে। অনেক কৃতবিদ্য লোক এই অভ্যাসদোষে কুঁজো হইয়া থাকেন! অল্প কি তীব্র আলোকে পড়িবে না, পড়িবার সময়ে পুস্তক এমন ভাবে রাখিও না যে তদুপরি চন্দ্র কি সূর্য্য কিরণ পতিত হয়। যদি পড়িতে পড়িতে চক্ষু বেদনা বোধ হয়, তখন পড়া ত্যাগ করিয়া শীতল জলে চক্ষু ধুইয়া ফেলিবে ও চক্ষু বন্ধ করিয়া মনে মনে পড়ার বিষয় সকল আলোচনা করিবে। ক্রমশঃ—

* মনোযোগের সহিত পড়িলে বালকেরা ইহা অপেক্ষা অনেক কম পড়িয়াও বেশ চালাইতে পারেন।



## আখ্যান-মালা।

### এ পৃথিবীতে আর আসিবে না।

এক দিন সরোজা আহারের জন্য অপেক্ষা করিতেছে এমন সময়ে একটু কাগজে লেখা এই কয়টী কথার উপর তাহার দৃষ্টি পড়িল:—"সৎলোকেরা মনে করেন, আমি এই পৃথিবীতে কেবল একবারই আসিব; সেই সময়ের মধ্যে যত ভাল কাজ করা যায় ও করা উচিত, ইহার প্রতি অমনোযোগী হওয়া আমার কর্ত্তব্য নহে।" সরোজা এই কথাগুলি একবার প

পড়িল, দুইবার পড়িল,—এই কথাগুলি তাহার প্রাণে বিশেষ রূপে অঙ্কিত হইল। সে অতিশয় ভাবিতে ভাবিতে আহার করিতে বসিল। আহারের সময় মাতার মুখের দিকে চাহিয়া তাহার বোধ হইতে লাগিল যেন তাঁহার কোন সৎইচ্ছা পূর্ণ হয় নাই—যাহা আর হইবে না। সরোজা পূর্ব্বে মনে করিয়াছিল এই ছুটীর কয় দিন খুব আমোদে কাটাইবে, কিন্তু এখন তাহার ইচ্ছা হইল "যতদূর পারি কাজ করিয়া আমার সময়ের সদ্ব্যবহার করিব।" 'আমি আর এ সময় পাইব না'—এই ক্ষুদ্র কথাটী তাহার প্রাণকে নাড়িয়া দিল; তাহার প্রাণে আর এক নূতন চিন্তার স্রোত বহাইয়া দিল। যদি মাতা দিন দিন রোগা হইয়া যান, যদি তাঁহার অসুখ বৃদ্ধি পায়, যদি তাঁহার মৃত্যু হয়, এই সকল মহাকষ্টকর ভাবনায় বালিকাকে অস্থির করিতেছিল। সে কেবল এই ভাবিতে লাগিল "হায়! আমি মায়ের নিকট তাঁহার স্নেহের জন্য ঋণী রহিলাম তাহার পরিশোধ কিরূপে দিব। যাহা হউক যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।" আহারের পর সে আহ্লাদে নাচিতে নাচিতে মাকে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল "মা! তুমি না বলেছিলে একদিন ভবানীপুরে গিয়ে মাসীর সঙ্গে দেখা করিবে। আজই যেওনা,—আমি তোমার আজকার সমস্ত কাজ করিব।" মাতা উত্তর করিলেন "না মা! আজ অনেক কাজ আছে, আজ আর যাওয়া হবে না।" সরোজা বলিল "হাঁ মা! আজই যাওনা—আজ আর আমার কোন কাজ নাই, কেবল তোমার কাজই ক'রব।"

সরোজা তাহার কথা রখিল। তাহার মাতা আসিয়া তাঁহার কার্য্য সমস্তই হইয়াছে দেখিতে পাইলেন। সেই দিন হইতে সরোজাকে আর কোন কার্য্যের জন্য কিছুই বলিতে হয় নাই।

## রাজার ভদ্রতা ও সুবুদ্ধি।

একদিন কোন একজন রাজা একটী দরিদ্র বালককে উপদেশ দিতেছিলেন দেখিয়া, একজন খোসামুদে আশ্চর্য্য হইয়া তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিল; তিনি উত্তর দিলেন, "দেখ, যদিও বালকটী গরিব তথাপি উহার আত্মা আমারই ন্যায় মূল্যবান, উহার ও আমার উভয়েরই এক ঈশ্বর ও এক পথ। তবে কেন উহাকে নীচ বলিয়া ঘৃণা করিব?"

---

## এযে নূতন মেয়ে!

একবার একটী নৈতিক বিদ্যালয় সংস্থাপন করিবার নিমিত্ত একজন ধার্ম্মিক লোককে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। তিনি প্রাতঃকালের কাজে অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন,—বৈকালে আপনার কাজ করিতে পারিবেন না, এইরূপ মনে করিলেন। কিন্তু তাঁহার অনিচ্ছা সত্ত্বেও সেই স্থানে যাইতে হইল। তিনি সেই স্থানে গিয়া সেই সকল লোককে বিশেষ করিয়া দেখিতে লাগিলেন। তিনি দেখিলেন একটি বালিকা অতি কদর্য্যরূপে কাপড় পরিয়া সেই স্থানের এক পার্শ্বে বসিয়া আছে; তাহার রৌদ্রতপ্ত ছোট মুখখানি হাত দিয়া ঢাকা, এবং চক্ষের জল হস্তের মধ্য দিয়া দর দর করিয়া পড়িতেছে। তাহার ক্রন্দন দেখিয়া বোধ হইল যেন, দুঃখে কষ্টে তাহার ক্ষুদ্র প্রাণটী ফাটিয়া যাইতেছে। শীঘ্রই আর একটি একাদশবর্ষীয়া বালিকা সেইখানে আসিল। সে এই বালিকাটিকে কাঁদিতে দেখিয়া তাহার নিকটে গেল এবং অতি স্নেহের সহিত তাহাকে নিকটের নদীর ধারে একখানি কাঠের উপর বসাইয়া হস্তে করিয়া জল লইয়া তাহার চক্ষু ও অশ্রুমাখা মুখ খানি শীতল করিয়া, তাহার সহিত অতি প্রফুল্ল ভাবে কত আলাপ করিতে লাগিল। ক্ষুদ্র বালিকাটী পুনরায় প্রফুল্ল হইল, চোখের জল তাহার নিকট বিদায় লইল, মুখখানি ফের হাসিমাখা হইল। সেই ভদ্র লোকটী নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন



"বাছা! এটী কি তোমার ছোট বোন"। বালিকাটী নম্রভাবে উত্তর দিল, "না মহাশয়! আমার একটিও বোন নাই।"

"তবে বোধ হয় তোমরা এক পাঠশালায় পড়, না?"

বালিকাটি বলিল "না, আমি ইহাকে কখনও দেখি নাই, জানি না কোথা থেকে এসেছে।"

"জান না? তা হলে কেমন করে ওকে নিয়ে এসে এমন যত্ন কর্‌ছ?"

"ও মেয়েটী এখানে নূতন এসেছে, একলা একলা, ফাঁক ফাঁক লাগছে,—কাহারও উহার উপর ভাল ব্যবহার করা উচিত, সেই জন্য আমি ওকে এখানে এনেছি"।

ভদ্রলোকটী মনে করিলেন "আমি আজ এই বিষয় লইয়া কিছু বলিব।" তাঁহার সেদিনকার উপদেশের বিষয় এই:—"তুমি তোমার ভাই বোনদিগের প্রতি যে টুকু ভাল ব্যবহার কর, সে টুকু ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্যই কর।" তিনি বালিকা দুটিকে সেখানে লইয়া গিয়া ঘটনাটি সংক্ষেপে সকলকে জানাইলেন। অনেক বালকবালিকা একমনে সে কথা শুনিল।

---

## ঠিক উত্তর।

একদিন একটি বালককে তাহার সঙ্গীগণ তাহার পিতার গাছ হইতে কতকগুলি আম পাড়িতে বলিল। কিন্তু তাহার পিতা সেই আমগুলিতে হাত দিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। তাহার সঙ্গীরা বলিল; "তুমি ভয় পাও কেন? তোমার বাবাত আর তোমায় মারিবেন না?" বালকটি উত্তর করিল, "সেই জন্যই আমার হাত দেওয়া উচিত নয়। বাবা আমায় আঘাত করিবেন না বটে, কিন্তু আমিত অবাধ্য হইয়া তাহার মনে আঘাত দিব?"

---

## শাস্তি।

পাঁচ বৎসরের একটি ছোট ছেলে কোন দোষ করাতে, তাহার পিতা তাহাকে ডাকিয়া তাহার দোষের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। অবশেষে সে যে দোষ করিয়াছে তাহা তাহাকে বুঝাইয়া দিয়া, ঈশ্বরের কাছে তাহার মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করিলেন। তার পর একখানি বই হইতে, এই কথাগুলি পড়িয়া তাহাকে বুঝাইয়া দিলেন:—"যিনি সন্তান দোষ করিলে শাস্তি দেন না, তিনি সন্তানের মঙ্গল চান না। যে পিতা সন্তানের মঙ্গল চান, তিনি যথাসময়ে তাহার দোষের জন্যে তাহাকে শাস্তি না দিলে ছেলেদের জ্ঞান হয় না। ছেলেদের আপনাদের ইচ্ছামত কাজ করিতে দিলে শেষে এমন কাজ করে, যাহাতে পিতা মাতার নিন্দা হয়"। পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন বাপু! আমার কি করা উচিত বল দেখি?" ছেলেটি উত্তর দিল, "কেন বাবা! আমি যে দোষ করিয়াছি ও শাস্তি পাবার উপযুক্ত; আমায় শাস্তি দিবেই।" শাস্তি পাবার পরে, বালকটি পিতাকে জড়াইয়া ধরিল এবং বলিল, "বাবা! আমি আর কখন তোমার অবাধ্য হইব না।"

---

## শিশুর সততা।

গ্রামের কোন ছোট বিদ্যালয়ের একটি শ্রেণীর বালকদিগকে, তাহাদের পড়া লইতে লইতে, একটি কঠিন শব্দ বানান করিতে বলিলাম। প্রথম, দ্বিতীয়, করিয়া সকলকে জিজ্ঞাসা করিতে করিতে সকলের চেয়ে ছোট একটী বালককে জিজ্ঞাসা করিলাম; সে ঠিক বলিল। আমি তাহাকে প্রথম বসিতে বলিয়া আরও ভাল করিয়া শিখিতে পারে সেই উদ্দেশ্যে যাই বোর্ডে লিখিয়া দেখাইব, অমনি ছেলেটি বলিয়া উঠিল, "পণ্ডিত মহাশয়! আমি 'ঊ'র স্থানে 'উ' বলিয়াছি।" এই বলিয়াই সে আপন স্থানে আসিয়া বসিল। বল দেখি ক্ষুদ্র বালকের পক্ষে ইহা কি সামান্য সুবুদ্ধি দেখান! যদি সে আপনার ভুল না বলিত তাহা হইলে আমি চিরকালই মনে করিতাম সে ঠিকই বলিয়াছিল, কিন্তু বালকটি এমন সৎ যে যাহা তাহার পাওয়া উচিত নহে, তাহা তাহার লাভ করিবার ইচ্ছা হইল না।

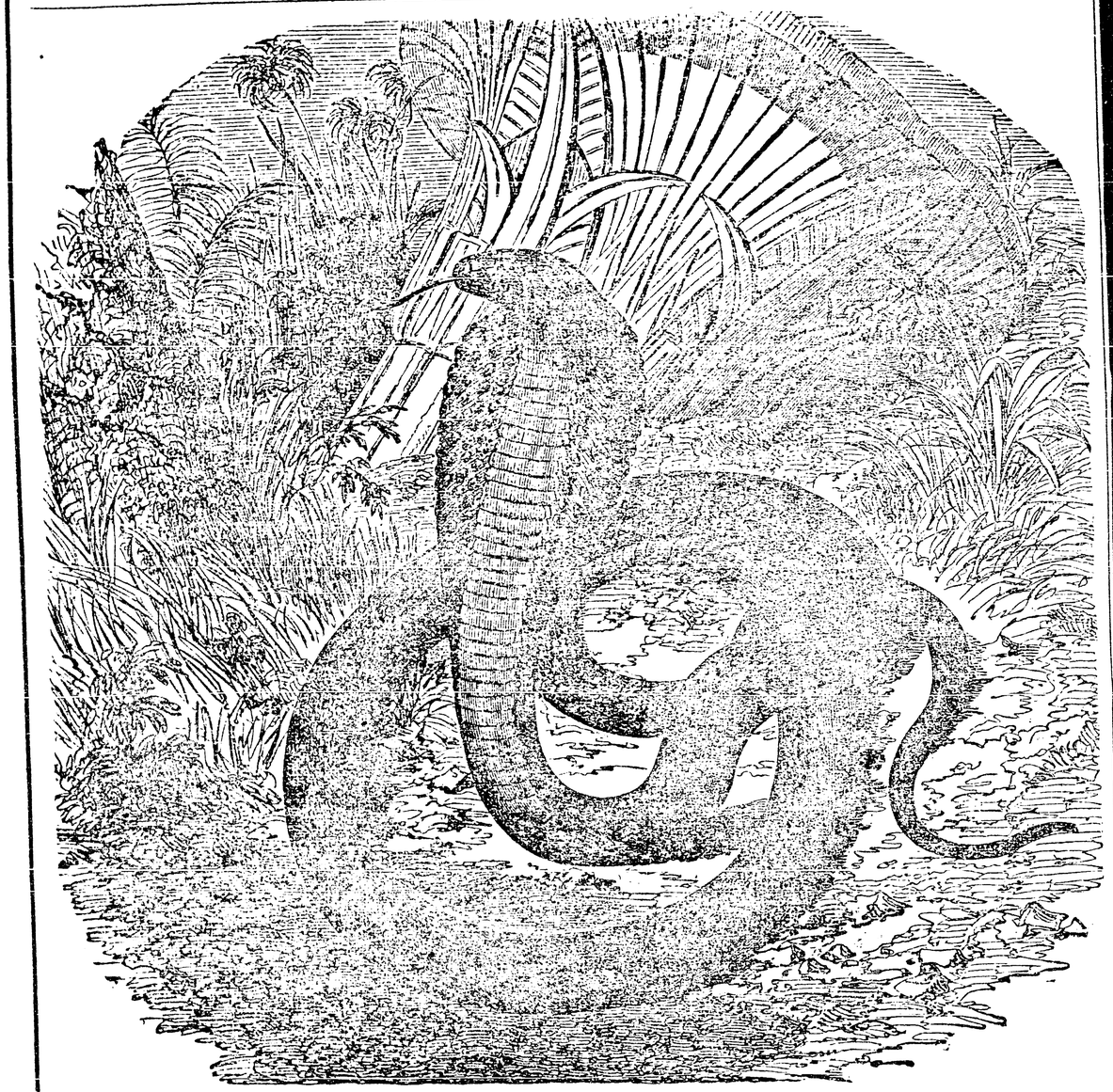

## সর্পের ঔষধ।

আমরা মার্চ্চ মাসের 'সখা'তে বলিয়াছি কিরূপ সতর্ক হইলে সাপের ভয় অনেক কমিয়া যায়। কিন্তু সাপে কামড়াইলে কি করা উচিত, তাহার এ পর্য্যন্ত লিখি নাই। মার্চ্চ মাসে যে সর্পের চিত্র দেওয়া গিয়াছে, তাহা বিষাক্ত নহে অর্থাৎ তাহারা কামড়াইলে বিষ লাগে না। কিন্তু অদ্য যে চিত্রটী দিলাম, এই দলের সাপ বড় ভয়ানক! দেখিয়াছ, কি ভয়ানক ফণা ধরিয়াছে! আমরা আজিও সাহসের সহিত বলিতে পারি না, সর্পাঘাতের যথার্থ ঔষধ আছে কি না। তবে অনেক ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া যত গুলি ঔষধ বাহির করিয়াছেন, তাহা নীচে লিখিয়া দিলাম—আবশ্যক হইলে পাঠক পাঠিকাগণ পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন। আমাদের কিন্তু সব গুলিতে বিশ্বাস হয় না।

১। একুশটী গোলমরীচের সহিত শ্বেত দূর্ব্বার শিকড় বাটিয়া খাইলে সাপে কাটা রোগী আরোগ্য লাভ করে।

২। যেখানে সাপে কাটিবে, তাহার একটু উপরে খুব শক্ত করে দড়ি বা সূতার দ্বারা তাগা বাঁধিবে। তাহার পর লোহা গরম—লাল—করিয়া সেই স্থানটী পোড়াইয়া দিবে।

৩। পূর্ব্বের মত তাগা বাঁধিবে। তাহার পর মোরগের একটী শিরা কাটিয়া ক্ষত স্থানে লাগাইয়া দিবে; এই রূপ একটীর পর একটী ক্রমাগত লাগাইতে থাকিবে, যখন দেখিবে শেষ মোরগটী মরিল না, তখনই জানিবে বিষ গিয়াছে।

৪। সাপুড়িয়ারা একটী ঔষধ বলিয়া থাকে; চৈত্র মাসের সংক্রান্তির দিন ফল-ধরে-নাই-এমন বেল গাছের উত্তরমুখী একটা শিকড় এক নিশ্বাসে তুলিয়া রাখ। এই শিকড় সাপের যম। আমরা সংক্রান্তি, উত্তর দক্ষিণ, বা—এক নিশ্বাসের কথা কিছুই জানি না। তবে বেলের শিকড়ে সাপের ভয় আছে তাহা জানি। বোধ হয় ইহাতে ঔষধেরও কাজ করিতে পারে।

## সাধুতা দ্বারা অসাধুতাকে জয় করিবে।

একদিন শনিবার বৈকালে কোন বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা ছুটির পর আপন গৃহে যাইতেছিল। যাহাদের বাড়ী নিকটে তাহাদের মধ্যে কেহ শীঘ্রই গৃহে ফিরিয়া আসিয়া পরস্পরে কথোপকথন কিম্বা খেলা করিবার জন্য দাঁড়াইয়া গেল। অপর যাহারা দূর হইতে পড়িতে আসিত তাহারা যথাসময়ে পরিবারবর্গের সহিত একত্র আহার করিবে বলিয়া তাড়াতাড়ি বাড়ীর দিকে ধাবিত হইল। শেষোক্ত সন্তানগণের মধ্যে একটী বালকের ও আর একটী বালিকার বাড়ী অপেক্ষাকৃত অনেক দূরে। তাহাদিগকে পর্ব্বতের উপর দিয়া অনেক পথ হাঁটিয়া আসিতে হইত; কিন্তু তাহারা অতি খারাপ দিন ছাড়া অন্য কোন দিন বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত থাকিত না। তাহাদের মাতা নলিনের মত সৎ ও সতর্ক বালকের হস্তে ক্ষুদ্র ভগিনী কুন্দকে নিরুদ্বেগে ছাড়িয়া দিতে পারিতেন। যদি কোন দিন পথিমধ্যে বৃষ্টি হইত তাহা হইলে নলিন আপনার জামার দ্বারা কুন্দকে ঢাকিয়া লইত। পথের যে স্থানে পাথর লাগিয়া কুন্দের ক্ষুদ্র পা দুটীতে আঘাত লাগিতে পারে, সেইস্থানে নলিন প্রিয়ভগিনীর হাত দুটী ধরিয়া তুলিয়া লইয়া যাইত। বিদ্যালয়ে যাইবার পথে তাহাদের একটী ছোট খাল পার হইয়া যাইতে হইত। নলিন কুন্দকে পিঠে করিয়া সেই খাল পার করিয়া দিত। এ দিকে কুন্দও নলিনকে প্রাণের সহিত ভালবাসিত। ভাই ভগিনীকে পাঠের সময় ছাড়া প্রায় কখনও সঙ্গ ছাড়া হইতে হইত না, কারণ কুন্দ বালিকাদিগের সহিত অন্য বিদ্যালয়ে পড়িত। ছুটী হইলে ঐ ক্ষুদ্র বালিকা লাফাইতে লাফাইতে হাসিতে হাসিতে, দুজনে এক সঙ্গে বাড়ী যাইবে বলিয়া নলিনের নিকট আসিত। কিন্তু আজ বৈকালে নলিন দেখিয়া কিছু আশ্চর্য্য হইল যে কুন্দের আর সে প্রফুল্ল ভাব নাই, সে মাথা হেঁট করিয়া ধীরে ধীরে ছেলেদের স্কুলের দিকে আসিতেছে, কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাহার চক্ষু লাল হইয়াছে। হাত দুটী ধরিয়া ঊর্দ্ধে তুলিয়া নলিন ভগিনীকে জিজ্ঞাসা করিল, "প্রিয়ভগিনি! আজ তোমার কি হইয়াছে?" নলিনের এই কথা শুনিয়া কুন্দমালা সমুদায় ঘটনা বলিতে আরম্ভ করিল; কিন্তু সে এত ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া কাঁদিতে-

ছিল যে নলিন তাহার একটীও কথা স্পষ্ট বুঝিতে পারিল না। অবশেষে কতকগুলি বালক বালিকা তাহাকে সকল ঘটনা বলিয়া দিল। ঘটনা এই—বালিকা-বিদ্যালয়ের একটী বড় মেয়ে কুন্দকে অত্যন্ত ভালবাসিত। সেই দিন প্রাতে কুন্দ তাহার নিকট হইতে ভালবাসার চিহ্নস্বরূপ একটী ছোট, চক্‌চকে মেটে পাত্র পাইয়াছিল। পাঠের সময় স্কুলের শিক্ষয়িত্রী অবশ্য সেই পাত্রটী দূরে রাখিয়াছিলেন; কিন্তু ছুটির পর কুন্দমালা সঙ্গিনীদিগকে দেখাইবার জন্য তাহা বাহিরে আনিল এবং বিদ্যালয়ে যাইবার পথে একখানা বেঞ্চের উপর রাখিয়া যেমন সে শক্ত করিয়া কাপড় পরিতেছিল, অমনি ভূপাল নামে একটী বালক তাহা দেখিতে পাইয়া অভদ্রভাবে উহা কাড়িয়া লইতে গেল। কুন্দ বিস্তর মিনতি করিল; এমন কি তাহার হাত ধরিল, কিন্তু গোঁয়ার বালক অতিশয় রাগিয়া তাহাকে এমন ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিল যে সে পড়িয়া গিয়া আঘাত পাইল। তার পর ঐ দুষ্ট বালক ভাঁড় হাতে করিয়া বলিতে লাগিল, "না, নিবনা বইকি? আমার খুসী আমি একশবার নিব!" অন্যান্য বালক বালিকারা যদি ঐ দুষ্ট বালকের রাগ থামা পর্য্যন্ত তাহাকে কিছু না বলিত, কিম্বা বেশ বুঝাইয়া দু একটী কথা বলিয়াই ক্ষান্ত থাকিত, তাহা হইলে বড়ই ভাল হইত। কিন্তু সকলেই একেবারে উচ্চৈঃস্বরে তাহাকে ছি! ছি! করিতে লাগিল, কেহ বা তাহার হাত হইতে ভাঁড় কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিল। এই রূপ করাতে ভূপালের আরও রাগ বাড়িয়া উঠিল। অবশেষে সে ভাঁড় মাথার উপর করিয়া তাহাদের মধ্য হইতে কিছু দূরে দৌড়িয়া গিয়া, বেচারা কুন্দের প্রিয় সামগ্রী সেই মাটীর ভাঁড়টী দেয়ালে আছাড় মারিয়া চীৎকার স্বরে বলিতে লাগিল "কেমন কুন্দ এইবার আসুক না, আর ভাঁড় নিয়ে যাক না।" বলা বাহুল্য যে সাধের ভাঁড় খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল, এবং ইহাই আজ বালিকা কুন্দের দুঃখের কারণ। নলিন চুপ করিয়া এই কথাগুলি শুনিল। তার পর ভগ্নীর হাত ধরিয়া দুজনে বাড়ীর দিকে ছুটিল। নলিনের স্বাভাবিক হাসাহাসি মুখখানি আজ বড় দুঃখে ভার হইয়াছে; কুন্দের দুঃখে নলিনের ভয়ানক দুঃখ হইয়াছে। বালিকার ঘিন্‌ঘিনে স্বভাব ছিল না, শীঘই পথের ধারের বনফুল তুলিতে আরম্ভ করিয়া সাধের ভাঁড়ের কথা ভুলিয়া গেল।

তাহারা কিছু অধিক অর্দ্ধেক পথ গিয়াছে, এমন সময় তাহাদের সহিত নলিনের একজন বন্ধুর সাক্ষাৎ হইল। সেই বালক কয়েকদিন তাহার পিতার পীড়ার জন্য বিদ্যালয়ে যাইতে পারে নাই, এক্ষণে নলিনকে দেখিতে পাইয়া বলিল, "নলিন! আমার পিতা অনেক সুস্থ হইয়াছেন, আমি কাল স্কুলে যাইব।" নলিন হেঁটমুখে বলিল "তা বেশ!"

দেবনাথ বলিল, "কেন, তোমার কি হইয়াছে? তোমাকে বিমর্ষ ও গম্ভীর দেখাইতেছে কেন? তুমি কি আজ স্কুলে কোন লজ্জায় পড়িয়াছিলে?" নলিন বলিল "তা না। কিন্তু ভূপাল আজ বড় মন্দ কাজ করিয়াছে, সে কুন্দের ভাঁড় খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিয়াছে।" দেবনাথ বলিল, "ভূপালের অতিশয় অন্যায় করা হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে আমি তোমার দুঃখিত হইবার কারণ দেখিতেছি না। আমি বেশ বলিতে পারি, ভূপাল আপনই আপনার মন্দ ব্যবহারের কথা ভাবিয়া দুঃখিত হইবে।" এই কথা শুনিয়া নলিন রাগের ভরে বলিল "আমি তাহাকে এর শাস্তি দিব। যদি সে আমার অপেক্ষা বলবান না হইত তাহা হইলে আমি যাইয়া তাহাকে মারিতাম, কিন্তু যখন তাহা পারিতেছি না, আমি হয় তাহার নূতন লাঠিম ভাঙ্গিয়া দিব না হয়—" দেবনাথ বলিল, "এ! থাম, থাম। তোমার এপ্রকার বলা বা এমন কি ভাবা ও উচিত নহে। তুমি কি জান না ইহাকেই প্রতিশোধ লওয়া বলে অর্থাৎ খারাপের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করা? কিন্তু আমাদের কি করা উচিত? আমাদের অসাধুতাকে সাধুতার দ্বারা জয় করা উচিত।" নলিন বলিল, "কেন আমরা স্কুলে কিছু দোষ করিলে শিক্ষক মহাশয় ত আমাদিগকে শাস্তি দেন!" দেবনাথ উত্তর করিল "বটে; কিন্তু আমাদিগকে সেই কার্য্য হইতে ভাল করিবার জন্য; কিন্তু তুমি ভূপালের শিক্ষক নও; আর তা ছাড়া তুমি তাহার কিছু ক্ষতি করিতে চাও, কারণ তোমার মনে একটী খারাপ ভাব রহিয়াছে এবং সেই ভাবকেই 'প্রতি হিংসা' বলে।" নলিন কিছুকাল চুপ করিয়া থাকিল; পরে বলিতে লাগিল, "ভূপাল যদি আমার কোন অপকার করিত তাহা হইলে আমি তাহাকে ক্ষমা করিতে পারিতাম; কিন্তু হায়, আমার ভগ্নী কুন্দ! আহা! তার ক্ষতি করিল কেন? আমি কাহাকেও কুন্দকে কষ্ট দিতে দিব না।" দেবনাথ বলিল "আচ্ছা তুমি যদি ভূপালের লাঠিম ভাঙ্গিয়া দাও, তাহা হইলে তাহাকে কি কুন্দের প্রতি কি এরূপ আর কাহারও প্রতি দয়ালু হইতে বা মৃদুব্যবহার করিতে শিক্ষা দেওয়া হইবে? আমার পিতা সে দিবস বলিতেছিলেন, আমাদের প্রিয়জনের উপর কেহ অত্যাচার করিলে তাহাকে ভালবাসা বড়ই শক্ত কিন্তু শক্ত হইলে কি হয়? আমরা যদি পরমেশ্বরের নিকট হইতে দয়া পাইতে ইচ্ছা করি তাহা হইলে আমাদের শত্রুকেও ভালবাসা দেওয়া উচিত"। নলিন প্রায় কাঁদকাঁদ হইয়া বলিতে লাগিল, "আমার বোধ হইতেছে যেন ভূপালকে ক্ষমা করিতে আমার ইচ্ছা হইতেছে।" দেবনাথ বলিল, "ভাল, তোমার এই যে সৎইচ্ছা হইয়াছে, তাহা যাহাতে থাকে তাহার জন্য একমনে পরমেশ্বরকে ডাক। যাহার ইচ্ছা ভাল ঈশ্বর তাহার সহায়"—এই কথা বলিতে বলিতে দেবনাথ পথের এমন স্থানে উপস্থিত হইল যেখান হইতে তাহার যাইবার পথ অন্যদিকে ফিরিয়াছে। অতএব নলিনকে বলিল "এস ভাই এস, আমি আজ চলিলাম।" নলিন একটীও কথা না বলিয়া ঘাড় নাড়িয়া কুন্দের সহিত ক্রমাগত চলিতে লাগিল। এদিকে কুন্দ ও পথ পার্শ্বস্থ ফুল তুলিতে তুলিতে ক্লান্ত হইয়াছে, ভাইয়ের হাত ধরিয়া অবশেষে দুজনে গৃহে পৌছিল। বাড়ী আসিয়াই কুন্দ মায়ের নিকট দৌড়িয়া গেল এবং তাঁহাকে মাটীর ভাঁড়ের কথা বলিতে লাগিল, কিন্তু নলিন খানিকক্ষণ দ্বারের বাহিরে অপেক্ষা করিতেছিল। ইহার কারণ কি? সে কি এখন কেমন করিয়া ভূপালের লাঠিম নষ্ট করিবে তাহা ভাবিতেছে? না, কি রূপে সে নিজের রাগ থামাইবে তাহার জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেছে।

এই ঘটনার প্রায় এক সপ্তাহ পরে নলিন এক দিন স্কুলে যাইতেছিল। সে দিন কুন্দের শর্দ্দি হওয়াতে স্কুলে যাইতে পারে নাই। নলিন দূর হইতে শুনিল একটী বালক কাঁদিতেছে। নিকটে আসিয়া দেখিল, সেই বালক আর কেহই নয় আগেকার চেনা লোক—ভূপাল। নলিন জিজ্ঞাসা করিল, "কি হইয়াছে?" ভূপাল মাথা তুলিয়া যখন দেখিল নলিন তাহাকে প্রশ্ন করিতেছে, তখন সে কিছু না বলিয়া অমনি মুখ নামাইল। নলিন পুনরায় মিষ্টভাবে জিজ্ঞাসা করিল "ভূপাল! তুমি কাঁদিতেছ কেন? আমাকে বল তোমার কি হইয়াছে।" নলিনের এই স্নেহের কথায় ভূপাল আর থাকিতে পারিল না, বলিল "আমি অতিশয় ক্ষুধিত, মা আমার কাল সকাল হইতে জ্বরে শয্যাগত আছেন এবং আমি এপর্য্যন্ত কিছুই খাই নাই।" নলিন বলিল, "দুর্ভাগা বালক, আহা, তুমিত ক্ষুধিত হইবেই! আমার সহিত একখানা ভাল রুটি আছে আমি উহা তোমাকে দিতেছি।" ভূপাল বলিল, "এই রুটী তোমার

নিজেরই আবশ্যক হইবে, ইহা তোমার সকাল বেলার খাবার।" নলিন ক্ষুদ্র একখণ্ড আপনার জন্য রাখিয়া অপরখণ্ড ক্ষুধিত ভূপালের হাতে দিল। ভূপাল যদিও মাঝে মাঝে অত্যন্ত গোঁয়ার হইয়া উঠিত তথাপি তাহার মনটী নিতান্ত মন্দ ছিল না। এই জন্য নলিনের এই দয়া তাহার বিলক্ষণ মনে লাগিল। সে বলিল "আমি তোমার ছোট ভগিনীর উপর যে অন্যায় আচরণ করিয়াছি তাহা বিবেচনা করিলে আমি কোন প্রকারে তোমার এই দয়ার যোগ্য নহি। বাস্তবিক কি তুমি আমাকে ক্ষমা করিতে পার?" নলিন বলিল, "পারি। আমি সমস্ত প্রাণের সঙ্গে তোমাকে ক্ষমা করিলাম। আমি আশা করি তুমি আর কখনও কুন্দের প্রতি রাগ প্রকাশ করিবে না।" ভূপাল বলিল, "কখনই না, আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি আজ প্রাতের এই ঘটনা আমার চিরকাল মনে থাকিবে।"

সেই দিন হইতে বাস্তবিক ভূপাল তাহার প্রতিজ্ঞা পালন করিয়াছিল; আর কখনও তাহার মুখ হইতে নলিন বা কুন্দের প্রতি কর্কশ কথা শুনা যায় নাই। তা ছাড়া অপরাপর বালক বালিকাদিগের প্রতিও সে আর কখন অভদ্র ব্যবহার করে নাই। সেই দিন হইতে সে ভাল হইতে লাগিল। কিছু দিন পরে ভূপাল তাহার খুড়ীমার নিকট হইতে মেলায় খরচ করিবার জন্য একটী সিকি পাইয়াছিল। তখন সে আর কিছু না কিনিয়া কুন্দের সেই ভগ্ন ভাণ্ডের মত আর একটী ভাঁড় কিনিতে সেই সিকি খরচ করিল। নলিন যে দেবনাথের সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে তাহার উপদেশ মত কার্য্য করিয়াছিল ইহা কি নলিনের পক্ষে ভাল হয় নাই? অবশ্যই হইয়াছিল। প্রতিহিংসা বা রাগ হইতে মুক্ত হওয়াই আমাদের কর্ত্তব্য। অপরে করুক না করুক আমরা যেন কখনও কর্ত্তব্য কার্য্য হইতে বিমুখ না হই।

(সখা আমরা এই প্রাপ্ত প্রবন্ধের ভাষা অনেক স্থানে বদলিয়া দিয়াছি। প্রবন্ধ-প্রেরকের প্রতি অনুরোধ, ভাষার দিকে এবং প্রবন্ধের আকারের দিকে একটু দৃষ্টি রাখেন। সখা-সম্পাদক।)

## ঠাকুরদাদার গল্প।

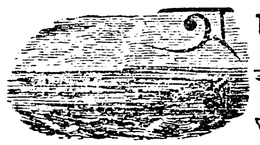

অদ্য আবার ঠাকুরদাদা নবীন বাবু বায়ুসেবনে আসিয়াছেন, তাঁহার প্রিয় পৌত্র দৌহিত্রগণও উৎসুক মনে সঙ্গে আসিয়াছেন ও অমূল্য, মন্মথ, চন্দ্রনাথ প্রভৃতি অনেকগুলি বালককে লইয়া আসিয়াছেন। কেন না ভাল ভাল কথা সকল শুনিতে হইলে একাকী না শুনিয়া অনেককে সঙ্গে করিয়া লইলে এককালে অনেকেরই উন্নতি হয়;—যেমন কোন ভাল সামগ্রী একা না খাইয়া প্রিয়বন্ধুদিগকে দিয়া খাইলে বেশী মিষ্ট লাগে, সেইরূপ ভাল কথাও অনেকে একত্রে শুনিলে ভাল হয়।

কিশোরী—সেদিনকার প্রশ্নটী পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিল "যত উপরে উঠা যায় ততই শীত অধিক ইহার কারণ কি?" নবীন বাবু বলিলেন, "এ বিষয়টী তত সহজ নহে, তোমরা সকলে স্থির ভাবে বসিয়া মনোযোগ দিয়া শ্রবণ কর। এটী বুঝিতে হইলে তোমাদিগকে আরও অনেকগুলি বিষয় বুঝিতে হইবে, সে গুলি এখন সহজভাবে বলিয়া যাই, অন্য সময়ে সে গুলিও এক একটী করিয়া বুঝাইব। প্রথমতঃ—তোমরা জান পৃথিবীর যে উত্তাপ আমরা অনুভব করি, সে সমস্তই সূর্য্য হইতে পাই;—সূর্য্যই আমাদের সমুদায় উত্তাপের মূল কারণ। আর এটীও জানিও যে সূর্য্য পৃথিবী হইতে প্রায় ৪ কোটী ৮০ লক্ষ ক্রোশ দূরে আছে।

সকলে:—উঃ! কি ভয়ানক দূরে!

নবী:—এখন শোন। তোমরা যদি একটী প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে হাত দেও তাহা হইলে তোমাদের হাত পুড়িয়া যাইবে; আর যদি সেই অগ্নির নিকট হাত রাখ তবে পুড়িবে না বটে কিন্তু ভয়ানক যাতনা হইবে এবং অধিকক্ষণ সে রূপে রাখিলেই হাতে ফোস্কা হইবে। কেমন? (সকলে:—হাঁ) নবী।—আবার যদি একটা লৌহের শিকের একটা দিক সেই আগুনে রাখিয়া কিছু পরে তাহার অপর দিকে হাত দাও তাহা হইলেও হাতে খুব আঘাত লাগে। (সকলে:—লাগে) বেশ কথা! এখন দেখিতেছি যে কোন একটী তেজোময় বস্তু হইতে উত্তাপ পাইবার এই তিন রকম উপায় আছে:—(১) ঐ বস্তুর "স্পর্শ" দ্বারা; (২) উহার সহিত যোগ না থাকিলেও "উত্তাপের ব্যাপ্তিগুণ" দ্বারা ও (৩) উহার সহিত কোন ধাতু নির্ম্মিত বা তদ্রূপ অন্য কোন বস্তুর এক দিক যোগ রাখিয়া অপর দিকের স্পর্শ দ্বারা। এই স্থানটী তোমাদের একটু কঠিন বোধ হইবে, কিন্তু মন দিয়া শুনিলে বেশ বুঝিতে পারিবে সন্দেহ নাই। যে কোন দ্রব্য হউক অগ্নিতে পড়িলে উত্তপ্ত হইয়া উঠে। কাষ্ঠ, বস্ত্র, কাগজ, যাহা ইচ্ছা, একটু অগ্নি সংলগ্ন হইলেই জ্বলিয়া উঠে। এটী প্রথম উপায়ের দ্বারা। আবার কোন গৃহের একটী কোণে একটী অগ্নিপাত্র রাখিয়া দিলে সে গৃহটী শীঘ্রই উত্তপ্ত হয়, আতযী নামে এক প্রকার পাথর আছে (কাচের ন্যায়) তাহার ভিতর দিয়া রৌদ্র টিকার উপর ফেলিলে ঐ টিকাতে আগুণ ধরে, অথচ টিকা ঐ পাথরে লাগে না, এ গুলি দ্বিতীয় উপায়ের দ্বারা। তাপের আধার যে অগ্নি তাহা হইতে চারিদিকে ঐ তাপ ব্যাপ্ত হইতেছে সুতরাং অগ্নি স্পর্শ না করিলেও নিকটে থাকিলে তাহার উত্তাপ বেশ অনুভব করা যায়।

অমূল্য:—কিন্তু একটু দূরে দাঁড়াইলেত আর তাপ পাওয়া যায় না।

মন্মথ:—হ্যাঁ, দাদামশাই। মা যখন রাঁধেন, তখন দেখিছি, আমি ঐ উনানের যত নিকটে থাকিব তত মুখে তাপ লাগে, আর যত সরিয়া যাই ততই কম তাপ লাগে।

নবী:—তাত হবেই। সব কাজেরইত সীমা আছে, তাপ ত আর অসীম দূর অবধি ছোটে না, যত দূরে যাইবে উত্তাপ ততই হ্রাস হইবে। আরও একটী কথা আছে। অগ্নি যদি ছোট হয় তাহা হইলে তাহার উত্তাপ তত অধিক দূর যায় না, অগ্নি বড় হইলে যত দূর যায়। মনে কর একটী প্রদীপের খুব নিকটে গেলেও হয়ত কোন তাপ পাওয়া যায় না, একটী পাত্রে কতকগুলা গুল্ পোড়াইলে সে পাত্রের তত নিকটে আর যাওয়া যায় না, আবার কতকগুলা শুষ্ক বৃক্ষপত্র রাশীকৃত করিয়া অগ্নি দিলে তাহার অনেক দূর পর্য্যন্ত উত্তপ্ত করে; তথাপি তাহারা নিকটে যত গরম, দূরে তত নহে; ক্রমে ক্রমে কম। সুতরাং বুঝা যাইতেছে দ্বিতীয় উপায়ে অর্থাৎ 'তাপব্যাপ্তি" দ্বারা পদার্থ সকল অগ্নিকে স্পর্শ না করিয়াও দূরে থাকিয়াও উত্তাপ পাইতে পারে,—যদি অগ্নি বেশ বড় হয়। তৃতীয় উপায়টীর নাম "তাপ পরিচালন"। ইহা দ্বারা দ্রব্যের এক ভাগে উত্তাপ লাগিলে ঐ তাপ পরিচালিত হইয়া উহার অপরাপর ভাগকেও তপ্ত করিয়া তুলে, যেমন লৌহের শিক। এটী বড় মজার গুণ। যেমন কতকগুলি বালক থাকে তাহাদিগের এক জনকে একটী কোন কথা বলিলে এক এক করিয়া ক্রমে সকলেই শুনে, সেইরূপ লৌহ, তাম্র, রৌপ্য প্রভৃতি কতকগুলি দ্রব্যের এমনি স্বভাব যে এক অংশে তাপ দিলে ক্রমে দূরস্থ অংশ গুলিও তপ্ত হইয়া উঠে, এই উত্তাপ চালনের শক্তি আছে বলিয়া এই সকল বস্তুকে "পরিচালক" কহে। আবার কতকগুলি বালক আছে তাহারা অতি সৎ পরের কথা লইয়া নাড়া চাড়া কানাকানি করে না, তাহারা নিজ কার্য্যে রত থাকে, কোন কথা কাহাকেও বলে না। সেই

রূপ কতকগুলি পদার্থ আছে তাহারা উক্ত প্রকারে এক অংশ হইতে অন্যাংশে তাপ চালিত করিতে পারে না, তাহাদিগকে "অপরিচালক" কহে, যথা কাচ, তুলা, পশম ইত্যাদি—।

চন্দ্র :—কাচের এক দিক তাতাইলে কি অপর দিক গরম হয় না? আচ্ছা আমি আজ বাড়ী গিয়া পরখ করিয়া দেখিব।

নবী : হাঁ! এইরূপে তোমরা যদি সকল বিষয় নিজে নিজে পরীক্ষা করিয়া দেখ তাহা হইলে পরে বিলক্ষণ উন্নতি করিতে পারিবে। সে যাহা হউক, এখন বল দেখি, সূর্য্য যে একটী প্রকাণ্ড তেজোময় পদার্থ আর আমাদের পৃথিবী যে ইহা হইতে উত্তাপ পায়—তাহা এই তিনটী উপায়ের কোন্‌টীর দ্বারা?

কিশো :—প্রথমটীর দ্বারাত নয়ই, কেন না সূর্য্যত পৃথিবীকে স্পর্শ করিয়া নাই। বোধ হয় দ্বিতীয়টীর দ্বারা, সূর্য্যের কিরণ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে ও এক দিকে পৃথিবীতেও আসে। কেমন, এই না?

অমূল্য :—কেন তৃতীয়টীও হয়ত। সূর্য্যের তাপে আকাশ তাতিয়া ঐ তাপ পরিচালিত হইয়া আমাদের কাছে আসে?

নবী :—না তা নহে, কিশোরীই ঠিক বলিয়াছে। সূর্য্যের তেজ সকল দিকে ছড়াইয়া পড়ে তাই "তাপব্যাপ্তি" দ্বারা পৃথিবীও তপ্ত হয়। আর এত ভয়ানক দূরে থাকিয়াও যে সূর্য্যের তেজ এত পাওয়া যায় তাহার কারণ সূর্য্য পৃথিবী অপেক্ষা প্রায় ১৪ লক্ষ গুণে বড়। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে অগ্নি যত বড় হইবে তেজ তত অধিক দূর অবধি ব্যাপ্ত হইবে। তাই এই দূরত্ব সত্ত্বেও সূর্য্যের প্রকাণ্ড আকার বলিয়া তাপের ব্যাঘাত হয় না। আর তৃতীয় উপায়টীত হইতেই পারে না, কারণ আকাশ কোন বস্তু নহে কেবল শূন্য মাত্র। পৃথিবী হইতে সূর্য্য পর্য্যন্ত এই যে বিস্তীর্ণ পথ ইহাতে কোন বস্তু নাই। সুতরাং আকাশকে পৃথিবীর অংশ বলা যায় না। বুঝিলেত? (সকলে; "হঁ।")

নবী :—এখন কেবল আর একটী কথা বুঝিলেই হয়। পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ হইতে উপর পর্য্যন্ত যে বায়ুরাশি দেখিতেছ, পণ্ডিতেরা প্রমাণ করিয়াছেন যে ইহা ২৫ ক্রোশের উপরে আর দেখা যায় না, সেখানে বায়ু নাই, আর যত উপরে উঠা যায়, বায়ু ততই পাতলা। সূর্য্যের তেজ পৃথিবীতে পঁহুছিবার পূর্ব্বে এই বায়ুরাশির মধ্য দিয়া আসিবে। সুতরাং সহজ বুদ্ধিতে উপরের বায়ু অগ্রে ও ক্রমে নিম্নের বায়ু উত্তপ্ত হইবারই কথা কিন্তু বাস্তবিক তাহা হয় না। কেন?—শ্রবণ কর। বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে কঠিন দ্রব্যের মত বায়ু "তাপব্যাপ্তি" দ্বারা উত্তপ্ত হয় না, কিম্বা অতি সামান্যই হয়। তাহা যদি না হইল, তাহা হইলেই বেশ দেখা গেল যে সূর্য্যের কিরণ এই বিস্তীর্ণ বায়ুমণ্ডল ভেদ করিয়া পৃথিবীতে আসিবার কালে ঐ বায়ুকে উত্তপ্ত করিতে পারে না। যেমন চিনির বলদ দোকান হইতে চিনির মোট বহিয়া আনে কিন্তু নিজে তাহার কোন স্বাদ পায় না, সেইরূপ বায়ু বোকা বেহারার ন্যায় সূর্য্যদেবের উত্তাপ ২৫ ক্রোশ পথ বহিয়া পৃথিবীকে আনিয়া দেয় অথচ নিজে তাহার একটুও তাপ পায় না, নিজে যেমন শীতল তেমনি থাকে। বুঝিলেত? (সকলে "হাঁ বেশ বুঝিলাম।")

কিশো :—আচ্ছা তা যদি হইল, তবে দুই প্রহরের সময় বাতাস এত আগুনের মত হয় কেন?

নবী :—তাহা বলিতেছি শোন। বায়ু তেজ আনিয়া পৃথিবীর পৃষ্ঠে দিল, ক্রমে যত বেলা হইতে লাগিল পৃথিবী ততই উত্তপ্ত হইয়া উঠিল আবার বায়ু বহিতে বহিতে সেই তপ্ত মাটী, রাস্তা বাড়ী প্রভৃতিতে ঠেকিয়া উত্তপ্ত হয়। এটী কিন্তু প্রথম উপায় দ্বারা তাহা যেন মনে থাকে; উষ্ণ পদার্থের "স্পর্শে" বায়ু তাপ গ্রহণ করিতে পারে কিন্তু "তাপব্যাপ্তি" দ্বারা পারে না। এজন্য দেখা যায়, যতক্ষণ মাটী না গরম হয় ততক্ষণ বায়ু তপ্ত হয় না কিন্তু বেলা ৯টার পর হইতে যতই মাটী, পথ, বাড়ী গরম হয় ততই বাতাস গরম হইতে থাকে। আর এক মজা দেখ, খুব রৌদ্রের সময় গঙ্গার মধ্যস্থলে নৌকায় বসিলে অনেকটা শীতল বায়ু ভোগ করা যায়। আবার পল্লীগ্রামে মধ্যাহ্নে রৌদ্রের যেরূপ তাপ কলিকাতায় তদপেক্ষা অনেক অধিক, তাহারও কারণ এই:—জল বা গাছ পালা তত শীঘ্র উত্তপ্ত হয় না, যত শীঘ্র রাস্তা বাড়ী. পাথরের টালী প্রভৃতি হয়।

এখন বোধ হয় বেশ বুঝিয়াছ যে বায়ুর উত্তাপ একেবারে সূর্য্যের উপর নির্ভর করে না, তবে কি? প্রথমে, বায়ু সূর্য্যের তেজ পৃথিবীকে আনিয়া দেয়, পরে তাহাতে পৃথিবী বেশ তপ্ত হইলে তবে তাহার স্পর্শে বায়ু আবার তপ্ত হইয়া উঠে। যেন বায়ু পৃথিবীর চাকর; চাকর একটী আম্র আনিয়া মনিবকে দিল, তিনি ইচ্ছামত খাইয়া পরে সেই উচ্ছিষ্ট আম্র একটু চাকরকে দিলেন। (বালকেরা হাসিয়া উঠিল।) সুতরাং ইহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে বায়ু যদি 'স্পর্শ' ভিন্ন উত্তাপ লাভ করিতে না পারে, এই ২৫ ক্রোশ উচ্চ বায়ুরাশির যে অংশ তপ্ত পৃথিবীর নিকটে থাকিয়া তাহাকে স্পর্শ করিতে পায়, তাহাই গরম হয়; কাজেই নীচের বায়ুই কেবল গরম হইতে পায়। একারণ নীচে হইতে যত উপরে উঠা যায়, ক্রমে ততই বায়ুর শীতলতা বেশ বোধ হয়। অবশেষে অধিক উচ্চে এত শীত যে সেখানে গেলে আমরা মারা যাই। এমন কি ২।৩ ক্রোশ উপরেই জল জমিয়া বরফ হইয়া থাকে। এই জন্যই সিমলা, দার্জ্জিলিং, নেপাল প্রভৃতি স্থান ভয়নাক গ্রীষ্মকালেও খুব শীতল। কে কেমন বুঝিলে বল?

কিশো:—দাদা, সেদিন অবধি কত লোককে একথাটী জিজ্ঞাসা করিয়াছি, কেহই ইহা এরূপ বুঝাইতে পারে নাই, এখন আমিই ১০০০ জন লোককে বুঝাইয়া দিতে পারি।

বিনয়—আমাকে এক জন বলিয়াছেন যে উপরে সূর্য্যের তাপ বাঁকা হয়ে পড়ে, ভাই! কিন্তু আমি তা বুঝিতে পারি নাই, আজ বেশ বুঝিলাম!

সকলে আনন্দ করিতে করিতে বাটী গেলেন। যাইবার সময় বিনয়কে মন্মথ বলিতেছে "দাদা দেখিলে তুমি যে সে দিন বল্‌ছিলে দাদামশাই হয়ত এবার বুঝাইতে পারিবেন না? ছি! ও রকম অশ্রদ্ধার কথা বলিও না।"



## বিশেষ বিজ্ঞাপন।

সখার পাঠকপাঠিকাদিগকে জানান যাইতেছে যে আমরা এবৎসর চিত্র বিষয়ে একটী পুরস্কার দিতে ইচ্ছা করিয়াছি। পাঠকপাঠিকাগণ যে কোন বিষয়ে চিত্র করিতে পারিবেন, কিন্তু তাহা অন্য কোন ছবি দেখিয়া নকল করা না হয়। আগামী ১৫ই আগষ্টের অর্থাৎ আর এক মাসের মধ্যে ছবিগুলি আমাদের এখানে পৌঁছান আবশ্যক। পেন্সিল বা রং যাঁহার যেরূপে ইচ্ছা চিত্র করিতে পারিবেন। ছবিগুলির সঙ্গে সঙ্গে প্রেরক বা প্রেরিকার নাম, ধাম, এবং বয়স লিখিতে হইবে, এবং শিক্ষক বা অভিভাবকের নিকট হইতে এই ভাবে লিখিয়া ঐ সঙ্গে পাঠাইতে হইবে যে, "এই বালক কিম্বা বালিকা কাহারও সাহায্য না লইয়া এই ছবিটী করিয়াছে।" আগষ্ট মাসের শেষে পুরস্কারটী দেওয়া যাইবে। আমরা আশা করি সখার পাঠকপাঠিকাদিগের মধ্যে যাঁহাদের একটুকুও চিত্র করিবার অভ্যাস আছে, তাঁহারাই এইবার চেষ্টা করিবেন।

'সখা' কার্য্যাধ্যক্ষ।
৫০ নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

## ওরে আমার পায়রা মণি।

ওরে আমার পায়রামণি কোথায় ছিলে এত বেলা ?
খাওয়া দাওয়া ভুলে গিয়ে কোথা গে ক'র্‌ছিলে খেলা ?
পেটের ভিতর পেট পড়েছে, মুখখানি শুকিয়ে গেছে,
এমন করে থাক্‌তে আছে
নাওয়ায় খাওয়ায় করে হেলা ?
জান না, মা বলেন আমায়
"খেলায় ভুলে খেলে বেলায়,
পিত্তি পড়ে অসুখ হবে দুঃখ পাবে কত,
কটু, কষা, তেত ওষুধ খাইয়ে দেবে কত !!"
আর কখন এমন ক'রে,
খাবার ফেলে খেলার তরে,
পিত্তি পড়ে থেকনাক অবোধ ছেলের মত !
তা হ'লে ধন ! দেখবে তখন ভালবাস্‌বো কত !
কত খাবার তোমার তরে, রেখেছি যে যত্ন করে,
দেখবে চল খাবে চল ক্ষিদে আছে যত ;
মটর, কলাই, চাউল, ছোলা,
রেখেছি ওই ভরে ডালা,
যা'চাও তাই দেব যাদু ! খাবে ক্ষিদের মত !
দু-পায় দুটী দেব ঘুঘুর, বাজবে কেমন ঝুনুর ঝুনুর,
আহ্লাদেতে নাচবে যখন "বাকুম বাকুম" ক'রে।
মায়ের কাছে দাঁড়িয়ে আমি দেখবো দু চোক ভরে !
আবার যদি এমন তর, খাবার খেতে বেলা কর,
দেখ তখন বকবো কত অবোধ ছেলে ব'লে !
আর দেব না আদর তোমায় নেবনা আর কোলে !!

## ধাঁধা।

পূর্ব্ববারের প্রশ্নগুলির উত্তর।

১। যদি সুস্থ হইয়া বাঁচিয়া থাকিতে হয়, যদি দশের প্রশংসাভাজন হইতে হয়, যদি প্রকৃত মনুষ্য নাম প্রার্থনীয় হয়, তবে শারীরিক, মানসিক সকল কার্য্যকেই ঈশ্বরের মনে করিয়া তাহাতে হস্তক্ষেপ করিও। ২। কলা। ৩। পৃথিবী। ৪। ছেলের বয়স, ৩৬ ; বাবার বয়স ৬৩ ; ঠাকুর্দ্দাদার বয়স ৮৪।

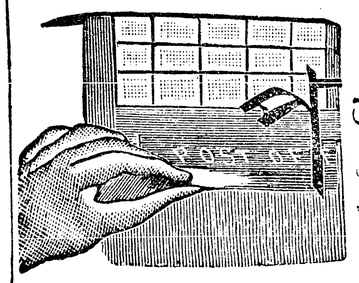

**ত্র প্রেরকদের প্রতি**—অনেকে আমাদিগকে পত্র লিখিয়া তাহার উত্তর চান ; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই আমরা সকল আবশ্যকীয় পত্রেরই উত্তর যথা সময়ে দিয়া উঠিতে পারি না ; তবে অনাবশ্যকীয় পত্রের কি উত্তর দিব ? যাঁহাদের পত্রোত্তর পাইবার নিতান্তই ইচ্ছা, তাহারা আপন আপন পত্রমধ্যে এক একখানা টিকিট বা পোষ্ট কার্ড পাঠাইবেন। অনেক বালক রচনা পাঠাইয়া তাহার সঙ্গে পত্র লিখিতে তাড়াতাড়ি ছাপাইবার অনুরোধ করেন, এবং ছাপান কেন হইবে না তাহার কারণ দেখাইতে বলেন। আমরা তদুত্তরে বলি যে আমরা অত অধিক অনুরোধ রক্ষা করিতে পারি না। পত্র প্রেরকগণ ছাপান না হইলেই জানিবেন, হয় স্থানাভাব না হয় মনোনীত নহে।

শ্রীকুঞ্জবিহারী ঘোষ, সিটী স্কুল—লিখিয়াছেন যে তাঁহাদের স্কুলে তৃতীয় শ্রেণী হইতে আরম্ভ করিয়া নীচের অনেক শ্রেণীর ছাত্রদিগকে লইয়া একটী সভা আছে। স্কুলের অধ্যক্ষগণের এই সভার প্রতি যত্ন আছে। এই সভার সভ্যেরা পদ্য মুখস্থ বলা, কথোপকথন অভিনয়ের ভাবে আবৃত্তি করা, চাঁদা তুলিয়া গরিবকে দান করা এবং রচনা ও অন্যান্য বিষয়ে পরীক্ষা করিয়া পুরস্কার দেওয়া এই সমস্ত কার্য্য করিয়া থাকেন। এতদ্ভিন্ন প্রত্যেক সপ্তাহে কোন না কোন বিষয়ে রচনা পাঠ ও উপদেশ পূর্ণ বক্তৃতা হয়। আমরা সকল স্কুলেই এইরূপ সভা হওয়া উচিত মনে করি।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে মুদ্রিত এবং ৫০নং সীতারামঘোষের ষ্ট্রীট, "সখা," কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

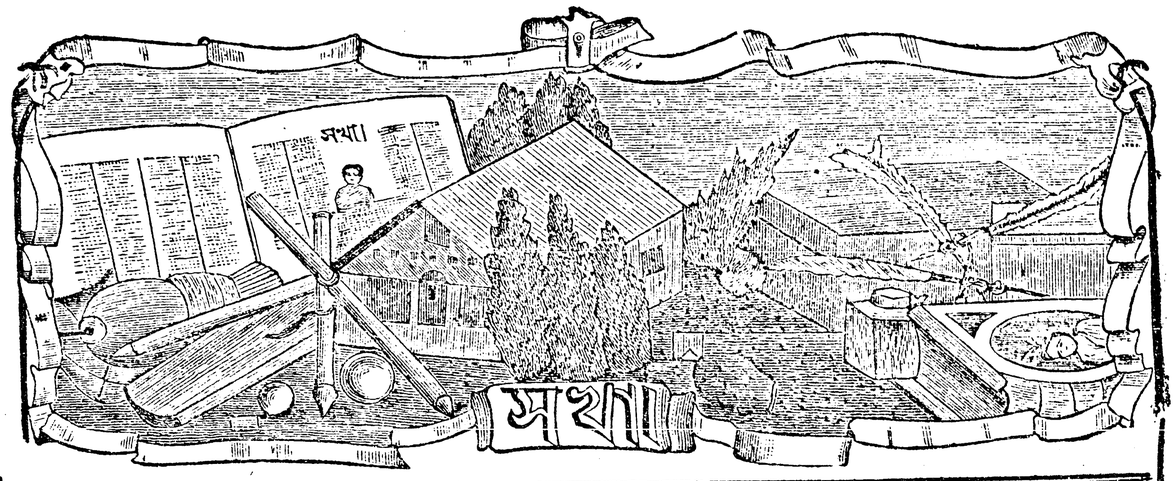


প্রথম ভাগ। আগষ্ট, ১৮৮৩। ৮ম সংখ্যা।

# ভীমের কপাল।

## ৯ম অধ্যায়।

এই বারে জগদীশ্বরের কৃপায়—ভীমেন্দ্র বিপ্রদাস বাবুর সহিত নিরাপদে বগুড়ায় পৌঁছিল। যতক্ষণ ভীমেন্দ্র গাড়ীতে ছিল সমস্ত সময়টা ভীমেন্দ্র কল্পনায় হরিপদ বাবুর ছেলেদের সহিত কথা বলিতেছিল এবং কখন এই কল্পনা কাজে ফলিবে, তাহাই ভাবিতে ছিল।—যথা-সময়ে ভীমেন্দ্র হরিপদ বাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হইল, এবং যতক্ষণ বিপ্রদাস বাবু জামাতার সহিত বাহিরবাড়ীতে আলাপ করিতেছিলেন, ভীমেন্দ্র ততক্ষণ 'খোকা' 'খোকা' করিয়া বাড়ীর মধ্যে ছুটিয়া গিয়া ছোট খোকাকে কোলে করিয়া বসিয়াছে। বাড়ীর সব ছেলেগুলি ভীমের সঙ্গে যুটিয়াছে—কেহ কাঁধে, কেহ কোলে, কেহ পিঠে—ভীমেন্দ্র ২ মিনিটের মধ্যে যেন ছেলে বিক্রীর দোকান খুলিয়াছে।—ভীমেন্দ্র এইরূপ সুখে কিছুকাল কাটাইয়া বসন্তবালাকে নিজের অবস্থার কথা বলিল। বসন্তবালা বলিলেন "তুমি কোথায় ছিলে তাহা জানিতাম না, তার জন্য বড় ব্যস্ত ছিলাম, কিন্তু তুমি সে রঙ্গপুর পর্য্যন্ত গিয়াছ, তাহা জানি, কারণ এখানকার মুন্‌সেফ বাবুর ভাইপোর যে গাড়ীতে যাবার কথা ছিল, তিনি গিয়া দেখিলেন—সে গাড়ী নাই—এক গাড়ীতে একটা বাক্স রহিয়াছে। তখন তিনি গাড়োয়ানকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'এ বাক্স কার ?' গাড়োয়ান বাবুর নাম করিয়া বলিল, তাঁহার। সে বাক্স আমরা পাইয়াছি।—তা, তুমি এসেছ, ভাল হয়েছে তোমার জন্য যে কত দুঃখ করিয়াছি বলিয়া শেষ করিতে পারি না, তুমি বাবার সঙ্গে আসিয়াছ, তবু সুখের কথা—তা না হলে, আবার হয়ত কোথায় গিয়া পড়িতে"—ভীমেন্দ্র এই শেষের কথা শুনিয়া লজ্জিত হইল—মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল আর অগ্রপশ্চাৎ না দেখিয়া কোন ও কাজে হাত দিব না।—ভীমেন্দ্র এইরূপে নানা কথায় সে দিন কাটাইল। আবার ভীমেন্দ্র বালকদিগের মনোরঞ্জন কার্য্যে নিযুক্ত হইল—একটী কথা এখনও বলা হয় নাই—হরিপদ বাবুর ছেলেরা স্কুলে যাইত না।—হরিপদ বাবু দেখিয়াছিলেন অনেক ভাল ছেলে স্কুলে গিয়া অসৎ ছেলেদের সঙ্গে মিশিয়া অসৎ-প্রকৃতি হইয়া গিয়াছে ; সুতরাং যতদিন ছেলেদের পরিপক্ক বুদ্ধি না হয়, যতদিন তাহারা ভালমন্দ বুঝিতে না পারে, ততদিন তাহাদিগকে বিদ্যালয়ে পাঠান

অন্যায়, হরিপদ বাবুর এই ধারণা ছিল; সুতরাং হরিপদ বাবুর ছেলেরা স্কুলে যাইত না। বসন্তবালা দেবী দ্বিপ্রহরে এবং সন্ধ্যাবেলা তাহাদিগকে শিক্ষা দিতেন; সময় হইলে হরিপদ বাবু ও এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন; কিন্তু সাধারণতঃ মাতার দ্বারাই এই কার্য্য সম্পন্ন হইত।—ভীমেন্দ্র ইতিপূর্ব্বে যতদিন এখানে ছিল ছেলেরা দাদাবাবুর কাছেই পড়িতে চাহিত; সুতরাং ভীমেন্দ্র যতদিন এখানে ছিল বসন্তবালা ছেলেদের পড়াইতে পারেন নাই, সমস্তই দাদাবাবু করিয়াছেন—আবার ভীমেন্দ্রের উপর সেই ভার পড়িল। আবার ছেলেরা 'দাদাবাবু' নহিলে আর কাহারও কাছে পড়িতে চায় না। ভীমেন্দ্রের উপর ছেলে পড়াইবার ভার পড়িল—তবে বসন্তবালা সাধারণ ভাবে এক একবার ছেলেদের দেখেন।—এইরূপে অনেক দিন এইখানে কাটিয়া গেল। ভীমেন্দ্র প্রায় ছমাস কলিকাতা হইতে দূরে রহিয়াছে—অবশেষে হরিপদ বাবু ভীমেন্দ্রকে কলিকাতায় পাঠাইবার উদ্যোগ করিলেন—আবার পূর্ব্বের ন্যায় বাক্সে পুরিয়া কাপড় ও খাবার দিলেন, এবং পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক পাথেয় দিলেন; কিন্তু যাহাতে গাড়ীতে ভুল না হয়, হরিপদ বাবু তদর্থে বিশেষ চেষ্টা করিলেন—সুতরাং এবারে কোনও গোল হইল না। আবার রাত্রিতে ছেলেদের ভুলাইয়া ভীমেন্দ্র গাড়ীতে উঠিল। ভীমেন্দ্র গাড়ীতে দেখিল—বাক্স আসিয়াছে কিনা—গাড়োয়ানের নাম জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিল, যাহার সহিত বন্দোবস্ত হইয়াছিল সেই গাড়োয়ান কিনা—তখন নিশ্চিন্ত মনে গাড়ীতে উঠিল কিন্তু উঠিয়াও পথ চলিতে চলিতে জিজ্ঞাসা করিল 'চৈতন্য গ্রাম যাইতে হইলে এই পথে যাইতে হয় কিনা'—'আমরা চৈতন্য গ্রামে যাইতেছি কিনা'—এই সকল বিষয়ে সন্তোষজনক খবর লইয়া ভীমেন্দ্র গাড়ীর ঝাঁকুনির মধ্যেও নিদ্রিত হইল।—অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত গাড়ী চলিল। ভীমেন্দ্র 'ছোট খোকা'কে স্বপ্ন দেখিতেছিল—দেখিতেছিল যেন 'ছোট খোকা' তাহার কাণ ধরিয়া টানিতেছে, এবং মুখের জল পেটে গড়াইয়া পড়িতেছে এই ভাবে দাঁড়াইয়া দাঁত-শূন্য মাড়ি খুলিয়া মনের সাধে হাসিতেছে।—ভীমেন্দ্রের এমন সুখের স্বপ্ন কে ভাঙ্গিল? গাড়োয়ান ভয়ানক ব্যস্তভাবে বলিল "বাবু, ও বাবু—শীগ্‌গির ওঠ!"—ভীমেন্দ্র উঠিল কিন্তু উঠিয়া ভালমন্দ কিছুই বুঝিতে পারিল না—দেখিল খানিকটা দূরে কতকগুলি আলো জ্বলিতেছে আর কতকগুলি প্রকাণ্ড মোটা লোক ভয়ানক চীৎকার করতঃ 'মার' 'মার' করিয়া ছুটিয়া আসিতেছে।—কাহারও কথা বলিবার সময় হইল না।—পলাইবার ও সময় হইল না। ডাকাইতের দল নিকটে আসিয়াই আলো নিবাইয়া দিল।—অন্ধকার রাত্রে যখন কে কোথায় লক্ষ্য রহিল না—তখন দলের মধ্যে ২।৩ জন গাড়ীর উপরে লাঠি মারিতে আরম্ভ করিল। ভীমেন্দ্র কাঁদিতে লাগিল, কিন্তু নিরুপায় ভাবিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল। গাড়োয়ান একটু জোর করিয়াছিল—কিন্তু ডাকাইতের সর্দ্দারের লাঠির ঘা মাথায় খাইয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িল। তখন দলের মধ্যে একজন হুকুম দিল—'আলো জ্বেলে দেখ্ কোন জিনিশ আছে কিনা।' আলো জ্বালা হইল।—দেখা গেল গাড়োয়ান রক্তময় শরীরে গাড়ীরপাশে পড়িয়া আছে।—গরু গুলি দড়ি ছিঁড়িয়া কোথায় গিয়াছে, তাহার খোঁজ নাই, আর একটী বালক গাড়ীর মধ্যে পড়িয়া রহিয়াছে। গাড়ীর মধ্য হইতে বাক্স বাহির করা হইল—তখন ভীমেন্দ্র বিপদে 'যাহা হয় হবে' ভাবিয়া জোর করিল। অমনি একজন তাহাকে ধাক্কা মারিয়া ফেলিয়া দিল আর একজন মাথায় লাঠি মারিল। ভীমেন্দ্র অচেতন হইল। হা জগদীশ্বর!—ভীমেন্দ্র আর কত কষ্ট



সহ্য করিবে? কবে ভীমেন্দ্র বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইবে? ভীমেন্দ্রকে বালক দেখিয়া একজন ডাকাতের দয়া হইল!—সে বলিল 'আহা বালক, একে অত শাস্তিকেন?' মেঘের ডাকের মত গলা চড়াইয়া একজন উত্তর করিল "কি! রঘুরামের কাজের উপর কথা? খবরদার!!"—রঘুরাম শিকদার ডাকাতের দলের সর্দ্দার; রঘো ডাকাতের নাম সে সময় কাহারও অজানা ছিল না, ইংলণ্ডে রবিন হুডের নামে যেমন ছেলেরা কাঁপিত, আমাদের দেশে রঘো ডাকাতের নামেও সেইরূপ ছেলেরা কাঁপিত। রঘো ডাকাতের এই তাড়না শুনিয়া কেহ কিছুই বলিতে সাহস করিল না। তখন সকলে মিলিয়া ভীমেন্দ্রকে বাঁধিল; বাক্স ভাঙ্গিয়া দেখিল খাবার রহিয়াছে—অট্ট হাস্য করিয়া খাবার গুলি খাইল; এবং টাকা ও কাপড় গ্রহণ করিয়া সম্মুখস্থ মাঠ পার হইয়া চলিয়া গেল। ভীমেন্দ্রকে কেন কাঁধে করিয়া লইয়া গেল তাহা ঈশ্বরই জানেন।

ক্রমশঃ—

---

## "না, আমি প্রতারণা করিব না"

আমাদের 'সখা'র পাঠকপাঠিকাগণকে নিম্নলিখিত বিষয়টী আমরা বিশেষ মনোযোগের সহিত দেখিতে অনুরোধ করি।

আমাদের কিরণবালার বয়স ৯ বৎসর মাত্র, তাহার দাদা নগেন ১৪ বৎসরের। কিরণ জুন মাসের "সখা" পড়িয়া তাহার ধাঁ ধা গুলির উত্তর লিখিয়া আমাদিগকে পাঠাইবে বলিয়া বসিয়াছে, এমন সময় নগেন তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল, বলিল "কি কচ্ছ, কিরণ?" কিরণ বলিল "দাদা অলকাসুন্দরী নামে এক সদাশয়া রমণী ১২ বৎসরের ন্যূন বয়সের বালিকার মধ্যে যে অধিক সংখ্যক হেঁয়ালির উত্তর ঠিক করিয়া দিতে পারিবে তাহাকে বৎসরান্তে ৫৲ টাকা পুরস্কার দিবেন বলিয়াছেন, তাই আমি চেষ্টা করিয়া দেখিতেছি কয়টী পারি—লিখিয়া পাঠাইব।" নগেন হাসিয়া নিকটে গিয়া বলিল "আয় আমি তোকে সব বলিয়া দিতেছি; আমি পরশু পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট সমস্ত বলিয়া লইয়াছি। বেশত তাহলে তুমিই ৫৲ টী টাকা পাইয়া যাইবে; কেমন?" কিরণবালা বিরক্ত হইয়া বলিল "ছি! ছি! দাদা! তোমার এমন মন্দ বুদ্ধি? পরের নিকট বলিয়া তাতে কি ফল হইল? তাহাত প্রতারণা হইল? আমি কি এমনি নীচ? না আমি প্রতারণা করিব না।" নগেন বলিল—"সখার লেখকত আর দেখিতে আসিতেছে না।" কিরণ আরও রাগিয়া বলিল নাই বা তিনি দেখিলেন, আমি নিজেত জানিতে পারিলাম যে কাজটা অন্যায়? সর্ব্বদর্শী ঈশ্বরত জানিলেন, তার চেয়ে কি সখার সম্পাদক? ছি দাদা! তুমি কি এই শিখিতেছ? এতে ৫৲ টাকা চুরি করাই হইল। আমি তাহা কখন পারিব না। কেন, টাকার অভাব কি? মাকে বলিলে এখনি ৫৲ টাকা লইতে পারি। কেবল ক্ষমতার পরীক্ষা ও উন্নতি বিধানের জন্যই না পারিতোষিক দেওয়া হইয়াছে? আর যদিই টাকার অভাব থাকে, তথাপি চরিত্রে এমন ভয়ানক দোষ পড়িয়া টাকা লওয়া কি ভাল? টাকা আগে না চরিত্র আগে? চল দেখি মার কাছে যাই,—তিনি কি বলেন শুনিবে?"

তখন নগেন একটু লজ্জিত হইয়া বলিল "তবে তুমি কি লিখিয়াছ দেখি?" কিরণ তাহাতেও সম্মত হইল না; বলিল "না আমি তাহাও করিব না। আমি তোমাকে দেখাই আর তুমি বল 'এইটা ভুল হইয়াছে' আবার আমি চেষ্টা করিয়া লিখিব। সেওত তোমার সাহায্য লওয়া হইবে। তাহাও

এই পুরস্কারের উদ্দেশ্য নহে। আমি তোমার সাহায্য লইব না। আমার নিজ বুদ্ধিতে যা আসে সাধ্য মত চেষ্টা করিব; যাহা পারিব, লিখিয়া পাঠাইব; তুমি যাও।"

তাহাদের পিতা অন্তরাল হইতে সমস্ত শ্রবণ করিয়াছিলেন; তিনি তৎক্ষণাৎ গৃহে প্রবেশ করিয়া কিরণকে কোলে লইয়া পরমানন্দে মুখ চুম্বন করিলেন ও ৫৲ টাকার একখানি নোট তখনি তাহার সাধুতার পুরস্কার স্বরূপ তাহার হস্তে দিলেন। সেই অবধি নগেনেরও জ্ঞান হইল। সে আর কখন ওরূপ কার্য্য করে নাই।

আমরা প্রার্থনা করি পরমেশ্বর "সখা"র প্রত্যেক পাঠক পাঠিকাকে এইরূপ চরিত্র বিষয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ করুন। তাঁহাদের জনক জননী ও অভিভাবকগণও যেন তাঁহাদের এই হিত ইচ্ছা বাড়াইতে যত্ন করেন, নতুবা বালক বালিকাদিগের চরিত্র-রত্ন চিরদিনের জন্য নষ্ট হইয়া যাইবেক।

---

## শিশু-স্বাস্থ্য-রক্ষা।

### তৃতীয় উপদেশ।

স্নান।

যদি শরীরে কোন অসুখ না থাকে, তবে প্রত্যহ স্নান করিবে। স্নানের কোন নির্দ্দিষ্ট সময় হইতে পারে না। যাঁহার যেরূপ অভ্যাস, তদনুসারে সময় নিরূপণ করিবে। অধিকাংশ লোক প্রায় ৯টা। ১০টার সময়ে স্নান করেন, এবং আমাদের বিবেচনায় ইহাই স্নানের উপযুক্ত সময়। তখন প্রাতঃকালের শীত কমিয়া আইসে, অধিক গ্রীষ্মও থাকেনা,—যে ঘর্ম্ম উৎপাদন করিবে। অনেকে প্রাতঃস্নান করিয়া থাকে, এ অভ্যাস মন্দ নহে। দুর্ব্বল শরীরে বিশেষ কাশীরোগ থাকিলে প্রাতে স্নান করা উচিত নহে।

স্নানের পূর্ব্বে যে তৈল মাখার নিয়ম আছে তাহা অতি উত্তম। ইহাতে চর্ম্ম মসৃণ থাকে, শরীর পোষিত হয়, ও লোমকূপ সকলের ক্রিয়া উত্তমরূপে সম্পন্ন হয়। স্নান সময়ে উত্তমরূপে শরীর মার্জ্জন করিবে। স্নানের পরে ভিজে কাপড় শীঘ্র পরিত্যাগ করিয়া শুষ্ক কাপড় পরিবে, এবং শরীরে যাহাতে জল না থাকে এরূপ করিয়া মুছিয়া ফেলিবে।

অনেকে শীতের ভয়ে স্নান করিতে চায়না, কিন্তু এ অভ্যাস অতি অনিষ্টকর। যদি শীতের অত্যন্ত আতিশয্য হয়, তবে উষ্ণজলে স্নান করিবে। কিন্তু অভ্যাস অনুসারে গরম জলে স্নান করা অনুচিত। অধিক বৃষ্টির দিনে জল দ্বারা শরীর মুছিয়া ফেলিবে এবং মস্তকে শীতল জল দিবে।

শরীর দুর্ব্বল থাকিলে অথবা জ্বরাদি রোগ হইতে আরোগ্য হইবার সময়ে গরমজলে স্নান করিবে। শর্দ্দি হইলে প্রথম দিবস স্নান বন্দ করিবে, পরদিবস গরম জলে স্নান করিবে কিন্তু শর্দ্দির অবস্থা তরুণ থাকিলে স্নান না করাই ভাল। শর্দ্দি পুরাতন হইলে স্নান করার কোন বাধা নাই।

স্নান করার পূর্ব্বে মস্তকে শীতল জল দেওয়া উচিত। সন্তরণ শিক্ষা করা সকলেরই কর্ত্তব্য, ইহা দ্বারা উত্তম ব্যায়াম হয়, এবং অনেক বিপদ আপদ সময়ে অনেক উপকার, কিন্তু ধীরভাবে সন্তরণ করিবে। বালকেরা যেরূপ দূর হইতে দৌড়িয়া আসিয়া মহাবেগে জলমধ্যে পতিত হয়, তাহা অতিশয় অনিষ্টকর, ইহাতে বক্ষে অত্যন্ত আঘাত লাগে, অথবা জলমধ্যে কোনরূপ গোঁজ বা খোঁটা থাকিলে তদ্দ্বারা প্রাণ সংশয় হইতে পারে অথবা হস্ত পদ ভগ্ন হইতে পারে। আহারের ঠিক পূর্ব্বে কি পরে স্নান না করিয়া আহারের অন্ততঃ দুই ঘণ্টা পূর্ব্বে স্নান করিবে। জলমধ্যে অত্যন্ত



অধিক সময় থাকা উচিত নহে। পরিশ্রমের অব্যবহিত পরেই ঘর্ম্মাক্ত শরীরে স্নান করিবে না, এরূপ করিলে অনেক পীড়া হয়।

---

### চতুর্থ উপদেশ।

ব্যায়াম।

চাষার হস্ত কেমন শক্ত, এবং পাল্কি বেহারার কাঁধ কেমন দৃঢ়, আবার বাবুর হস্ত কেমন কোমল, ও স্ত্রীলোকের শরীর কেমন নরম? ইহার কারণ কেহ বলিতে পার? চাষারা সর্ব্বদা হস্তদ্বারা কার্য্য করে, বেহারারা সর্ব্বদা কাঁধে পাল্কি বহন করে, এই জন্য ঐ সকল অঙ্গ এত দৃঢ়। বাবুর হস্ত শোভার জন্য, কার্য্য করে না—এই জন্য দুর্ব্বল ও কোমল, নারীজাতির শারীরিক পরিশ্রম কম, এই জন্য শরীর এত নরম। শরীরের যে অংশ চালনা করিবে সেই অংশ দৃঢ় ও সবল হইবে,—এই নিয়মানুসারে সমস্ত শরীর চালনা করিলে সমস্ত শরীর সবল হইবে—একথা সকলেই বুঝিতে পারে। কৃষকেরা পরিশ্রমী, সুতরাং তাহারা সবলশরীর; বড় লোকেরা বিলাসী ও অলস,—এই জন্য তাহারা দুর্ব্বল ও অল্পায়ু।

যদি বলবান হইতে চাও, নীরোগ হইতে ইচ্ছা থাকে, অনেকদিন বাঁচিতে চাও, তবে প্রত্যহ ব্যায়াম করিতে অভ্যাস করিবে। ব্যায়াম করিলে বক্ষ প্রশস্ত হয় ও নিশ্বাসের যন্ত্রের বল হয়, রক্তের জোর অধিক হয়, চর্ম্ম কোমল ও পরিষ্কার থাকে, সাহস ও মনের বল বৃদ্ধি হয়, পরিপাক শক্তি উত্তম হয়, হস্ত পদে বল হয়, সমস্ত শরীর নীরোগ, সতেজ ও সবল হয়—শরীর ও মনের অযথা কোমলতা দূর হয়। ফলতঃ শরীর ও মনের ইহার দ্বারা সকল প্রকার উন্নতি হয়।

এমন ব্যায়াম করিবে, যাহাতে সমস্ত শরীরেরই সঞ্চালন হয়। ভ্রমণ, ঘোড়ায় চড়া, দৌড়ান, সাঁতার দেওয়া, শারীরিক খেলা, কুস্তি প্রভৃতি নানাপ্রকারে ব্যায়াম করা যাইতে পারে। গান করা ও বাঁশী বাজানও একরূপ ব্যায়াম—এতদ্দ্বারা ফুস্‌ফুসের বল হয়। এমন কোন ব্যায়াম করিও না,—যাহা দ্বারা কোন বিপদ ঘটিতে পারে।

অপরিমিত ব্যায়াম করিলে ক্ষতি হয়। পরিশ্রমের পরে বিশ্রাম অতি আবশ্যক এবং পরিশ্রমের নিয়ম থাকা কর্ত্তব্য। খাদ্য সামগ্রীও এরূপ হওয়া উচিত যে, শরীর পোষণ করিতে পারে।

ক্রমশঃ—

---

## আমার কপাল মন্দ।

আমরা প্রায়ই দেখিতে পাই, যে বৃদ্ধ, যুবা, বালক, পুরুষ, স্ত্রী সকলেই যখন কাহারও অবস্থা ভাল দেখেন তখনই তাহার কপাল ভাল ও নিজের কপাল মন্দ বলিয়া চুপ করিয়া থাকেন। এই জন্য তাঁহারা জগদীশ্বরকে কতই নিন্দা করেন; তাঁহারা বলেন তিনি পক্ষপাতী। আবার যখন কেহ কোন কার্য্যে অকৃতকার্য্য হয়, তখন নিজের কার্য্যের ভুল বাহির করিতে না যাইয়া কপাল মন্দ বলিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকেন। এই "কপাল মন্দ" বাক্যটী ব্যবহার করিয়া অনেক বালক কোন কার্য্যে অকৃতকার্য্য হইয়াও সন্তুষ্ট থাকেন এবং অন্যের অবস্থা ভাল দেখিয়াও নিজের অবস্থা ভাল করিতে চেষ্টা করেন না। আমরা যাহার "কপাল মন্দ" তাহার কপাল কি করিয়া ভাল হয় তাহা সারদার উপদেশ হইতে জানিব।

এক দিবস সারদা ও তাঁহাদের গ্রামের একটী বালক সন্ধ্যার সময় বেড়াইতেছেন। বালকটীর নাম রাসবিহারী। রাসবিহারী বলিল:—

"ভাই! আজ চারি বৎসর হইল গোপালের সহিত একত্রে একই স্কুলে পাঠ করিতেছি। গোপাল প্রত্যহ গাড়ি চাপিয়া স্কুলে আইসে আবার গাড়ি চাপিয়া বাড়ী যায়। আমরা রৌদ্রের মধ্যে এক

মাইল হাটিয়া স্কুলে যাই আবার রৌদ্রের মধ্যে বাটীতে আসি। আবার দেখ তাহার কপাল কেমন ভাল—সে ভাল পুরস্কার পায়। ভাই! যাহার কপাল মন্দ তাহার কিছুই হয় না। না?"

সারদা—তুমি কি কোন দিন পুরস্কার লাভ করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছ?

রাসবিহারী—না ভাই। আমি প্রত্যেকবার পরীক্ষার একমাস পূর্ব্বে আমাদের পাড়ার গণকের নিকট পরীক্ষার কথা জিজ্ঞাসা করি। সে বলে যে আমি পরীক্ষায় বেশ করিব। কিন্তু সময়ে কিছুই হয় না।

সারদা—আমি গোপালকে বেশ জানি। তোমার মনের ভাব ও তাহার মনের ভাব এক নহে। তুমি ভবিষ্যৎ ফল জানিবার জন্য গণকের নিকট যাও, গোপাল তাহা করে না। সে জানে যে গণক নক্ষত্রের অবস্থা দেখিয়া মনুষ্যের ভবিষ্যৎ ফল বলে, কিন্তু তাহার নিকট মনুষ্যই তাহার নিজ নক্ষত্র সুতরাং সে জন্য গণকের নিকট যাইবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। মনুষ্যের নক্ষত্র কি? যখন দেখিব যে মনুষ্য পরিশ্রম করিতে কাতর নহে, যখন দেখিব যে মনুষ্য অধ্যবসায়ী, যখন দেখিব যে, তাহার ইচ্ছা সৎ, তখনই জানিলাম যে তাহার নক্ষত্র ভাল এবং তাহার ভবিষ্যৎ ফল নিশ্চয়ই ভাল হইবে। শ্রম, অধ্যবসায় এবং সৎ ইচ্ছাই যাহার নক্ষত্র তাহারই 'কপাল ভাল' হয়, আর যাহার নক্ষত্র কেবল গণকের পুস্তকে লিখিত তাহারই কপাল মন্দ তাহার আর সন্দেহ নাই। তুমি গণকের নিকট যাইয়া শুনিলে যে তোমার পরীক্ষার ভাল ফল হইবে অমনি তুমি নৃত্য করিতে করিতে বাটীতে আসিলে এবং পুস্তকের সহিত যে সম্বন্ধটুকু ছিল তাহা দূর করিলে! এদিকে দেখ গোপাল দেখিল যে তাহার নক্ষত্র তাহার নিজের শ্রম এবং অধ্যবসায়ের উপর নির্ভর করে সুতরাং সে পরিশ্রমের সহিত পাঠ করিতে লাগিল, অর্থাৎ পুস্তকের সহিত যে সম্বন্ধ ছিল তাহা আরও দৃঢ় করিয়া লইল। এক্ষণে বল দেখি পুরস্কার কে পাইবে?

রাস।—তুমি যাহা বলিলে, তাহা বুঝিলাম। তোমার কথা দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে গোপাল অতি নির্ব্বোধ। সে এত পরিশ্রম করিয়া পাঠ করিল, যদি ঘটনাক্রমে ব্যারাম হইয়া পুরস্কার না পায় তবে তাহার পরিশ্রম বৃথা হইল। আর পুরস্কার পাইবে এমনই বা কি কথা?

সারদা—এ প্রশ্ন তুমি জিজ্ঞাসা করিতে পার? ইহার উত্তর দিবার পূর্ব্বে আমি তোমাকে অন্য একটি কথা বলিব। কৃষক অতি যত্ন করিয়া ক্ষেত্র পরিষ্কার করিল; রৌদ্র বৃষ্টির মধ্যে কত কষ্ট সহ্য করতঃ সে চাস করিয়া বীজ বপন করিল। কৃষক কি এই সমুদয় কার্য্য করিবার সময় নিশ্চয় করিয়া জানিত যে সে অগ্রহায়ণ মাসের শেষে প্রচুর পরিমাণে শস্য আনিয়া গৃহে স্তূপাকার করিয়া রাখিবে? হইতে পারে অতিবৃষ্টি অথবা অনাবৃষ্টি বশতঃ তাহার শস্য নষ্ট হইল এবং তাহার পরিশ্রম বৃথা হইল। কিন্তু গোপাল পুরস্কার লাভের জন্য পরিশ্রম করিল; সে যদি পুরস্কার লাভ করিতে অক্ষম হয়, তবে যে বিদ্যা লাভ করিল তাহাই তাহার পরিশ্রমের উপযুক্ত পুরস্কার। সুতরাং পরিশ্রমের পুরস্কার হইবেই হইবে। মনে রাখিও

**"যে অলস সে দরিদ্র, যে পরিশ্রমী সে ধনী"** গোপাল গাড়ি চাপিয়া স্কুলে আইসে আর গাড়ী চাপিয়া বাড়ী যায় কি করিয়া? তাহার পিতা মাতা প্রভৃতি পরিশ্রমী ছিলেন তাই তাঁহারা পরিশ্রমের ফলে ধন পাইয়াছেন তাই আজ গোপালের সুখ। আবার দেখ গোপাল যে রকম পরিশ্রমী সেও সম্ভবতঃ কালে ধনী হইবে এবং তাহার সন্তান সন্ততিগণ সুখে দিন কাটাইবে, "কপালমন্দ" বলিয়া তুমি যদি এই প্রকার উৎসাহহীন হও, তোমার



সন্তানগণ তোমার ন্যায় গোপালের সন্তানদের অবস্থা দেখিয়া বিলাপ করিবে। শ্রমী যে ধনী হয় ইহার অর্থ কেবল টাকা সম্বন্ধে নহে, আরও অনেক আছে তাহা কালে বুঝিবে।

গোপাল যদি প্রথমবার পুরস্কার না পায়, তবে সে পরিশ্রম করিতে বিরত না হইয়া, বরং নূতন উৎসাহের সহিত কার্য্য করে। কোন কার্য্যে যদি প্রথম অকৃতকার্য্য হও তবে হাল ছাড়িয়া বসিয়া থাকিও না। "Try again" "পুনর্ব্বার চেষ্টা কর" এই নীতি বাক্যটী সর্ব্বদা মনে রাখিও। স্কটলাণ্ড দেশীয় কোন বীর পুরুষ স্বদেশ উদ্ধার করিবার জন্য একবার, দুইবার চেষ্টা করিলেন কিন্তু কৃতকার্য্য হইলেন না। এক দিবস তিনি বিষণ্ণ বদনে গৃহে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে দেখিতে পাইলেন যে একটী পোকা প্রাচীরের সর্ব্বোচ্চ স্থানে উঠিবার জন্য বার বার চেষ্টা করিতেছে কিন্তু পারিতেছে না। বীর পুরুষ প্রতিজ্ঞা করিলেন যে পোকা যদি তৃতীয়বারের চেষ্টায় সর্ব্বোচ্চ স্থানে উঠিতে পারে, তবে আমিও তৃতীয়বার চেষ্টা করিয়া দেখিব, যদি না পারি তবে জন্মের মত মাতৃভূমির নিকট বিদায় গ্রহণ করিব। পোকা তৃতীয়বার কৃতকার্য্য হইল। বীরপুরুষও তাঁহার প্রতিজ্ঞানুসারে তৃতীয়বার মাতৃভূমির উদ্ধারের জন্য যুদ্ধ করিলেন এবং কৃতকার্য্য হইলেন। তিনি পোকার নিকট হইতে যে মহৎ উপদেশ লাভ করিয়াছিলেন তজ্জন্য জগদীশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন।

রাসবিহারী! এখন দেখিতে পাইলে যে কপাল ভাল করিবার জন্য শ্রম এবং অধ্যবসায়ের আবশ্যক? কিন্তু আরও কয়টি বিষয়ের আবশ্যক আছে। ইউরোপীয় কোন সদাশয় ব্যক্তির নিকট হইতে যে সমুদায় উপদেশ পাইয়াছি, তাহা সংক্ষেপে বলিব। এই সমুদায় উপদেশ পালন করিও,—দেখিবে তোমার মন্দ কপাল শীঘ্রই ভাল হইবে এবং তুমিও কালে পুরস্কার পাইবে। উপদেশ গুলির মধ্যে এই কয়টী বিষয় নিতান্ত আবশ্যকীয়।

১। অতি ভোজন পরিত্যাগ কর।

২। যাহা দ্বারা নিজের বা অন্যের উপকার হইবে এইরূপ কথা কহিও। সামান্য গল্পাদি পরিত্যাগ কর।

৩। দ্রব্য সকল যথাস্থানে স্থাপন কর; প্রত্যেক কার্য্যকে উপযুক্ত সময় দাও।

৪। যে কার্য্য সম্পাদন করিবে বলিয়া ভাবিয়াছ তাহা করিতে প্রতিজ্ঞা কর। যাহা করিবে বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে বিরত হইও না।

৫। যাহা দ্বারা নিজের বা অন্যের উপকার হইবে এরূপ কার্য্যে অর্থব্যয় কর অর্থাৎ অপব্যয় করিওনা।

৬। বৃথা সময় নষ্ট করিওনা—কোন না কোন উপকারী কার্য্যে সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকিও। সমস্ত অনাবশ্যকীয় কার্য্য পরিত্যাগ কর।

৭। কাহাকেও প্রতারণা করিতে চেষ্টা করিও না। যাহার প্রতি যাহা কর্ত্তব্য তাহা করিতে আলস্য করিওনা।

৮। কোন কার্য্যের দাস হইও না।

৯। সর্ব্বদা নম্র হইবার জন্য চেষ্টা কর।

১০। মনে খারাপ চিন্তা আসিতে দিও না।

---

## প্রেরিত।

### দুটি প্রশ্ন। *

"সখা" সময়ে সময়ে নানাবিধ প্রশ্ন ও প্রহেলিকা প্রকাশ করেন। সখার সখাগণও তাহার উত্তর দিয়া থাকেন। আমাদের দুটী প্রশ্ন আছে,

*এইরূপ প্রশ্ন 'সখা'র পাঠক পাঠিকাদিগের না করিয়া, তাঁহাদের অভিভাবক দিগকে করিলেই ভাল হইত। স.স।

প্রহেলিকা নহে। ভরসা করি সখার পাঠকগণ তাহার যথোত্তর দিতে চেষ্টা করিবেন।

১ম। ঘুড়িসকলেই দেখিয়াছেন। ঘুড়ি উড়ান প্রচলিত নাই, পৃথিবীতে এমন দেশ আছে কি না জানি না। সখার পাঠক মাত্রেই ঘুড়ি না উড়াইয়া থাকিলেও অনেকেই তাহা করিয়াছেন সন্দেহ নাই। আমরা অনেক রকমের ঘুড়ি উড়াইয়াছি এবং উড়াইতে দেখিয়াছি। সচরাচর যে সকল ঘুড়ি উড়ান হয় তাহা ছাড়া সাপের মত, মানুষের মত এবং 'কিম্ভূত কিমাকার' অনেক ঘুড়িও উড়িতে দেখা গিয়াছে। কাঁঠাল, বাদাম, শাল, প্রভৃতি বৃক্ষ ও লতার পত্রও ঘুড়ির ন্যায় উড়ান যায়। বেশ করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে সকল প্রকার ঘুড়িই হয় চার-কোণা না হয় ডিমের অর্দ্ধেকের মত কিন্তু একেবারে ঠিক গোলাকার ঘুড়ি কেহ কখনও উড়াইয়াছেন? কি উড়িতে দেখিয়াছেন? প্রশ্ন হইতেছে—সম্পূর্ণ গোলাকার ঘুড়ি উড়ে কি না? যদি না উড়ে তাহার কারণ কি?

২য়। এ প্রশ্নটী আরও গুরুতর; ইহার ঠিক উত্তর হঠাৎ কেহ দিতে পারিবেন এরূপ আশা অতি অল্প। কারণ অনেক দেখিয়া এবং অনেক খোঁজ করিয়া, তবে এ বিষয়ে জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। এ প্রশ্নের উত্তর হঠাৎ প্রদান করিতে কাহাকে অনুরোধ করি না—উত্তর দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হইতে অনুরোধ করি। জিজ্ঞাস্য এই—পাখীর স্বাভাবিক মৃত্যু কি হয় না? অর্থাৎ মনুষ্য প্রভৃতির যেমন বয়োবৃদ্ধি সহকারে কেশ লোমাদি পাকে, দাঁত পড়িয়া যায়, মাংস ঝুলিয়া পড়ে, শরীর শুকাইয়া যায়, ভিতরের যন্ত্র খারাপ ও অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়, এবং শেষে ঘুমাইয়া পড়ার মত মরিয়া যায়, কেহ কোন পাখীকে সেইরূপ মরিতে দেখিয়াছেন কি না? পোষা পাখীর খারাপ আহারেতে যে মৃত্যু হয়, বা রোগে যে মৃত্যু হয় তাহার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি না। পাখীর স্বাভাবিক মৃত্যু হয় কি না, হইতে কেহ দেখিয়াছেন কি না, ইহাই আমার প্রশ্ন।

মনুষ্য ও পশু উর্দ্ধ সংখ্যায় কত জীবিত থাকে তাহা একরূপ ঠিক করা হইয়াছে। মনুষ্য ও কোন কোন পশুর আয়ু বিষয়ে বোধোদয়ের ছাত্রও উত্তর দিতে পারিবে। কিন্তু কাক কোকিল চীল প্রভৃতি পাখীর আয়ুঃকাল বিষয়ে পণ্ডিতগণের মুখেও কিছু শুনিতে পাই না। অধিক কি গৃহস্থ বাড়ীর পায়রা ও চড়াই কতকাল জীবিত থাকিয়া স্বভাবতঃ মরিয়া যায় তাহাও ঠিক জানা নাই। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা অনেক খোঁজ করিয়াও এ বিষয়ে বিশেষ কোন মতে আসিতে পারিয়াছেন এমন বোধ হয় না। আমরা লুই ফিগুওয়ারের "সরীসৃপ ও বিহঙ্গম" নামক পুস্তকের ইংরাজী অনুবাদ হইতে যে অংশ টুকু তুলিয়া দিলাম তাহাতেই বুঝা যাইবে যে আমাদের কথা ভুল নহে।

"The duration of the life of birds in a state of nature is one of those subjects on which little is known. Some ancient authors—Hesiod and Plini, for example,—give to the crow nine times the length of life allotted to man, and to the raven three times that period; in other words, the carrion crow, according to these authors attains to seven hundred and twenty years, and the raven two hundred and forty. The swan, on the same authority, lives two hundred years. This longevity is more than doubtful,"—Vide p. 203.

বাস্তবিক এ সম্বন্ধে কেহই নিশ্চিত ভাবে কিছু বলিতে পারেন না। আমরা হঠাৎ ব্যারামে, পোষার দোষে, কি অন্য কোন দৈবকারণ ভিন্ন পাখীর স্বাভাবিক মৃত্যু কোথাও কখন দেখি নাই এবং খুঁজিয়া কাহার নিকট জানিতে পারি নাই। তাই আমাদের প্রশ্ন হইতেছে "পাখীর স্বাভাবিক মৃত্যু হয় কি না?"



মান্যবর শ্রীযুক্ত "সখা" সম্পাদক মহাশয়
সমীপেষু।

মহাশয়!

আমার এ ক্ষুদ্র পত্রখানি যদি "সখা"তে একটু স্থান দেন, তবে আমার ন্যায় অনেক পল্লীগ্রামস্থ বালকের বিশেষ উপকার হয়, আমিও আপনার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিব।

সম্প্রতি আমি একদা আমার একজন বন্ধুর সহিত হুগলী কলেজের পুস্তকালয়ে যাই। সেখানে গিয়া যে কি দেখিলাম তাহা প্রকাশ করিতে পারি না। সারি সারি প্রায় ৪০।৫০টী বড় বড় আলমারি পুস্তকে পূর্ণ! কত শত সাহিত্য পুস্তক, কত উপন্যাস, কত ইতিহাস, কত শত লোকের জীবন বৃত্তান্ত, কত শত লোকের ভ্রমণবিবরণ, কত সহস্র সহস্র পুস্তক দেখিয়া আমার যেন মস্তক ঘুরিয়া গেল। আমি ইহার পূর্ব্বে কখন এত পুস্তক দেখি নাই। আমি মনে করিতাম বাঙ্গালায় খানকতক ও ইংরেজীতে খানকতক বৈ পড়িলেই বুঝি পড়া শেষ হইল। কি ভয়ানক! ইংরাজী, ফ্রেঞ্চ, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত ভাষার অভিধানই যে কত দেখিলাম তাহা বলিতে পারিনা। নানাবিধ জীব জন্তুর ছবি যে কত, নানা স্থানের সুন্দর সুন্দর দৃশ্য, নানা দেশীয় বিখ্যাত লোকদিগের প্রতিমূর্ত্তি প্রভৃতি যে কত তাহার সংখ্যা নাই। উঃ! এক একটী দেশের ইতিহাস অমনি এক এক আলমারি পোরা। বিজ্ঞানের পুস্তকই যে কত দেখিলাম তাহা বলিতে পারিনা। সকলের নামের অর্থও জানিনা! ধর্ম্ম-পুস্তকই বা কত! চারিদিকে রাশি রাশি পুস্তকের মধ্যে থাকিয়া যেন আমার কি বোধ হইতে লাগিল। এত বৈ আছে জানিয়া বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে হতাশ হইলাম। আমাদের ক্লাশে আমি একজন উত্তম বালক, সে অহঙ্কার চূর্ণ হইয়া গেল। হতাশ হইয়া একখানি চেয়ারে বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম, এত বৈ কি পড়িতে পারিব? কতই শিখিতে এখনও বাকী আছে? আমিত তেমন ভাবে সময়ের ব্যবহার করিনা তবে কিরূপে এত বৈ পড়িব? আমার একখানি বৈ শেষ করিতে যদি একমাস লাগে তাহা হইলেও আমার জীবনে এত বৈ পড়িতে পারি না। তবে উপায় কি?

এইরূপে ভাবিতে ভাবিতে মনে হইল এই যে এক একজন গ্রন্থকর্ত্তা ২০।২৫।৫০।১০০ খানা করিয়া বৈ লিখিয়া গিয়াছেন, ইহাঁরাও ত আমার মত ছিলেন, তবে আমি কেন হতাশ হই? উৎসাহ ও চেষ্টার সহিত পড়িতে আরম্ভ করিব, সময়ের রীতিমত ব্যবহার করিব; তাহা হইলেই কৃতকার্য্য হইব সন্দেহ নাই। মনে আশা হইতে লাগিল। সেই অবধি যখনি আলস্য আসে তখনি ঐ পুস্তকরাশির কথা মনে করিয়া শতগুণ উদ্যমের সহিত পরিশ্রম করিতে ইচ্ছা হয়।

সেই অবধি আমি যেন আর একটী পৃথিবীতে বেড়াইতেছি। পড়িবার এত আছে জানিতামনা, চেষ্টার সাধ্য এতদূর তাহা জানিতাম না। এখন আমার পড়া খুব আমোদের ও সুখের কার্য্য বোধ হইয়াছে, আর কোন বিষয়ে আমার তত সুখ, তত আনন্দ ও তত ভরসা হয়না। আমি এখন খুব পরিশ্রম করিতে পারি। সেই অসংখ্য গ্রন্থকর্ত্তারা যেন সর্ব্বদাই আমার সঙ্গে থাকিয়া আমাকে উৎসাহ দেন। এত সুখ, এত আশা যাহাতে আমার বন্ধুগণ সকলেই দেখিতে পান, এই অভিপ্রায়ে আপনার নিকট এই পত্র পাঠাইতেছি। ইহাতে 'সখা'র পাঠক পাঠিকা মাত্রকেই অনুরোধ করি যেন তাঁহারা একবার কোন বড় পুস্তকাগার দেখিতে যান।

আপনার একান্ত স্নেহের—শ্রীঃ—

# ঠাকুরদাদার গল্প।

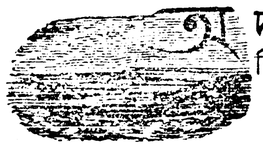

অদ্য ঠাকুরদাদা নবীন বাবু প্রিয় বালকদিগকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার পুষ্পোদ্যানে বেড়াইতে আসিয়াছেন। গোলাপ, মল্লিকা, জুঁই, গন্ধরাজ, রজনীগন্ধা প্রভৃতি নানাবিধ পুষ্প বৃক্ষে বাগানটী সুশোভিত। চারিদিকে সুন্দর মেদী গাছের বেড়া। মধ্যে মধ্যে সবুজ কামিনী বৃক্ষের পাঁতাগুলি তিনি স্বহস্তে কাঁচী দিয়া কাটিয়া দিয়াছেন, পাতাগুলি স্তরে স্তরে সাজিয়া কেমন শোভাই ধারণ করিয়াছে, ঐ সবুজবর্ণ পত্রগুলির উপরে ও মধ্যে মধ্যে পরিষ্কার শ্বেতকুসুম কি সৌন্দর্য্য বিস্তার করিয়াছে! বাগানের মধ্যস্থলে একটী বিলাতী ঝাউগাছ কেমন সূক্ষ্ম চূড়া তুলিয়া যেন পাহারা দিতেছে। চারি দিকে মৌমাছি সকল ফুলের মধু আহরণে নিযুক্ত রহিয়াছে। অপরাহ্নে উদ্যানের অতি সুন্দর শোভা হইয়াছে—গাছ গুলি সব যেন হাসিতেছে। কিশোরী, বিনয় ও অন্যান্য বালকগণের যত্নে গাছগুলির একটুও হানি হইতে পায় না। তাহারা সকলেই প্রিয়তম ঠাকুরদাদার সঙ্গে প্রত্যহ উদ্যানে আসিয়া গাছগুলিতে জল দেওয়া, গোড়া খুঁড়িয়া দেওয়া, ঘাস তোলা প্রভৃতি নানাবিধ প্রকারে বাগানটীর যত্ন করে ও গাছগুলিকে যেন আপনাদের ভ্রাতার মত স্নেহ করে। এরূপ করাতে তাহাদের আরও একটী উপকার হয়। সমস্ত দিবসের লেখাপড়ার পর এইরূপ শারীরিক শ্রম করাতে আনন্দে ও স্ফূর্ত্তিতে তাহাদের শরীর সুস্থ ও সবল থাকে ও রাত্রিতে আবার পাঠাভ্যাস করিতে বিশেষ ইচ্ছা জন্মে ও তৎপরে অতি সুনিদ্রা হইয়া আহারীয় সামগ্রী সকল উত্তমরূপে পরিপাক হয়। এই সকল উপকার পায় বলিয়া এক দিনও তাহারা বিকালে স্বকার্য্য বিস্মৃত হয় না।

আজিকার বাগানের কার্য্য শেষ হইলে নবীন বাবু সকলকে চারি দিকে লইয়া সুন্দর সবুজ মখমলের ন্যায় ঘাসের উপর বসিয়া গল্প করিতে আরম্ভ করিলেন। চন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন "দাদা মহাশয়! আমরা যে বোধোদয়ে পড়িয়াছি 'পদার্থ তিন প্রকার চেতন, অচেতন, ও উদ্ভিদ,' আমার তাহাতে একটু কথা আছে। আমি বলি পদার্থ দুই প্রকার বলিলেই ঠিক হইত। আমার বোধ হয় যাহাদিগকে উদ্ভিদ্ বলা হইয়াছে, তাহারাও চেতন পদার্থ। নয় কি?"

মন্মথঃ—তা কিরূপে হইবে? বৃক্ষদের ত চেতনা নাই, তাহারা ত ইচ্ছামত যেখানে সেখানে যাইতে পারে না, তাহারা কথা কহিতেও পারে না। তাহাদের যেখানে পুতিয়া দেওয়া যায় সেখানেই থাকে।

অমূল্যঃ—তবে ত মাছেরাও চেতন পদার্থ নয়। তাহারাও ইচ্ছামত যথা তথা যাইতে পারে না, কথা কহিতে পারে না, একটী পুকুরেই চিরকাল থাকে? তাত নয়। আমারও বিবেচনায় বৃক্ষ সকল চেতন পদার্থ, মৎস্য যদি চেতন হয় তবে বৃক্ষ লতাদিরাও চেতন নিশ্চিত। কিশোরীরও এই মত ছিল। মন্মথ ও বিনয় বলিল "তা কেন হইবে? মাছেরাত সেই জলাশয়ের যেখানে ইচ্ছা যাইতে পারে, মাছেদের ডিম ও ছানা হয়, তাহারা ডাকিতেও পারে। মাছ ও বৃক্ষ লতার তুলনা হয় না।" নলিন বালক, কোন পক্ষে না যোগ দিয়া ঠাকুরদাদার মুখেরদিকে চাহিয়া রহিল; তখন কিশোরী বলিল "সেরূপ ত বৃক্ষদের ও শিকড় আছে—ঐ শিকড় মাটীর চারি দিকে ছড়াইয়া যে দিকে ইচ্ছা যাইতে পারে, আমি দেখিয়াছি হরিমোহন দের বাটীর সম্মুখের অশ্বত্থ গাছের শিকড় অনেক দূর অবধি গিয়াছে। আর আমি বলিতে পারি লতাদের জ্ঞান আছে, কেন না, আমাদের বাড়ীতে একটী লাউ গাছ আছে তাহার আঁকড়া গুলি সব এক একটী কঞ্চিতে জড়াইয়া থাকে। আমি এক দিন একটা আঁকড়ার সম্মুখ হইতে সমস্ত কঞ্চি সরাইয়া এদিকে রাখিয়াছিলাম। তার পর দিন দেখি সে আঁকড়টা মুখ ফিরাইয়া সেই পশ্চাৎ দিকে আসিয়াছে ও একটা কঞ্চিকে জড়াইয়া ধরিয়াছে; সেই অবধি আমি যে কি আশ্চর্য্য হইয়াছি তাহা বলিতে পারি না। আর সেই অবধি আমার বোধ হইয়াছে পরমেশ্বর কেবল মনুষ্যকেই বুদ্ধি দেন নাই, লতাগুলিকে পর্য্যন্ত শিখাইয়াছেন।"



এবারে আর মন্মথ ও বিনয় কোন কথা বলিতে না পারায় সন্দেহ মিটাইবার আশায় ঠাকুরদাদার মুখের দিকে তাকাইলেন। কিশোরীর এত অল্প বয়সে এরূপ খোঁজ করিবার ইচ্ছা ও ঈশ্বরের ভক্তি দেখিয়া তাঁহার মন গলিয়া গিয়াছিল, তাঁহার চক্ষে জল আসিতেছিল। তিনি কিশোরীর মুখ চুম্বন করিয়া সকলকে আদর করিয়া বলিলেন:—"জ্ঞানী হইবার এইই উপায়। পুস্তকে যে কিছু লেখা থাকে তাহাই সত্য বলিয়া গ্রহণ না করিয়া তদ্বিষয়ে চিন্তা ও বিবেচনা করিয়া পরে কি সত্য তাহা স্থির করিতে হয়, ইহাই নিয়ম ও তদ্রূপ করিলেই জ্ঞান রত্ন লাভ করিয়া ভবিষ্যতে সুখী হইতে ও যশোলাভ করিতে পারা যায়।

কতকগুলি বস্তুকে শ্রেণীবদ্ধ করিবার সময় এমন গুণ গুলিকে জাতি বিভাগ করিবার জন্য লইতে হয় যাহার একটী ও ভিন্ন জাতিতে পাওয়া যায় না। স্বর্ণ ও রৌপ্য বিভিন্ন জাতীয় ধাতু, কেন না এই উভয়ের বর্ণ, শব্দ, ভার প্রভৃতি অনেকগুলি গুণ সম্পূর্ণ বিভিন্ন; সেইরূপ চেতন ও অচেতনে এত প্রভেদ কখন একটী অন্যটীতে ভুল হয় না, কিন্তু এই যে গোলযোগ তোমরা বাহির করিয়াছ এটী বড় সহজ নহে। কেন না কোন কোন জন্তু এমনি নিশ্চল ও জড়বৎ যে তাহাদিগকে চেতন বলা যায় না, বৃক্ষ লতাদি এমনি সতেজ ও জীবিত যে সহসা তাহাদিগকে চেতন বলিয়া বোধ হয়। মনে কর পুরুভুজ নামক বৃক্ষের একটী অঙ্গ ছেদন করিলে তৎক্ষণাৎ সেই ছিন্ন অংশ আবার একটী নূতন বৃক্ষ হইয়া উঠে; তোমরা এতক্ষণ লতার বুদ্ধি প্রভৃতির কথা বলিতেছ এ সকল দেখিলে হঠাৎ প্রাণী বোধ হয়। বাস্তবিক পণ্ডিতেরা এ পর্য্যন্ত চেতন অচেতন ও উদ্ভিদের একটী সীমা রেখা দেখাইতে পারেন নাই। তবে যে গুলির প্রভেদ সুস্পষ্ট দেখা যায় তাহাদিগকেই জাতি বিভাগ করিয়া ছোট ছোট বালকদিগকে বুঝান বোধোদয়ের উদ্দেশ্য। নতুবা জন্তুদের যাহা যাহা আছে বৃক্ষলতাদিরও প্রায় তাহা সমস্ত আছে। জন্তুরা অনেকেই মুখ দ্বারা আহার করে, নানা প্রকার পুষ্টিকর সামগ্রী মুখদিয়া শরীরের মধ্যে গ্রহণ করে, পিপাসার সময়ে জল পান করে, মুখই জীবের প্রধান সহায়। ঐ সকল সামগ্রী পেটের মধ্যে গিয়া ক্রমে ক্রমে হজম হইতে থাকে; এইরূপে পরিপাক হইয়া সার অংশটুকু শরীরের পুষ্টি করিবার জন্য রক্ত হইয়া যায়, অসার ভাগগুলি মল মূত্রাদি ও ঘর্ম্মাদি আকারে বাহির হইয়া যায়। উদ্ভিদ্দিগেরও এইরূপ আহার-শক্তি আছে। তাহারাও শিকড় দিয়া আহার করে। শিকড়গুলির ভিতরে সূক্ষ্ম ছিদ্র আছে, ঐ ছিদ্রের মধ্য দিয়া আহারীয় সামগ্রী সকল মৃত্তিকা হইতে টানিয়া লয় ও তদ্দ্বারাই জীবন ধারণ করে। কাটিয়া ফেলিলেই গাছ মরিয়া যায়,—যেমন আহার না পাইলে আমরা বাঁচি না। সুতরাং দেখা গেল বৃক্ষ সকল যে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে কোথাও যায় না, নড়ে না, তাহার কারণ, তাহাদের আবশ্যক নাই, তাহারা এক স্থানেই চিরকাল আহারীয় দ্রব্য প্রাপ্ত হয় ও তথায় থাকে। কিন্তু একস্থানে চিরকাল থাকে বলিয়াই যে তাহারা 'চেতন' এই দলের বাহিরে তাহা বলা যায় না, কেন

না প্রাণীদের মধ্যেও এমন অনেক আছে যাহারা কখন এক স্থান ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যায় না।

আবার দেখ, আমরা যেমন শ্বাস প্রশ্বাস ফেলি, বিশুদ্ধ বায়ু নাসিকাদ্বারা টানিয়া লই ও দূষিত বায়ু ফেলিয়া দিই, বৃক্ষেরাও তদ্রূপ করে, ইহাদেরও শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া আছে। আমাদের একটী নাসিকা,—ইহাদের নাসিকা অনেক। প্রত্যেক পত্রই এক একটী নাসিকা। আমরা বায়ু হইতে 'অম্লজান' নামে এক প্রকার আবশ্যকীয় পদার্থ টানিয়া লইয়া অবশিষ্ট অংশটা দূষিত করিয়া ছাড়িয়া বায়ুতে দিই। বৃক্ষের সবুজ পত্রেরা রবিকিরণের সাহায্যে সেই দূষিত বায়ুকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ঐ দূষিত পদার্থের মধ্য হইতে "কার্বন" অর্থাৎ অঙ্গার ভাগ নিজেরা গ্রহণ করে ও অম্লজান ছাড়িয়া দেয়। এই অঙ্গার তাহাদের শরীরের পক্ষে অত্যন্ত আবশ্যকীয় পদার্থ। সুতরাং দেখিলে বৃক্ষ সকল আমাদের ন্যায় নিশ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়াও সম্পন্ন করিয়া থাকে, তবে আমরা অম্লজান বাষ্প গ্রহণ করি—অঙ্গার ছাড়িয়া দিই, ইহারা ঠিক তাহার বিপরীত করে—অঙ্গার গ্রহণ করিয়া অম্লজান ছাড়িয়া দেয়। কিন্তু সে জন্য ভিন্ন জাতি বলিয়া বিভক্ত হইতে পারে না, কেননা অনেক প্রাণীও সেরূপ যাহার যে বস্তু আবশ্যক, বায়ু হইতে গ্রহণ করে—সকলে সমান লয়না।

তারপর দেখ, আমাদের শরীর চারি প্রকার সামগ্রীতে প্রধানতঃ গঠিত:—অস্থি, মাংস, ত্বক (অর্থাৎ ছাল) ও রক্ত। অস্থি দেহের মূলাধার, মাংস রক্তপরিচালনের ও অন্যান্য উপকারের জন্য, ত্বক্ সেই সকলকে আবরণ করিয়া রক্ষা করে, ও রক্ত সমস্ত শরীরে পরিচালিত হইয়া জীবন বজায় রাখে। বৃক্ষদের ও এ সমস্ত আছে। উপরেই যেটী দেখা যায় সেটী ত্বক বা ছাল, ইহার দ্বারা বৃক্ষের ভিতরস্থ আবশ্যকীয় সামগ্রীগুলি নষ্ট হইতে পায় না। তাহার নীচেই কোমল এক প্রকার বস্তু তাহাকে বৃক্ষের মাংস বলা যায়! ইহারই ভিতর দিয়া পুষ্টিকর পদার্থ সকল বৃক্ষের সর্ব্বাংশে সঞ্চালিত হয়। গাছের রস আছে জান?—তাহাই উহাদের রক্তের কার্য্য করে। ইহা মিথ্যা কথা নহে; বাস্তবিকই পৃথিবী হইতে সকল দরকারী বস্তু আহার করিয়া এই রসটাই বৃক্ষের শিকড়েরা উপরে পাঠাইয়া দেয় ও ইহাই বৃক্ষের বাঁচিবার এক মাত্র কারণ। গাছেদের আমাদের মত অস্থি আছে তাহা বোধ হয় সকলেই জান, তাহাদের সারভাগ যেটী, যাহা শুকাইয়া কঠিন হয় ও স্থায়ী হয়, সেই কাষ্ঠের সারাংশটীই বৃক্ষের হাড়। কোন বৃক্ষের পাতা অনেক দিন জলে পড়িয়া থাকিলে পরে শুষ্ক হইলে দেখা যায়, মাংস ও ত্বক্ নষ্ট হইয়া গিয়াছে, কেবল সরু সরু কঠিন কতকগুলি শির আছে, সে গুলি পত্রের হাড়; সেইরূপ সকল বৃক্ষেরই অস্থি আছে। সুতরাং দেখা গেল বৃক্ষের রক্ত মাংস, ত্বক্ ও অস্থি আমাদের ন্যায় সমস্তই আছে।

তবে আমাদের ন্যায় ইহাদের সকল ইন্দ্রিয় নাই। ইহারা দেখিতে পায় না, শুনিতে পায় না আস্বাদন পায় না, ঘ্রাণ পায় না, কিন্তু স্পর্শেন্দ্রিয় ইহাদের আছে। লজ্জাবতী লতার পাতায় হাত দিবামাত্র অমনি সঙ্কুচিত হয়। আবার আমেরিকায় এক প্রকার মাংসাশী বৃক্ষ আছে, তাহাদের পাতায় মাছি বা অন্য কোন ছোট প্রাণী বসিলে অমনি পাতা কুঁকড়াইয়া গিয়া জন্তুটীকে ধরিয়া ফেলে ও ক্ষণেক পরে একেবারে খাইয়া ফেলে। উদ্ভিদেরা জন্তুদের মত কথা কহিতে বা ডাকিতে পারে না। আর ইহাদের ডিম ও ছানা হয় না সত্য, কিন্তু ইহাদেরও দল বাড়াইবার প্রণালী অতি চমৎকার। আজি আর সময় নাই। রাত্রি হইয়াছে। চল বাড়ী যাই,—আর এক দিন বলিব। কিন্তু এ কথাটী যেন চিরকাল স্মরণ থাকে যে নিজেরা চেষ্টা করিয়া যাহা শিক্ষা করিবে, আপনারা পরীক্ষা করিয়া যাহা জানিতে পারিবে, তদপেক্ষা আর মূল্যবান জ্ঞান নাই। সর্ব্বদা চিন্তা করিবে, মন দিয়া চতুর্দ্দিকের পদার্থ সকলের গুণাগুণ ও কার্য্যপ্রণালী বেশ করিয়া দেখিবে, তাহা হইলেই শীঘ্র নানা মহামূল্য জ্ঞান লাভে সমর্থ হইবে। বিশ্বপতির সৃষ্ট এই জগতের প্রত্যেক বস্তুই অনেক শিক্ষা দিতে পারে, একটী তৃণকেও অগ্রাহ্য করিবে না। একটী সামান্য তৃণের মধ্যে যে তাঁহার কত বুদ্ধি, কত জ্ঞান, কত দয়া প্রকাশিত আছে তাহা দেখিলে অবাক্ হইতে হয়। তিনি মহান্, তোমরা সর্ব্বদা তাঁহাকে ভক্তি করিবে।

সকলে পরমেশ্বরের কার্য্যে আশ্চর্য্য হইয়া চিন্তা করিতে করিতে সে দিন গৃহে গমন করিলেন।



## পেঁচো চোরা কি?

সর্ব্ব মঙ্গলা আমার দু বৎসরের ছোট। তাহার সহিত আমার বড় ভাব। সে আমার প্রতিবেশীর কন্যা; গ্রাম সম্পর্কে ভগিনী হইত। আমাদের বাড়ীর পাশেই তাহাদের বাড়ী; সেই জন্য দুজনে এক সঙ্গে রাত্রি দিন থাকিতাম, এক সঙ্গে বেড়াইতাম, একত্রে লেখা পড়া করিতাম; শয়ন ও ভোজন অনেক দিন এক সঙ্গেই চলিত। সে আমাকে বড় ভাল বাসিত, এক দণ্ড না দেখিলে স্থির থাকিতে পারিত না—আমার মনও ঠিক সেইরূপ হইত। ছেলেবেলা দুই জনে বড় আমোদে কাটাইয়াছিলাম। এখন আমি বা কোথায় আর মঙ্গলাই বা কোথায়! আমি এখন বিদেশে চাকুরী করি, মঙ্গলা শ্বশুর বাড়ীতে থাকে, কদাচিৎ পিত্রালয়ে আসে আমার সঙ্গে বড় একটা দেখা হয় না। ছেলেবেলার ভালবাসার পরিণামটা এইরূপ দাঁড়াইয়াছে।

পূজার ছুটিতে বাড়ীতে আসিয়াছি। বাড়ী এসে পাড়ার সকলের কথা জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, মঙ্গলা আমাদের গ্রামে আসিয়াছে, তাহার একটী ছেলে হইয়াছে,—আজ ছয় দিন। শুনিয়া বড় আনন্দ হইল। আমার আদরের সেই মঙ্গলার পুত্র, মনটা একেবারে গলে গেল—দেখিবার বড় ইচ্ছা হ'ল। আহারাদির পর তাহাদের বাড়ীতে গেলাম, গিয়া বলিলাম "খুড়ীমা—(মঙ্গলার মাকে খুড়ীমা বলিয়া ডাকিতাম) প্রণাম করি, আমি বাটী এসেছি, মঙ্গলার ছেলে হয়েছে, তা—আমাকে দেখাও।" খুড়িমা তাড়াতাড়ি বাহিরে এলেন; "এস বাবা এস" বলে কত আদর করিতে লাগলেন। সাত রাজার ধন এক মানিক পেলেও লোকের অত আনন্দ হয় না। আমার মনটা বড় ভিজিয়া গেল, সহরে থাকি, সেখানে অনেক বন্ধু বান্ধব আছে সত্য, কিন্তু এমন মিষ্ট করে মিষ্ট ভাষায় কেহ ডাকে না। তিনি আমাকে কোথায় রাখ্বেন, কোথায় বসাবেন তাহার স্থান খুঁজিয়া পান্ না। তার পর মঙ্গলা যেখানে ছেলে কোলে করে বসে আছে, আমাকে সেখানে নিয়ে গেলেন। সে যায়গাটা দেখে আমার প্রাণটা চমকে উঠ্‌ল। আমি মনে কর্‌লাম "একি সর্ব্বনাশ! এত আদরের ধন, হৃদয়ের আশা ছেলেটীকে এমন স্থানে রাখা হয়েছে!" দেখ্‌লাম ঘরটী অতি ক্ষুদ্র, একটী ছোট দুয়ার, কেবল একটী মানুষ কোন রূপে যেতে আস্‌তে পারে আর কোন স্থানে ফাঁক নাই। সেই আতুড় ঘর দেখেইত আমার চক্ষুস্থির—একটু খানি সেখানে থাকাতেই প্রাণটা হাঁপিয়ে উঠ্‌ল। মঙ্গলা ছেলে কোলে করে কুঁড়ে খানিকে আলো করে রেখেছে। সেইত ঘরের শ্রী; আবার তাহার এক পাশে একটা আগুনের কুণ্ড, তাতিয়া ধোঁয়া উঠ্‌ছে; কতগুলা ময়লা ছেড়া কাপড় পড়ে রয়েছে, তার গন্ধে ভূত পালায়। আবার ঘরের মেজেটা জলে জব্‌জবে হয়েছে। ছেলে দেখে মনটা সুখী হয়েছিল, কিন্তু তাকে যে যায়গায় রাখা হয়েছে তা দেখে বড় কষ্ট হ'ল, প্রাণটা যেন ফেটে যেতে লাগ্‌লো। বাহিরে এসে ব'ল্‌লাম "খুড়িমা! অমন চাঁদপানা ছেলেটীকে অমন যায়গায় রেখেছো কেমন করে? আর তোমার সেই মঙ্গলাত, যে নরম দুধে-ধোয়া বিছানা না হলে শুতে পারে না, যাকে কত আদর করে চুল বেঁধে দিতে, পরিষ্কার রাখ্‌তে, যার কাপড় একটু ময়লা হলে কত বক্‌তে, তাকে ঐ নরককুণ্ডে রেখেছ কি করে?" তিনি বল্‌লেন "তা বাছা কি করব বলো, নটা দিন বৈত নয়, তার ছদিন কেটে গেল, দেশের আচার এইরূপ।" আমি ব'ল্‌লাম "যে ভাবে ওদের রেখেছ, তাতে ছেলের একটা ব্যামো না হলে বাঁচি।" এ সকল দেখে সুখী হলাম না—বাড়ী চলে এলাম।

ছদিনে যেটোড়া। ১২টী বামুনের পায়ের ধূলা চাই; আজ বিধাতা পুরুষ ছেলের কপালে লিখ

বেন—তারও উদ্যোগ করা হয়েছে। বেলা অল্পই আছে, তখন বিধাতা পুরুষের লিখিবার সময় হয় নাই। এমন সময়ে মঙ্গলার গলা শুন্‌লাম—সে একেবারে চেঁচিয়ে কেঁদে উঠেছে। বাড়ীর মেয়েরা 'কি হলো কি হলো' বলে সেই দিকে ছুটে গেল। আমি তখন একখানি খবরের কাগজ পড়্‌ছিলাম; কিন্তু কান্নার স্বরটা শুনে প্রাণটা যেন ধড় ফড় করে উঠ্‌ল। বাহিরে এসে শুন্‌লাম মঙ্গলার ছেলেকে পেঁচো চোরায় পেয়েছে। ভাব্‌লাম "এ আবার কি; এই ক্ষণক্ষণ বেশ ছেলে দেখে এলাম, এর মধ্যে চোর এল কোথা হ'তে। যাই দেখ্‌তে হলো" বলে দৌড়াদৌড়ি গিয়ে দেখি আতুড় দুয়ারে আর লোক ধরে না সকলে ঠেলাঠেলি কর্‌ছে, সকলেই তাহার ভিতরে যেতে ইচ্ছুক; কিন্তু ভিতরেও তিলমাত্র স্থান নাই। আমি কি হয়েছে কি হয়েছে বলে সেখানে গিয়া উঠ্‌লাম। কতকগুলি স্ত্রীলোক আমায় দেখে লজ্জায় ঘাড় হেট করে তফাতে গেল, আর কতকগুলিকে ধমক দিয়া তফাৎ করে দিলাম—একেবারে আতুড় ঘরে ঢুকে পড়্‌লাম, গিয়ে দেখি সেই সোণার চাঁদ এখন কালি হয়েছে, হাত পা খিচুনি ধরেছে, দুধ খায় না, মায়ের স্তন মুখে করে না, আগে যে দুধ খেয়ে ছিল তাহা দই হয়ে বেরিয়ে পড়্‌ছে, চো'ক মেলে চায় না। আমিত তাড়াতাড়ি ছেলেকে কোলে করে বাহিরে আনিলাম, আমার সঙ্গে সঙ্গে মঙ্গলাও বাহিরে এলো। তাদিগকে সঙ্গে করে এক খানি ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়্‌লাম। আমি একটু ডাক্তারী জান্‌তাম, অবস্থা বুঝে একটু ঔষধ খাইয়ে দিলাম—ঔষধ আমার বাড়ীতে ছিল। বাহিরে ভাল বাতাস পেয়ে এবং সময় মত ঠিক ঔষধ পেটে পড়াতে ছেলেটীর হাত পা খিচুনি কমে এলো—ক্রমে চোক মেলে চাইলে। মানা করে দিলাম আর যেন কেউ সে ঘরে না আসে—ওরূপ জটলা না করে। মঙ্গলা হাঁফ ছেড়ে বাঁচ্‌ল। সে ধাক্কা সামলাইয়া গেল। বিধাতা পুরুষ কপালে না লিখ্‌তেই একটী কাণ্ড ঘটে গেল। রোগের প্রভাব কমে এলো দেখে যেমন যেমন ঔষধ খাওয়াতে হবে তা বলে দিলাম—আরও বল্‌লাম যে, যেন আতুড় ঘরে আর না নিয়ে যাওয়া হয়, তা হলে ছেলে আর বাঁচবে না।—যখন বাড়ী এলাম তখন রাত তিনটা বেজেছে।—তার পর দিন সকালে অনেক লোকের নিকট লাঞ্ছনা খেতে হয়েছিল। কেউ বলে খ্রীষ্টান হয়েছে, কেউ বলে ছোঁড়াটা একেবারে বয়ে গিয়েছে; সব সাহেবী চাল চলন শিখেছে। কিন্তু আমার অপরাধ কি তাত আমি জানি না!

এখন কথা হ'চ্চে পেঁচো চোরা কে? সে কোথা থাকে? পেঁচো চোরা একটা মানুষ নহে, সে ভূত প্রেতও নহে, তার হাত পাও নাই; কিন্তু তার ক্ষমতা বড়! আমরা যে রকম করে আতুড় ঘর বাঁধি, তাতেইত পেঁচো চোরা বাঁধা থাকে; আমরা তাকে আদর করে এনে সেই ঘরে বাসা দিই। তা না হলে আর সেখানে সে আস্‌বে কেমন করে?

জীবন ধারণের জন্য বিশুদ্ধ বায়ুর প্রয়োজন; কোন রকমে যদি তাহা দূষিত হয় তা হলে পীড়া জন্মে। আতুড় ঘরখানি যেমন স্থানে যে প্রণালীতে বাঁধা হয় সে কথা বলিতে লজ্জা করে। ছোট ঘর ছোট একটী দুয়ার, জমি সেঁতসেতে, চারিদিক বেশ ঘেরা—তাহার চারি পাশ নানা রকম জঞ্জালে পোরা। সেই ঘরে সদ্যোজাত বালক থাকবে। ছেলেটী যেমন ভূমিষ্ঠ হবে অমনি পাড়ার লোক দলে দলে দেখ্‌তে আস্‌বে; সেই দুয়ারটীতে সকলেই সেই ঘরের বায়ু হইতে নিশ্বাস লইবে—সেই ঘরে প্রশ্বাস ফেলিবে, কাজেই ঘরের মধ্যে যে বাতাস টুকু থাকে, তাহা ফুরাইয়া যায়। আবার বাহিরের বায়ুও আসিতে পায় না, কেন না দুয়ারে যে একটু থাকে, তাহা ফুরাইয়া যায়। সুতরাং বিষের মত বায়ু সেই ঘরের মধ্যে বদ্ধ থাকিয়া যায়। মা ও ছেলে দুই জনেই তাহা নিশ্বাস টানিয়া লয়। এই বায়ুই পেঁচো চোরার একটী প্রধান চোর।

জমি সেঁতসেতে তাহাতেও বায়ু দূষিত করিয়া ফেলে। আবার সেই মাটীতে শুইয়া থাকাতে শরীর মধ্যে জল প্রবেশ করে; তাহাতে শ্লেষ্মা—কফ কাশি জন্মাইয়া দেয়। সুতরাং এই আর একটী চোর।

ছেলেকে শোওয়াইতে যে বিছানা দেওয়া হয় তাহা ময়লা দুর্গন্ধ যুক্ত, সেই দুর্গন্ধ রাত দিন ছেলের নাকের মধ্যে যায়। তাহাতে নিদ্রার ব্যাঘাত হয়। সুনিদ্রা না হওয়া রোগের ঘর। ইহাও চোরের মধ্যে গণ্য।

আতুড় ঘরের মধ্যে একটী করিয়া আগুনের কুণ্ড থাকে তাহাতে কাট দেওয়া হয় সেই জন্য তাহাতে হাতে খুব ধোঁয়া উঠে। সেই ধোঁয়া চোকে লেগে ছেলে কাঁদিতে থাকে—চোক দিয়ে জল পড়ে। কেঁদে কেঁদে পীড়া হবে তাহার আশ্চর্য্য কি? আবার ইহা বায়ু দূষিত করিবার একটী কারণ। এইত গেল চার চোর।

তারপর আহার—সে ব্যবস্থাও সুন্দর নহে। আমরা কচিছেলের জন্য গোদুগ্ধ ব্যবস্থা করি, তাহা আবার ঘন করে জাল দিই। আবার রাত্রির জন্য এবং পরদিন প্রাতঃকালে দুধ পাওয়া যাইবে না বলিয়া দিনে জাল দিয়ে আগে তুলিয়া রাখিয়া দিই। সেই দুধ ছেলেকে খাইতে দেওয়া হয়। ঘন দুধ পেটে সয় না, কাজেই পেটের পীড়া হয়; তার পর আবার বাসি দুধ খাওয়ান হয় বলে ছেলের অম্ল রোগ জন্মায়—তাই দুধ খেলেই ভেদ হইয়া যায়। দুধ তোলা রোগের সৃষ্টি এই রূপে হয়।

পেঁচো-চোরা এই পাঁচটী একত্রিত হইয়া হইয়াছে। এখন তোমরা এক দুই করে পাঁচটী চোর গুণে লও! চোরে লোকের কি ক্ষতি করে, ঘটীটা বাটীটা বা দুচারি খান গহনা, না হয় নগদ টাকা নিয়ে যায়। কিন্তু সে প্রাণে মারে না। পেঁচোর হাতে পড়িলে আর নিস্তার নাই, শুধু যে কেবল ছেলেটী মরে গেল তা নয়; তার শোকে বাপ মার মনে দারুণ আঘাত লাগে, তাহার সংসারের অনুরাগ চলিয়া যায়; মন উদাস হয়ে পড়ে, শরীরের প্রতি যত্ন থাকে না, স্বাস্থ্য চলিয়া যায়, কাজেই ভগ্নদেহ ভগ্ন মন নিয়ে ঘর করিতে হয়। সে বড় কষ্টের কারণ হয়ে পড়ে। পেঁচোর হাত হতে যাতে মুক্তি পাওয়া যায় তাহার উপায় করা উচিত। সখার পাঠক পাঠিকাগণ! তোমরা এখন ছোট আছ; এখন তোমাদের সে ভয় নাই বটে। কিন্তু পরে আবার তোমরাই সংসারী হবে, তখন যাতে এই দুস্তর ব্যাধির হাতে না পড় তার চেষ্টা করিবে। কেবল আতুড় ঘরের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। যত ছেলেকে পেঁচোয় পায় তাহা প্রায়ই আতুড় ঘরে দেখা যায়। এই কথাটী যেন বেশ মনে থাকে, তাহলে ভবিষ্যতে সাবধান হয়ে চলতে পারবে, সেই ভাবে চলিলে পেঁচোর হাত হইতে উদ্ধার পাবে। নচেৎ দেশের মঙ্গল নাই।

---



## মাকড়সা।

(৭ম সংখ্যার পর।)

মাকড়সা খায় কি? এ কথার উত্তর আমি তত সহজে দিতে পারিতেছি না। আমি এ পর্য্যন্ত এমন কিছু দেখি নাই যাহা পাইলে সে খুসী না হয়। জালে যাহাই পড়ুক না, নড়িলে চড়িলেই হইল; কি পড়িয়াছে কে খোঁজ লয়? মশা মাছির তো কথাই নাই, ক্ষুধার সময় স্বজাতীয় দুই একটী হইলেও চলে। কেহ কেহ ছোট ছোট পাখী ধরিয়া খান।

সকলের বড় যে মাকড়সা তাহার নাম 'টরান্টুলা।' এই জাতীয় মাকড়সাই নাকি পাখী ধরিয়া খায়। এক সাহেব একবার তিনটী টরান্টুলা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তিনটীকেই এক খাঁচায় (খাঁচায় থাকিবার যোগ্য ও বটে, এক একটা যে বড়!) রাখা হইল। প্রথম প্রথম কয়েক দিন তাহরা কিছুই খাইল না। তার পর কয়েক খণ্ড মাংস চাটিয়া যেন তাহাদের ক্ষুধা বাড়িয়া গেল। তখন একটা আর দুইটাকে ধরিয়া খাইয়া ফেলিল। শেষটী আনিয়া সাহেব বিলাতের প্রাণীশালায় উপহার দিলেন। সেখানে তাহাকে ছোট ছোট ইঁদুর খাইতে দেওয়া হইত। প্রথম প্রথম ইঁদুরটীর কিছুই ফেলা হইত না, শেষটা যেন টরান্টুলা মহাশয় বুঝিতে পারিলেন যে ইঁদুরের অভাব হইবে না। তখন থেকে কেবল মাথাটী খাইতে লাগিলেন।*

গায়ের কাপড় ময়লা হইলে আমরা ধোপার নিকট দিই। মাকড়সার ধোপা নাই, কিন্তু সেও একটা খোলস পুরাণ হইলে সেটাকে বদলাইয়া ফেলে। তোমরা অনেক সময় দেখিয়াছ মরা মাকড়সাটা হাত পা কোঁকড়াইয়া জালে ঝুলিতেছে,—বাস্তবিক হয়তো সেটা মাকড়সার খোলস মাত্র। এক একটী খোলস এত পরিপাটী যে চিনিবার যো নাই। সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম লোমগুলি পর্য্যন্ত পরিষ্কার দেখা যাইতেছে।

মাকড়সার বড় বুদ্ধি। একটী বাড়ীর বারাণ্ডায় একটা মাকড়সা জাল পাতিয়াছিল। বাতাস

---

* পরের পৃষ্ঠায় যে ছবিটি দেওয়া হইয়াছে, তাহা ইহারই। এত বড় মাকড়সা দেখিয়াছ কি? কোন কোনটা এর চাইতেও বড় হয়।

আসিলেই জালের নীচের দিকটা উঠিয়া আসিত ; বেচারা বড় জ্বালাতন হইত। ভাবিয়া চিন্তিয়া সে একখানা ছোট লাঠি টানাটানি করিয়া লইয়া আসিল। বাতাস আসিবার সময় সেই লাঠিখানা জালে ঝুলাইয়া দিত ; তাহাতে নঙ্গরের কাজ হইত।

মাকড়সার জালে বড় পোকা পড়িলে দড়ি কাটিয়া তাহার যাইবার সহায়তা করে।

এক প্রকার মাকড়সা আছে, তাহারা মাটিতে গর্ত্ত খুঁড়িয়া ঘর বাঁধে। ভিতরে সাটিনের মত মসৃণ। দেখিতে কাবুলী মেওয়া ওয়ালাদের টুপীর মত ক্রমে সরু হইয়া গিয়াছে। একটী দরজাও আছে। দরজাটী মুখে এমন সুন্দর ভাবে লাগে যে ভিতর হইতে ঠেলিয়া না দিলে খোলা যায় না। দরজার গায় ছোট ছোট ছিদ্র আছে তাহাতে নখ দিয়া ভিতর হইতে ধরিয়া রাখে। দরজার বাহিরের দিকে মাটী মাখাইয়া এমন করিয়া রাখে যে সহসা চেনা যায় না।

মাকড়সার প্রস্তাব আমরা শেষ করিলাম। ভরসা করি তোমরা আর মাকড়সা দেখিলেই মারিতে যাইবে না।

## বিশেষ বিজ্ঞাপন।

আমরা গতবারে যে চিত্রের পুরস্কার দিব বলিয়াছিলাম, সেই সম্বন্ধীয় সমস্ত চিত্র আগামী ১৫ই আগষ্টের পূর্ব্বে এখানে পৌছান আবশ্যক বিশেষ প্রয়োজন হইলে আর ৫ দিন অতিরিক্ত সময় দেওয়া যাইতে পারে। কার্য্যাধ্যক্ষ।

[ স্থানাভাব বশতঃ এবারেও ধাঁধা দেওয়া গেল না। ]

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে মুদ্রিত এবং ৫০নং সীতারামঘোষের ষ্ট্রীট, "সখা" কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

প্রথম ভাগ। সেপ্টেম্বর, ১৮৮৩। ৯ম সংখ্যা।

# ভীমের কপাল।

## ১০ম অধ্যায়।

যখন ভীমেন্দ্রের চেতনা হইল, তখন সে দেখিতে পাইল এক সুন্দর অট্টালিকার মধ্যে সে রহিয়াছে। সম্মুখে একটী বৃদ্ধা স্ত্রীলোক বসিয়া পাখা দ্বারা বাতাস করিতেছে। ভীমেন্দ্র চমকিয়া জিজ্ঞাসা করিল "আমি কোথায়? এ কোন স্থান?" বৃদ্ধা উত্তর করিল "বলিতে নিষেধ আছে।" ভীমেন্দ্র পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিল—"ভাল, আমাকে এখানে কে আনিয়াছে এবং কেনই বা আনিয়াছে?" দাসী উত্তর করিল "বোধ হয় ডাকাতেরা তোমাকে তাহাদের চাকর করিয়া রাখিবে বলিয়া লইয়া আসিয়াছে।"—ভীমেন্দ্রের মনে রাগ, ঘৃণা, দুঃখ এক সঙ্গে উদয় হইল। সে বলিয়া উঠিল "কি? আমি যদি চাকরী না করি?"—বুড়ী চেঁচাইতে বারণ করিয়া বলিল "তাহারা তোমাকে মারিয়া ফেলিবে। আর যদি পলাইয়া পুলীশে খবর দিতে যাও, তা হলেও রক্ষা নাই। রঘো ডাকাতের নামে দেশশুদ্ধ কেঁপে যায়, তোমার কি সাহস যে পলাইয়া বাঁচিবে।"—ভীমেন্দ্র এই কথা শুনিয়া ভয় পাইল—আর তাহার কোন কথা বলিতে সাহস হইল না। যৎকালে এইরূপ কথা বার্ত্তা চলিতেছিল, সেই সময় ডাকাতের সর্দ্দার রঘুরাম সেই স্থানে উপস্থিত হইল। দিনের বেলায় ভীমেন্দ্র রঘুরামকে দেখিয়া লইল—তাহার প্রকাণ্ড শরীর লৌহ নির্ম্মিত বলিলেও হয়—হাত পা গুলি গাছের মত—কপাল বিলক্ষণ চওড়া। দস্যু আসিয়াই দাসীর দিকে চোখ লাল করিয়া তাকাইল, এবং বলিল "যার তার সঙ্গে তোর কি কথা বার্ত্তা হয়?" অনন্তর ভীমেন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া বলিল "রঘো ডাকাতের বাড়ীতে বসেই রঘো ডাকাতের বিপক্ষে পরামর্শ কর্‌ছো?" ভীমেন্দ্র চুপ করিয়া রহিল। দস্যু আবার বলিল "আজ থাক ; কাল্‌কে তোমাকে যা কর্ত্তে হয় কর্‌বো।"—এই বলিয়া দস্যু সেখান হইতে চলিয়া গেল। ভীমেন্দ্র কাঁপিতে কাঁপিতে দাসীকে জিজ্ঞাসা করিল—"আমার কি পলাইবার কোন উপায় নাই? তোমার দুটী পায়ে পড়ি, আমায় বলে দাও। আমার আর এক দণ্ডও এখানে থাকিতে ভয় হইতেছে।" দাসী উত্তর করিল "কেন বাছা, আবার ঐ কথা বলিয়া বিপদে

পড়িবে? আর আমাকেও বিপদে ফেলিবে? এখান থেকে পলাবার যদি কোনও উপায় থাকিত তাহা হইলে কি আমি এই বুড়ো বয়সে এদের লাথি ঝাঁটা খেয়ে এখানে পড়ে থাকি?" ভীমেন্দ্র এ উত্তরে সন্তুষ্ট হইল না, ভাবিল যে কোন উপায়ে পারি পলায়ন করিতে হইবে। এই রকমের নানা ভাবনায় ভীমেন্দ্র সে দিন কাটাইল—মাথার ঘা শুকাইয়া উঠিয়াছে। পর দিন ভীমেন্দ্র আপনার ঘর হইতে বাহিরে একটু বেড়াইতে আসিল—চারিদিকে লোক জন ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; এক স্থানে কতকগুলি লোক বসিয়া মদ্যপান করিতেছে, এবং মধ্যে মধ্যে 'হাহা' করিয়া হাস্যের শব্দে গৃহটীকে মাতাইয়া তুলিতেছে, এক স্থানে কতকগুলি লোক অস্ত্র পরিষ্কার করিতেছে—তন্মধ্যে এক জন ভীমেন্দ্রকে দেখিয়া হাসিল; বলিল "আমিও তোমার মত এক সময় ছিলাম কিন্তু রঘো ডাকাতের দলে পড়ে এখন আমি ডাকাত হইয়াছি। তুমিও থাক তোমার শরীরটী বেশ দেখ্‌চি—তুমি কালে খুব একজন ভাল ডাকাত হ'তে পারবে।"—ভীমেন্দ্র ঘৃণায় কোনও কথা না বলিয়া সে স্থান হইতে চলিয়া গেল। বাহিরে গিয়া শুনিল যে স্থানে ভীমেন্দ্র রহিয়াছে, তাহা রঘুরামেরই জমীদারী। সমস্ত লোক তাহার অধীন—সুতরাং রঘো ডাকাতের পুলীশের হাতে পড়িবার সম্ভাবনা নাই।—এমন কি এরূপ গুজব শোনা যায় যে রঘো একবার ৫ জন পাহারাওলার হাতে পড়ে;—রঘো একা তাহাদিগকে আধমরা করিয়া নিজের বাড়ীতে লইয়া গিয়া তাহাদিগকে নিজের দলে মিশাইয়া লয়। রঘুর বিরুদ্ধে কে কি বলিবে? দুই তিন দিন গেল—ভীমেন্দ্র পলাইবার পথ পায় না। রঘুও ভীমেন্দ্রকে কিছু বলে না। অবশেষে এক দিন সন্ধ্যাবেলা ভীমেন্দ্র নিজের ঘরে বসিয়া কি করিবে ভাবিতেছিল, এমন সময় রঘো ডাকাত সেইখানে আসিল। সে আসিয়াই ভীমেন্দ্রকে কহিল "দেখ্, আমরা একটা বড়লোকের বাড়ী লুটপাট কর্‌তে যাব; তুই আমাদের সঙ্গে থাকিস্, তা হলে কেমন করে ডাকাতি কর্‌তে হয় তা অভ্যাস হবে এখন। প্রস্তুত হ।" ভীমেন্দ্রের ভয় থাকিলে কি হয়, তাহার দ্বারা একটা অন্যায় কাজ করাইয়া লইবে, ইহাতে ভীমেন্দ্র প্রাণান্তেও রাজি হইবে না, স্থির করিয়া বলিল "ডাকাতি করাটা আমি অন্যায় মনে করি—আমি কখনও যাব না।" রঘো ঠাট্টার সুরে বলিল "বাবু অন্যায় মনে করেন বটে—তবে আপনাকে এইখানে শোয়াইয়া রাখিয়া যাই।" এই বলিয়া জোরের সহিত ভীমেন্দ্রের মাথায় লাথি মারিল—ভীমেন্দ্র আপনার দুর্ব্বল শরীর লইয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িল। রঘো চোখ্ লাল করিয়া "আরও কিছুকাল লাগিবে," এই কথা গুলি বার বার বলিতে বলিতে সেই স্থান হইতে চলিয়া গেল। দস্যু সেখান হইতে চলিয়া যাইবা মাত্র দাসী তথায় ছুটিয়া আসিল এবং চোখে মুখে জল দিয়া পাখার বাতাস করিতে লাগিল—দাসীর দুচোখের জলে বুক ভাসিয়া যাইতেছে। অনেকক্ষণ পরে ভীমেন্দ্রের চৈতন্য হইল। ভীমেন্দ্র বুঝিল কে একজন পাশে বসিয়া আছে—সে মনে করিল রঘো ডাকাত। তখন সে চোখ বন্ধ অবস্থাতেই বলিল "এমন লোক দেখি নাই—যে জোর ক'রে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমাকে চালাতে পারে। তুমি আমাকে কেটে টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিলেও আমার দ্বারা তোমার সিকিপয়সারও কাজ হবে না।" দাসী বলিল "আমি ডাকাত নই, আমি তোমার দুঃখে দুঃখী"—চক্ষু খুলিয়া ভীমেন্দ্র দেখিল দাসী কাঁদিতে কাঁদিতে পাখার বাতাস করিতেছে। ভীমেন্দ্র এই দয়া দেখিয়া চোখের জল রাখিতে পারিল না। দুজনে মিলিয়া নিজের দুঃখের কথা বলিয়া খানিকক্ষণ কাঁদিল।



এইরূপে সেই রাত্রি কাটিয়া গেল। গ্রামবাসী কাহাকেও নিজের অবস্থার কথা বলিলে, রঘোর ভয়ে কেহই তাহার দুঃখে দুঃখ দেখায় না। ভীমেন্দ্র মরুভূমিতে রোপিত লতার ন্যায় দুঃখে শোকে শুকাইয়া যাইতে লাগিল। ডাকাত সর্ব্বদা আসিয়া প্রহার করে।—তাহাদের দলে মিশিয়া তাহাদের সাহায্য করিতে বলিলে ভীমেন্দ্র কেন তাহাতে রাজি হয় না? পাঠকপাঠিকাদিগের মধ্যে এরূপ কেহ আছেন কি না জানি না, যিনি হয়ত এইরূপ অবস্থায় পড়িলে, মার খেয়ে মরা অপেক্ষা ডাকাতের দলেই মিশিয়া যাইতেন। ভীমেন্দ্র অন্যায় কার্য্য জানিয়া কেমন করিয়া তাহাতে যোগ দিবে? ভীমেন্দ্র যে কাজ করিবে না, কাহার সাধ্য তাহাকে দিয়া সে কাজ সম্পন্ন করায়? একগুঁয়ে ভীমেন্দ্রের স্বভাবই এই ছিল। সুতরাং রোজ ভীমেন্দ্রকে অসহ্য প্রহার, যাতনা সহ্য করিতে হইত। ডাকাত ভাবিল এক রত্তি ছেলে—তিন দিনের শাস্তিতেই সোজা হইয়া উঠিবে। এই সিদ্ধান্ত করিয়া ডাকাত হুকুম দিয়া গেল "ছোঁড়া টাকে রোজ ১০ঘা বেত মারিও।" প্রত্যহই ভীমেন্দ্র বেত খায়, কিছুতেই রাজি হয় না। অবশেষে ভীমেন্দ্রের সমুদায় শরীর ক্ষত বিক্ষত হইয়া উঠিল—আর ভীমেন্দ্র সহ্য করিতে পারে না। তখন ভীমেন্দ্র ভাবিল জলে ডুবিয়া মরি। ঈশ্বর জানেন ভীমেন্দ্র আর যদি সহ্য করিতে পারিত কখনও এই অন্যায় কাজের কথা ভাবিত না; ভীমেন্দ্র অনেক সহ্য করিয়াছিল, বালক আর সহ্য করিতে পারিল না। যদি পলাইয়া বাঁচিতে পারিত, তাহা হইলেও ভীমেন্দ্র আত্মহত্যা করিতে যাইত না; কি সর্ব্বনাশ! পলাইবার পথও যে বন্ধ! রঘুরামের উপদ্রবে তাহার অধীনস্থ কাহারই পলাইয়া বাঁচিবার যো ছিল না। ভীমেন্দ্র তখন যাঁহার প্রাণ তাঁহাকে দিবার জন্য এক দিন দ্বিপ্রহরের সময় একটী নিকটবর্ত্তী পুষ্করিণীর ধারে গিয়া দাঁড়াইল—তাহার চেহারা দেখিলেই যে সে বুঝিতে পারিত, ভীমেন্দ্র জীবনে আশা ছাড়িয়া আসিয়াছে। কিছু দূরে একটী বালক একটা গাছতলায় বসিয়া এইটী লক্ষ্য করিল। দেখিতে দেখিতে ভীমেন্দ্রের চক্ষু জলে পূরিয়া গেল। ভীমেন্দ্র সহ্য করিতে না পারিয়া, নিজের দুটী পা গামছা দিয়া বাঁধিল, এবং চক্ষু বন্ধ করিয়া ঝাঁপ দিয়া সেই উচ্চ তীর হইতে জলে পড়িল। ও ভীমেন্দ্র তুমি যে তোমার মায়ের বুকযুড়ানো ধন, তুমি যে অনেকের ভালবাসার পাত্র, সে সকলকে ফাঁকি দিয়া কোথায় যাও?—ভীমেন্দ্র,—এ কি করিলে?—যাহাদের ভালবাসিতে তাহাদের বলিয়া গেলে না?—যাহারা তোমাকে না দেখিয়া কাঁদিবে, তোমার মন তাহাদের জন্য একটু কাল বিলম্ব করিল না? কি কষ্ট! কি কষ্ট!—হা ঈশ্বর, এই কি ভীমের কপাল?—যে বালক অদূরে বৃক্ষমূলে বসিয়াছিল, সে হঠাৎ একটী বালককে এইরূপে জলে পড়িতে দেখিয়া অবিলম্বে তাহার পশ্চাতে ছুটিয়া আসিল—নিজের জামা খুলিয়া রাখিয়া জলে পড়িল এবং অতি কষ্টে অচেতন বালককে টানিয়া তীরে তুলিল। পরম সৌভাগ্যের বিষয় সেই সময়ে রৌদ্র অত্যন্ত প্রখর ছিল বলিয়া কেহই সেখানে ছিল না। নূতন আগত বালকের চেষ্টায় ভীমেন্দ্র অল্পকাল পরে চেতন পাইল। চক্ষু খুলিয়া দেখিল কিন্তু যাহা দেখিল সহসা বিশ্বাস করিতে পারিল না—দেখিল সেই বালক আর কেহ নহে তাহার মাসতুত ভাই এবং প্রিয়তম বন্ধু বিপিন!—ভীমেন্দ্রের ইচ্ছা হইল যদি তাহার এক শত মুখ থাকিত, তাহা হইলে একেবারে তাহার সমস্ত দুঃখের কথা বলিয়া বিপিনকে জড়াইয়া ধরিত। এখন কিছুই বলিতে না পারিয়া বলিল 'বিপিন'।—বিপিনও দেখিয়া চিনিল ভীমেন্দ্রই বটে, কিন্তু সমুদায় শরীর ক্ষত বিক্ষত ইহার কারণ জানিয়া বিপিন যে কত কাঁদিল

তাহা বলিয়া শেষ করিতে পারি না। কিন্তু ভীমেন্দ্র নিজের অবস্থা সংক্ষেপে বলিয়া বিপিনকে অধিকক্ষণ ডাকাতদের দেশে থাকিতে নিষেধ করিল,—বলিল 'আমার যা হয় হবে; তুমি এখানে থাকলেই মারা পড়'বে। আমাকে যাতে উদ্ধার করতে পার, অন্যত্র গিয়া তাহার চেষ্টা দেখ।" বিপিন জামার পকেট হইতে একখানা চিঠির কাগজ, ও একটা টীকিট-লেফাপা ও পেন্সিল দিয়া ভীমেন্দ্রকে গোপনে কলিকাতার ঠিকানায় তাহাকে চিঠি লিখিতে বলিয়া গেল।

ক্রমশঃ—

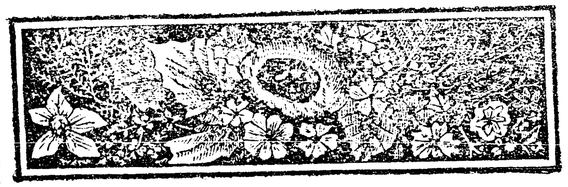

## বালিকাদিগের বিশেষ পৃষ্ঠা।

### লজ্জা ও নম্রতা।

বিনোদিনীর বয়ঃক্রম ১৪ বৎসর, লেখা পড়া অতি সামান্যই জানা আছে। বাপের এক মাত্র দুহিতা, সুতরাং বড় আদরের। বিনোর বিবাহ হইয়াছে কিন্তু কোন কারণ বশতঃ আজিও পিত্রালয়েই থাকে। বাল্যাবস্থা হইতেই বিনো বড় দুরন্ত, গালাগালি বৈ আর কথা নাই, সকলেরই সম্বোধন "পোড়ার মুখী, লক্ষীছাড়ী, সর্ব্বনাশী" প্রভৃতি সুমধুর বচন! অথচ কেহ কিছু বলে না, পিতার আদরের ধন। এইরূপে আদর পাইয়া বিনোর চরিত্র ভয়ানক দূষিত হইয়া গেল, সে ঘোর অত্যাচারী ও ভয়ানক স্বেচ্ছাপ্রিয় হইতে লাগিল। রাগ হইলে সম্মুখে ঘটী বাটী, যাহা পাইত তাহাই চূর্ণ করিয়া ফেলিত, মাকে মারিয়া গালাগালিয়া উৎসন্ন করিয়া দিত, ঘোর দুরন্ত হইল। তথাপি কথা নাই! এখন বড় হইয়া অনেক দোষ সারিয়াছে বটে, কিন্তু যে ঘোর স্বেচ্ছাচারিতা একবার অভ্যাস হইয়া গেল তাহা আর গেল না। চিরকালের জন্য তাহার চরিত্রে একটী প্রবল দোষ স্থায়ী হইয়া গেল। সে এখনও যাহা ধরিবে তাহা না পাইলে কাহারও রক্ষা নাই, যাহা বলিবে তাহা না শুনিলে কাহারও শান্তি নাই। এত বয়স হইয়াছে অদ্যাপি স্থির গম্ভীর বুদ্ধি টুকু তার হইল না, কাকে কি বলিতে হয়, কার সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করিতে হয় তাহা কিছুই জানে না। শিখাইলেও শুনিবে না। ভুলিয়াও সত্য কথা কয় না—এত মিথ্যা কথা রচনা করিয়া কহে যে তাহার সংখ্যা নাই, তাহা দেখিয়া শুনিয়া প্রাচীন লোকও অবাক হয়।

প্রিয় পাঠিকাগণ! আমাদিগকে নিন্দুক ভাবিবেন না, আমরা বিনোকে ভালবাসি এবং তাহার চরিত্র মন্দ হওয়াতে দুঃখিত হইয়াছি কিন্তু কি করি, সত্যের খাতিরে, ও আপনাদিগকে সাবধান করিয়া দিবার জন্য বলিতে হইল। যাহা হউক এত দোষ সত্বেও বৃদ্ধারা বিনোর বড় সুখ্যাতি করেন, —বিনোর একটী গুণ আছে, সে বড়ই লজ্জাবতী। তাহার লজ্জার সুখ্যাতি দেশে বিদেশে বিখ্যাত। বিনো যখন শ্বশুরালয়ে যায় তখন তাহার মূর্ত্তি স্বতন্ত্র, তাহাকে তখন কাপড়ের পুতুল বলিলেও হয়, রাত্রিদিন বস্ত্রে মণ্ডিত হইয়া ২।৩ হাত ঘোমটা টানিয়া ষষ্ঠি বুড়ী সাজিয়া বসিয়া থাকে। কেহ মুখ দেখিতে আসিলে বিনোর সঙ্গে যুদ্ধ উপস্থিত। সকলকে ধ্বস্তাধ্বস্তী করিয়া মুখ দেখিতে হয়! কথা ত নয়ই, কাহারও সঙ্গে না। কাহারই সম্মুখে আহার হয় না—ভয়ানক লজ্জা! কাজেই দেশ বিদেশ ব্যাপিয়া বিনোর লজ্জার খ্যাতি ছড়াইয়া পড়িয়াছে। তাহার সমবয়স্কারা তাহার নিন্দা করে, "এত বাড়াবাড়ী, মেয়ের সব মন্দ," প্রভৃতি নানা প্রকার নিন্দা করে। কত বুঝায়, কত উপদেশ দেয়, কে সে সব কথা শুনে? বিনোর স্বভাব যাইবার নয়।



তাহারই বাড়ীর পাশে বোসেদের কামিনী আর এক রকম মেয়ে। সে বাল্যাবধি পিতার নিকট লেখা পড়া শিখিয়াছে, ভাল ভাল স্থানে যাইয়া অনেক দেশের স্ত্রীলোকদিগের সঙ্গে মিশিয়া কত জ্ঞান লাভ করিয়াছে ও কত কার্য্য শিক্ষা করিয়াছে। এখন তাহার বয়স ১৩ বৎসর মাত্র, কিন্তু ইহারই মধ্যে অনেক ভাল ভাল বৈ তাহার পড়া হইয়াছে। শ্বশুরালয়েই থাকে, বাড়ীর মধ্যে সে আর তাহার শাশুড়ী এই দুটী স্ত্রীলোক আর সকলেই পুরুষ। কামিনী অর্দ্ধাবৃত মুখে তাঁহাদের সকলেরই সম্মুখে আসে, সকলের কথা মুখ নীচু করিয়া শুনে ও ঘাড় নীচু করিয়াই নিম্নদৃষ্টিতে তাহাদের উত্তর দেয়। বিনোর মত চীৎকার করিয়া ডাকা বা উচ্চহাস্য কামিনীর মুখে কেহ কখন শুনে নাই। কেহ দূরে থাকিলে সে তাহার নিকটে গিয়া কথা বলিয়া আসে, উচ্চৈস্বরে ডাকিয়া বলে না। হাসির কথায় যখন সকলে গড়াইয়া যাইতেছে, কামিনী তখন স্থিরভাবে বসিয়া—মুখে অল্প অল্প হাসি! খুব দুঃখ হইলেও কাঁদে না, কেবল চক্ষু দিয়া টস টস করিয়া জল পড়ে মাত্র। তাহার মুখে কেহ কখন গালাগালি শুনে নাই। আর সকলে যেমন সচরাচর গায়ের কাপড় খুলিয়া থাকে, কোন লোক আসিলেই তাড়াতাড়ি গায় ও মাথায় কাপড় তুলিয়া দেয়; কামিনী সেরূপ করে না, সদাই তাহার সর্ব্বাঙ্গ সলজ্জ ভাবে আবৃত, অথচ সে কুণ্ঠিত ভাব নাই যাহা অন্যের দেখা যায়। কামিনী সকলের সঙ্গে বসিয়া থাকিবার সময়ে নিজে অধিক কথা কয় না, মেলা অনাবশ্যক কথা কহিয়া গোল করে না। আবশ্যকমত ধীরে ধীরে ২।৪টী কথা বলে। কথা কহিবার সময়ে হাত পা নাড়িয়া সে কখন ব্যাপকতা প্রকাশ করে না। অতি মৃদুভাবে মধুরস্বরে কথা কহে, তাহার কথা শুনিলে ও তৎকালীন তাহার মুখের বিনম্রভাব দেখিলে সকলেই তাহাকে এ অল্প বয়সে দেবী মনে করে। তাহার চক্ষে কখন চঞ্চলতা দেখা যায় না, স্থির গম্ভীর ভাব।

এতগুণ থাকিতেও বৃদ্ধারা কামিনীকে দেখিতে পারে না তাহার একটী মহৎ দোষ আছে—সে "বেহায়া"! সে অনায়াসে (নম্রভাবে) শ্বশুর প্রভৃতি গুরুজনের ও অপরিচিত অতিথির সম্মুখেও বাহির হইয়া তাঁহাদের কথার উত্তর দেয়, তাঁহাদের পরিবেশন করে, তাঁহাদিগকে নমস্কার করে, ইত্যাদি। কত দোষ বলিব? কামিনীর অনেক দোষ।—কামিনী বৈ পড়ে! পড়িয়া আবার প্রতিবেশিনীগণকে শুনায়! তাহার আর একটী প্রধান দোষ আছে।—সে স্বামীকে বন্ধু বলিয়া যত্ন করে! "ওমা! কলির মেয়ে" প্রভৃতি কতই দুর্ণাম যে তার, তা আর কি বলিব। যদি কেহ এ অবস্থায় পড়িয়া থাকেন ত জানিবেন কামিনীর কত নিন্দা। কিন্তু তাহার দোষ কি? এ শেষোক্ত দোষটীর জন্য বিনোদিনী তাহার বড়ই নিন্দা করে।

পথে চলিবার সময় কামিনী বড় বেহায়াপনা করে;—সে এত কম ঘোমটা দেয় যে তাহার মুখের অনেকটা দেখা যায়। বিনোর মত ১ হাত ঘোমটা দিয়া যায় না, তাহার মত দুহাত ঘোমটার মধ্যে ফাঁক করিয়া সব দেখিতে দেখিতে যায় না। আপন মনে পথ পানে চাহিয়া স্থিরভাবে চলিয়া যায়!

পাঠিকাগণ! আমাদের কোন দোষ নাই। যেমন জানি তেমনি সত্য সত্য দুজনেরই চরিত্র বর্ণনা করিলাম। উভয়েরি সুখ্যাতি আছে, উভয়েরই অখ্যাতি আছে। বৃদ্ধারা ও মূর্খ লোকেরা কামিনীর নিন্দা করে ও বিনোদিনীর প্রশংসা করে, কিন্তু যাঁহারা বুঝেন, যাঁহারা সততা ও নম্রতার পক্ষপাতী তাঁহারা বিনোর বড়ই নিন্দা করেন ও কামিনীকে দেবী জ্ঞান করেন। আমরাও তাই

মনে করি। বৃথা বাহ্য লজ্জাতে আবশ্যক নাই। আন্তরিক নম্রতাই মানবের শোভা, এইটীর নামই প্রকৃত লজ্জা, নহিলে এ দিকে চূড়ান্ত বাচালতা, চূড়ান্ত দুরন্তপনা ও ঘোর বেহায়াপনা করিয়াও যদি একটু ঘোমটা টানিলেই লজ্জাশীলা হওয়া যাইত তাহা হইলে আর ভাবনা ছিল না। ভরসা করি, আমাদের প্রত্যেক পাঠিকা কামিনীর মত লক্ষ্মী হইবেন ও বিনয় নম্রতা ও স্থৈর্য্য দ্বারা বিভূষিত হইয়া স্ত্রীজাতির ভূষণ স্বরূপা হইবেন।

---

## ঠাকুরদাদার গল্প।

**পরদিন** যখন সকলে নিয়মিত বাগানের কার্য্য শেষ করিয়া গল্প করিতে বসিলেন তখন নবীন বাবুই প্রথমে কথা তুলিলেন:—"আজ উদ্ভিদ জাতির বংশবৃদ্ধির প্রণালী আমাদের বিবেচ্য। ভাল! তোমরা কে কি জান বল ত দেখি তার পরে আমি স্বয়ং বলিব। আগে মন্মথ বল।" মন্মথ তখন একটু আনন্দিত হইয়া বলিল "উদ্ভিদদিগের বংশবৃদ্ধি ত কেবল বীচিতেই হয়। ক্ষেত্রে বীজ বপন করিলেই ত গাছ হয়।"নবীন বাবু ঈষৎ হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "বীজ কোথা হইতে হয়?"

মন্মথ—সেত মালীর ঘরেই থাকে? কিশোরী অমূল্য ও নবীন বাবু উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন। কিশোঃ—ভাই বুঝি শিখেছ? ওরে শিবু! (মালীর নাম শিবু) তুই বীচি কোথা হতে পাস? মালীঃ—কেন বাবু বীচিত সকল ফলের ভিতর থাকে? নবীঃ—দেখ দেখি মন্মথ! ভাই এসব তুচ্ছ বিষয় তোমরা জাননা? কি আশ্চর্য্য! ফল মাত্রেই বীজ থাকে, ও এই বীজ ভূমিতে রোপণ করিলে উহা হইতে অঙ্কুর উৎপন্ন হয়, ঐ অঙ্কুর বড় হইয়া গাছ হয়। এই রূপেই বৃক্ষ লতাদির সংখ্যা বৃদ্ধি হয়, বুঝিলে? এই রূপেই একটী বীজ পাইলে ক্রমে লক্ষ লক্ষ বৃক্ষ প্রস্তুত করা যায়।

নলিন এতক্ষণ চুপ করিয়া একবার এদিক একবার ওদিক চাহিতেছিল এখন বলিল, "দাদা মহাশয়! কি করে গাছ থেকে ফল হয়, ফল কে দিয়া যায়? কিরূপে ফল হইতে বীজ হয় ও বীজ হইতে আবার গাছ হয়? সমস্ত আমাকে বুঝাইয়া বলনা। আমার বড় শুনিতে ইচ্ছা হইতেছে।" নবীঃ—সে যে অনেক কথা! আচ্ছা তবে মন দিয়া শুন। আর,—একটী গোলাপের কুড়ি আন দেখি।"—নলিন আনিল।

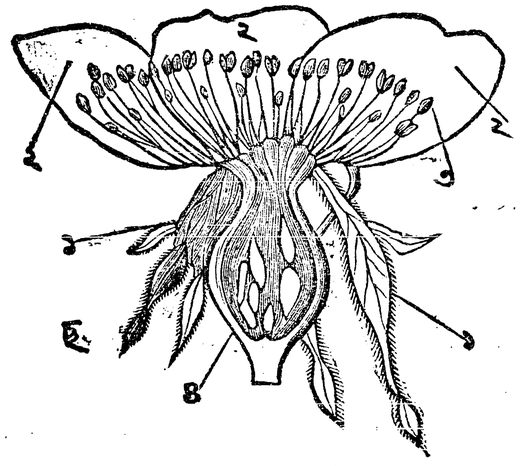

নবীনবাবু আস্তে আস্তে কুঁড়িটী ছাড়াইতে ছাড়াইতে বলিলেন, এই উপরেই পাঁচটী সবুজ বর্ণের পাতার মত দেখিতেছ? (সকলে "হাঁ") বেশ তার পরে ফুলের পাপড়ী গুলি কেমন সুন্দর ভাবে উপর্য্যুপরি লাগিয়া রহিয়াছে! যেন আলাদা করা কঠিন, এই দেখ একটা ছাড়িয়া গেল। ক্রমে এই সবগুলি খুলিলাম, ফুলটী এখন ফুটন্ত হইল। তার পরে দেখ কতকগুলি কি পরস্পরের সহিত জড়াইয়া রহিয়াছে। (ছুরি দিয়া সোজা দিকে ফুলটী চিরিয়া ফেলিলেন!) দেখ দেখ! ইহার মধ্যে আবার কিরূপ ব্যাপার দেখ! লেবুর কোষার মত অতি কচি কচি কি সব ঠেষাঠেষি করিয়া রহিয়াছে! আচ্ছা, আর একটা বড় ফুটন্ত ফুল আন (বিনয় আনিল;—



সেটীও তেমনি চিরিলেন) ইহার ভিতরেও দেখ ঠিক সেই রকম। (১৩৪ পৃষ্ঠায় 'ছ' চিহ্নিত চিত্র দেখ!) আচ্ছা বলদেখি এ সব কি?" (সকলে—জানিনা) কিশোরী আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—"কি চমৎকার দাদা মহাশয়—এমন কৌশলে ফুল থাকে! ছি ছি! আমরা রোজ ফুলবাগানে কার্য্য করিতে আসি, কিন্তু এমন যে কৌশল এই ফুলগুলির মধ্যে বসিয়া রহিয়াছে তাহা জানি নাই। দেখুন দাদা মহাশয়! আপনি আমাদিগকে সব সুন্দর বস্তু দেখাইয়া বুঝাইয়া দিন। এ ফুলের সব আমরা বুঝিয়া তবে ছাড়িব। কেমন?" কিশোরী বড় ভাল বালক, তাহার হৃদয় মন ফুলের কৌশল দেখিয়া একেবারে গলিয়া গিয়াছে। নবীঃ—"এখনি কি হইয়াছে? যখন সমস্ত বুঝাইয়া দিব তখন দেখিবে যে ঈশ্বরের মহিমা যথার্থই অসীম।

"এই ফুলটী তাহাহইলে ঠিক চারি অংশে নির্ম্মিত। ১ম—বাহিরের সবুজ পাতার মত অংশটী; ২য়—পুষ্পের সুবর্ণ পাপড়ী; ৩য়—এক একটী সরু কাটীর মাথায় মাকুর মত; ৪র্থ—লেবুর কোষার মত। যেমন এই চারিটী অংশ গোলাপে দেখিতেছ, সেইরূপ, সমস্ত পুষ্পেই আছে। যে ফুল ইচ্ছা লইয়া আইস, দেখিবে এই ৪টি অঙ্গ আছেই। তবে এক জাতীয় ফুল আছে তাহাদের হয়ত ১ম, না হয় ২য়, না হয় উভয় অঙ্গই নাই। আবার কতক গুলি ফুলের হয়ত তিন অঙ্গ নাই, কোন জাতীয়ের ৪র্থ অঙ্গ নাই,—যথা লাউ কুমড়া ফুল। কিন্তু সাধারণতঃ প্রায়ই দেখা যায় যে পুষ্প মাত্রেরই এই ৪ প্রকার, অন্ততঃ ৩ প্রকার অঙ্গ আছে। (সকলে "আমরা দেখিব"।) লোকে ফুলের পাপড়ী গুলিরই সৌন্দর্য্য দেখে, সুগন্ধেই মুগ্ধ হয়, ফুলের দ্বারা যে কত মহা উপকার সাধিত হয় তাহা দেখিতে পায় না, সকল ফুলেরই যে এই ৩।৪টী ভিন্ন জাতীয় অঙ্গ আছে তাহাও দেখে না।"

আমরা আশা করি সখার পাঠকপাঠিকাগণ এখন হইতে মন দিয়া সমস্ত বস্তু নিরীক্ষণ করিবেন ও নিজ নিজ বিজ্ঞ বন্ধুদিগের নিকট হইতে এইরূপে জ্ঞান লাভ করিবেন। নবীন বাবু বলিতে লাগিলেন;—"জগতে কত ফুল ফোটে কে তাহার সন্ধান লয়, কে তাহাদের উপকারিতা অন্বেষণ করে? আমরা সকলে অজ্ঞান ও স্বার্থপর। যাহাতে লাভ আছে তাহাই খুঁজি। তোমরা সকলেই আম্র খাইয়াছ, কিন্তু বৃক্ষ হইতে কি রূপে যে আম্র উৎপন্ন হইল, তাহার সন্ধান কি লইয়া থাক? এখনত গাছে আম নাই, জৈষ্ঠ মাসে আম কোথা হইতে আইসে, বল দেখি? (সকলে "বৌল হইতে") বৌল হইতে আম্র কি রূপে কোন্ উপায়ে হয় তাহা কি দেখিয়াছ? ("না") এইবার যখন বৌল হইবে তখন দেখিও; দেখিবে যে বৌল আমের ফুল বৈ আর কিছুই নহে। উহা

ফুল। একটী ডালে অনেকগুলি ফুল দল বাঁধিয়া জন্মে। তাহাদের এক একটী ফুল বেশ করিয়া দেখিলে দেখিতে পাইবে যে তাহারও এইরূপ ৪টী স্বতন্ত্র অঙ্গ আছে (উপরের "খ" চিত্র দেখ) কিন্তু অতি ছোট। ছোট ছোট ৫টী সবুজ "বহিরাবরণ," ছোট ছোট ৫টী "পাপড়ী" ছোট ছোট ৫টী "পরাগ কেশর" (তৃতীয় অঙ্গ), ও একটী ক্ষুদ্র "গর্ভকেশর" সকলের মধ্যস্থানে রহিয়াছে। তদ্রূপ বেল, আতা, পেয়ারা, চালতা, লেবু, লাউ, কুমড়া, শসা প্রভৃতি যত ফল আছে সকলেরই জন্ম ফুল হইতে। ফুলের ১ম ও ২য় অঙ্গ দুটী না থাকিলেও হানি হয় না কেবল ৩য় ও চতুর্থ অঙ্গ দুইটী ফলোৎপাদনের মূল; যেমন পান গাছ ও ঝাউ গাছে যে ফুল হয়, তাহাদের ১ম ও ২য় অঙ্গ নাই অথচ সে ফুল হইতে ফল জন্মে। তবেই দেখা গেল যে ১ম অঙ্গটী কেবল অন্য সকলগুলিকে ঢাকিয়া রাখে, নষ্ট হইতে দেয় না, ও ২য়টী শোভাবর্দ্ধনের জন্য

যথার্থ বংশ বৃদ্ধির জন্য অপর ২য়টী অঙ্গ। তাহাদের মধ্যে পারগকেশরগুলি অপেক্ষা আবার গর্ভকেশরের অধিকতর নিকট সম্বন্ধ; কেন না ঐ গর্ভকেশরই পরিপক্ক হইয়া ফলরূপে পরিণত হয়। পরাগকেশরের অগ্রভাগস্থ মাকুর মত থলি এক প্রকার চূর্ণ (গুঁড়া) দ্বারা পূর্ণ। সময়ে ঐ থলি ফাটিয়া যায় ও চূর্ণগুলি বাহির হইয়া পড়ে। ঐ চূর্ণ গর্ভকেশরের অগ্রভাগে পড়িলেই গর্ভকেশর পরিপক্কতা প্রাপ্ত হয়। ইহাই ফলের আদিম অবস্থা। আম্রের বৌলে, লেবুর ফুলে ও অন্যান্য সকল ফুলেরই একটু পরিণত অবস্থায় ঠিক মধ্যস্থলে একটী ছোট সবুজ বর্ণের ফল দেখিতে পাওয়া যায়। আবার কড়াই শুঁটীর একটী ফুল সোজা চিরিয়া দেখিলে দেখা যায় যে এই গর্ভকেশর ক্রমে বড় হইয়া "বীজকোষ" হইয়াছে, তাহা ঠিক কড়াই শুঁটীর মত আকার পাইয়াছে, এমন কি তাহার মধ্যে ছোট ছোট

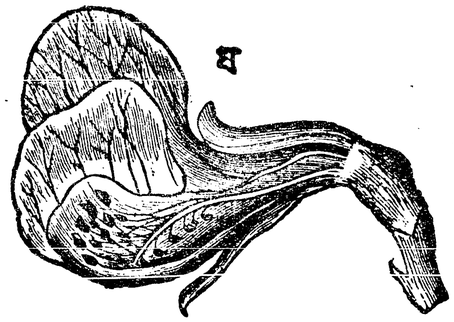


শুঁটীর দানাগুলি পর্য্যন্ত দেখা যায় (উপরে "ঘ" চিহ্নিত চিত্র দেখ)। ইহার পর ফুলের পাপড়ী ও অন্যান্য অঙ্গগুলি ক্রমে শুকাইয়া যায়, কেবল এই পক্ক গর্ভকেশর অর্থাৎ "বীজকোষ" ক্রমে ক্রমে পরিণত ও বর্দ্ধিত হইতে থাকে।

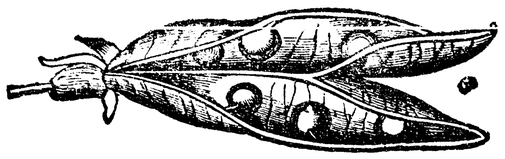


অবশেষে কিছুকাল পরে ইহাই ফল হইয়া দাঁড়ায়, ভিতরের শুঁটীগুলি তখন বেশ বড় বড় হইয়া উঠে, তখন উহাকে চিরিলে ঠিক উপরের "ঙ" চিহ্নিত ছবির মত দেখায়। সুতরাং দেখ কেমন আশ্চর্য্য

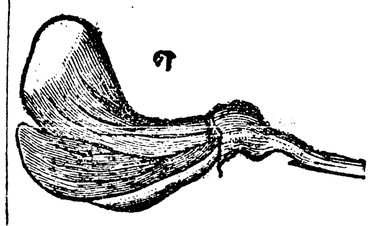


কৌশল ও সুন্দর নিয়মে "গ" চিহ্নিত কড়াই এর ফুলটী হইতে কেমন ফলটী উৎপন্ন হইল। এইরূপে পৃথিবীর প্রায় সমস্ত ফলই ফুল হইতে সৃষ্ট হয়, ফুল না হইলে ফল জন্মিতে পারে না।"

কিশোঃ—"তবে ডুমুরের ত ফুল হয় না?"—

নবীঃ—কে বলিল ডুমুরের ফুল হয় না? অবোধ স্ত্রীলোকেরা ও মূর্খ লোকেরাই ডুমুরের বড় বড় ও স্পষ্ট ফুল না দেখিয়া ঐরূপ কহে। কিন্তু বাস্তবিক ডুমুরের অসংখ্য ফুল হয়। বুঝাইয়া দি শুন। গাছে যে ফুল ধরে তাহা নানারূপে অবস্থিত হয়। গোলাপ, মল্লিকা, জবা প্রভৃতি বৃক্ষে একটী বৃন্তে (বোঁটায়) একটীর অধিক ফুল হয় না। অনেক বৃক্ষেই কিন্তু ফুল সকল গুচ্ছ বাঁধিয়া এক বোঁটায় অনেক ফুল ধরে, যেমন আম, জাম, নারিকেল, তাল, শুপারি, কলা প্রভৃতি। একটী বৃন্তে অনেক ফুল গোছা বাঁধিয়া থাকে, তাহার আবার নানা প্রকার ভেদ আছে। নারিকেল প্রভৃতির "মুল" বোঁটাটীর গায়ে সংলগ্ন হইয়া থাকে, আম্র প্রভৃতি বৃক্ষের ফুল সকল আর এক রকমে ধরে;—সেইরূপ গাঁদা, রাধাপদ্ম, প্রভৃতি কয়েক জাতীয় ফুল আছে তাহারা সহসা দেখিতে একটী মাত্র ফুল বোধ হয়, কিন্তু বিশেষ করিয়া দেখিলে জানা যায় যে তাহারা

একটী পুষ্প নহে। অসংখ্য ফুল সকলের গুচ্ছ। গাঁদার যাহাকে এক একটী পাপড়ী বোধ হয়, তাহারা প্রত্যেকেই এক একটী স্বতন্ত্র পুষ্প, ("স্ব" চিত্র দেখ) একমাত্র বোঁটায় আবদ্ধ। বেশ মন



মন দিয়া শুন। গাঁদা একটী ফুল নয় বুঝিলে, সেইরূপ অন্যান্য কয়েক জাতীয় পুষ্প আছে তাহাদের বৃন্তের অবস্থার এত পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে যে তাহাদিগকে আদৌ ফুল বলিয়াই চিনা যায় না। গাঁদা ফুলের বোঁটা নীচে থাকে, খুব মোটা হইয়া ফুলিয়া উঠে, তাহার উপর হইতে সব ফুল বাহির হয় (জ চিত্র দেখ)। অন্যান্য বৃক্ষের পুষ্পগুচ্ছের নিয়ম ভিন্ন রূপ। যথা কদম্ব পুষ্পের বোঁটা খুব ফুলিয়া গোল ভাঁটার মত হয় ও তাহার চারিদিকে গোলাকারে ফুল ধরে। কাঁঠালের বোঁটা ফুলিয়া ও লম্বা হইয়া তাহার "ভোঁতাটা" হয়। ইহারই চারিদিকে ফুল ধরে। হয় ত তোমরা আশ্চর্য্য হইতেছ, কচি কাঁঠাল যাহাকে বল, তাহা ফুল!! তোমরা বরং পরীক্ষা করিয়া দেখিও কচি কাঁঠাল হস্তে রগ্‌ড়িয়া কেমন সুন্দর গন্ধ দেখিতে পাইবে। সেইরূপ আর এক জাতীয় আশ্চর্য্য জনক পুষ্পগুচ্ছ আছে তাহা বড় চমৎকার। ইহার বোঁটাটীর চারিদিকে বৃদ্ধি পাইয়া ফুলগুলিকে একেবারে ঢাকিয়া ফেলে, এইরূপে গোল পানা বোঁটাটীর ভিতরে অসংখ্য ফুল থাকিয়া যায়, এই গোল বোঁটাটী বাহির হইতে দেখিতে ঠিক ফলের মত। কিন্তু বাস্ত-

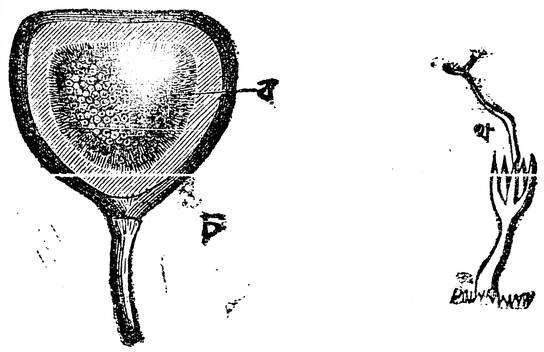


বিক ইহা অগণ্য ফুলের সাধারণ বোঁটা!! কি চমৎকার! অশ্বত্থ, বট প্রভৃতি বৃক্ষের ফুল এই জাতীয়; বাহিরে কিছুই নাই, ঠিক যেন একটী ফল। চিরিয়া দেখিলেই ভিতরে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুল দেখা যায়। এই সকল ফুলের পূর্ব্বমত অঙ্গ সকলও আছে, কিন্তু অনুবীক্ষণের সহায়তা ব্যতীত স্পষ্ট দেখা যায় না (উপরে চ ও থ চিহ্নিত চিত্র দেখ)। এখন বুঝিলে ডুমুরের ফুল হয় কি রূপে। পরমেশ্বরের যে কি প্রগাঢ়জ্ঞান, কি অশেষ কৌশল, কি অপূর্ব্ব বিচিত্রতা, কি অপার মহিমা তাহার ঈয়ত্তা নাই!!

এই রূপে ফুল হইতে ফলের উৎপত্তি হয়। এই ফলই বৃক্ষাদির ডিম্বের তুল্য। ডিম্বের মধ্যে যেমন ভাবী জীবের বীজ অবস্থিতি করে, তেমনি ফলের ভিতরও ভাবী বৃক্ষাদির উৎপত্তির নিদান স্বরূপ বীজ থাকে। ডিম্বের ভিতরে যেমন ঐ বীজের পোষনোপযোগী পদার্থ সকল থাকে, এই ফলের ভিতরস্থ সেই সূক্ষ্ম বীজটীর পোষণ ও বর্দ্ধনের জন্যও উপযুক্ত সামগ্রী আছে। নারিকেলের ভিতর বীজটী অতি সূক্ষ্ম, কিন্তু উহার পুষ্টিকর পদার্থ যে কত তাহা কাহারও অবিদিত নাই। যে জল উহার মধ্যে থাকে তাহা ক্রমে ক্রমে কমিয়া আসে এবং উহার বীজ ঐ জলের সারভাগ গ্রহণ করে ও জলীয় অংশ শুকাইয়া যায়, ক্রমে শাঁস বর্দ্ধিত হয়, অবশেষে ঐ শাঁসও বীজের বর্দ্ধনের জন্য ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে থাকে। এদিকে বীজটী ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া নারিকেলের মধ্যস্থ শূন্য স্থানটী সমুদায় অধিকার করিতে থাকে, তাহাকে আমরা সচরাচর "ফোঁপল" বলিয়া থাকি। শেষে নারিকেলের বোঁটার দিক ফুঁড়িয়া বীজের অঙ্কুর বাহির হয়, ও একটী নূতন নারিকেল গাছ প্রস্তুত হয়!! সেই রূপে একটী ছোলা ভিজা মাটিতে ফেলিয়া রাখিলে উহার উপরিস্থ খোসা ফুঁড়িয়া অঙ্কুর বাহির হয়, ও আস্তে আস্তে বীজদল দুটী ভিন্ন করিলে তন্মধ্যে ঐ অঙ্কুরের পত্র প্রভৃতি দেখা

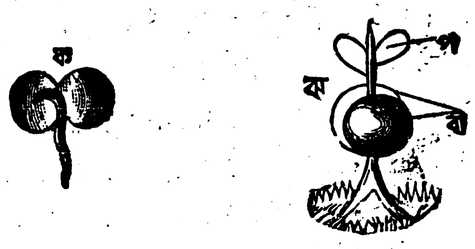


যায় ( 'ক' চিহ্নিত চিত্র দেখ )। সেই রূপ তেঁতুলের বীচি মাটীতে পড়িলে প্রথমে খোসা ফাটিয়া দুটী বীজদল ( 'ঝ' চিত্র দেখ) বাহির হয়, তৎপরে তাহাদের মধ্য দিয়া উহার পত্রাদি উপরে উঠে ও শিকড় নীচে চলিয়া যায়। অঙ্কুরটীর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বীজদল দুটীও উচ্চে উঠে ও পরিষ্কার দেখা যায়। তাহার পরে ক্রমে নূতন হরিদ্বর্ণ পত্র বাহির হয়। এই রূপে অবশেষে প্রকাণ্ড বৃক্ষ হইয়া উঠে। তাহাতে আবার প্রতি বৎসর অগণিত ফুল হয়। ঐ ফুলে ফল জন্মে, এই ফল গুলির কতক মনুষ্য ও অন্যান্য জীবগণ আহার করে; তাহাদের বীজ মৃত্তিকায় পড়িয়া আবার অগণিত বৃক্ষের সৃষ্টি হয়। এই রূপে বৃক্ষ লতাদির বংশবৃদ্ধি অতি আশ্চর্য্য কৌশলে চিরকাল নিষ্পন্ন হইয়া থাকে।—"

"এ সম্বন্ধে আরও অনেক কথা আছে পরে বলিব। আজ রাত্রি হইয়াছে, চল বাড়ী যাই।" এই বলিয়া নবীন বাবু গাত্রোত্থান করিলেন। তাঁহার সঙ্গে বালকগণ অনেক নূতন বিষয় শিক্ষা করিয়া চিন্তা করিতে করিতে বাটী গমন করিলেন।

---

## সিংহ ও মাতাল।

ভীমসিং, বিউগেলদার—উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের কোন যায়গায়, সৈন্যদলে বিউগেল বাজায়। বিউগেল কাহাকে বলে, তাহা বোধ হয় জান। সানাইয়ের মত একটা যন্ত্র, তাহার শব্দের ইঙ্গিতে গোরাদের সমস্ত কাজ কর্ম্ম হয়। যাক্—ভীমসিংহ সৈন্যদলে বিউগেল বাজায় এবং মনের সুখে দিন কাটায়, সৈন্যদের মধ্যে অনেকেই তাহাকে ভাল বাসে। কিন্তু তা' হইলে কি হয় সে বড় মদ খাইত। যখন কাজ কর্ম্ম থাকিত না, তখনই গিয়া দেখ ভীমসিং চোখ লাল করিয়া বসিয়া আছে। এইরূপে অনেক দিন যায়;—এক দিন বিকালবেলা, ভীমসিংহ অন্য দুই তিন জন সঙ্গীর সহিত, তাহাদের কেল্লার নিকটে বনের ধারে বসিয়া মদ খাইতেছিল—বিউগেল কোমরে বাঁধা আছে। ক' বোতল মদ তাহারা খাইয়াছিল, আমরা তাহার কোন খবর পাই নাই; তবে ভীমসিংহের বড়ই নেসা হইয়াছিল, একথা আমরা শুনিয়াছি। সঙ্গীরা তাহার রকম সকম দেখিয়া সরিয়া পড়িল—ভীমসিংহও যাইতে চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু উঠিতে পারিল না—সেইখানে পড়িয়া গেল। চোখ বুঝিয়াই ভীমসিংহ স্বপ্ন দেখিতে লাগিল 'যেন সে রাজা হইয়া গদীতে বসিয়াছে—আর চোখ্ রাঙ্গাইয়া সকলকে হুকুম করিতেছে আর সকলে তাহার সিংহাসন কাঁধে করিয়া একবার রাজসভাতে এক বার এখানে, একবার সেখানে লইয়া বেড়াইতেছে'! ভাল, ভীমসিং! তুমি তোমার সুখের স্বপ্ন দেখিতে থাক, আমরা ইতিমধ্যে পাঠক পাঠিকাকে আর কি ঘটিয়াছিল, সে কথা বলিয়া ফেলি।

প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে।—যে বনের কাছে ভীমসিং পড়িয়াছিল, তাহাতে সিংহ বাস করিত, সুতরাং সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে দেখিয়া পশুরাজ উদরের চেষ্টায় বাহির হইলেন। পশুরাজ বাহির হইয়া দেখিলেন, বা! বা! বা! একটা মানুষ পড়িয়া আছে—তাইতো বিনা পরিশ্রমের শিকার! সিংহ নিকটে আসিয়া দেখিল বেশ জোরাল মানুষ, দু এক দিনের খাবার বেশচ লিবে,

তখন বিনা আপত্তিতে তাহাকে পিঠের উপরে ফেলিয়া পশুরাজ ঘরে চলিলেন।

যখন সিংহ ভীমসিংকে পিঠে করিয়া লইয়া যায়, তখন ভীমসিংহ ভাবিতেছিল হয় রাজবাড়ীর চাকরেরা তাহার সিংহাসন বহিয়া লইয়া যাইতেছে, না হয় তাহার বন্ধুরা তাহাকে কেল্লায় লইয়া যাইতেছে। কিন্তু খানিকটা যাইতে যাইতে তাহার একটু নেশা ছুটিল। তখন সে চোখ খুলিয়া দেখিল সিংহের পিঠে মা দুর্গার মত কোথায় যাইতেছে—সিংহ তাহার পেটের এক ধার কামড়াইয়া আছে, পাছে পড়িয়া যায়। তবেই তো কি হবে? হঠাৎ তার বিউগেলের কথা মনে পড়িল—যদি বিউগেলে বিপদের সময়কার শব্দ করিলে কেল্লা হইতে লোক আসিয়া সাহায্য করে। এই ভাবিয়া সে আস্তে আস্তে কোমর হইতে বিউগেলটী খুলিয়া লইল, এবং তাহাতে শব্দ করিল।

টু—টু—উ—উ—উ—উ—উ

বেচারা সিংহ চমকিয়া উঠিল, ভাবিল এ আবার কি?—এবং চমকিয়া দাঁড়াইল। মাতাল

দেখিল শব্দে কাজ হইয়াছে। আবার বাজাইল টুট্টু—টূ—টূটু—টূটু—টূ—টু—উ—উ—উ—উ। এবার সিংহ ভয়ে ছুটিতে লাগিল, কিন্তু বিউগেল আর থামে না।

টূটু—ভু পূঁ—ভো পোঁ—টু-টু-টু-টু-টু-টু-উ-উ-উ। বেচারা সিংহ আর কি করে, চার ধারে ছুটো-ছুটি করিয়া শেষকালে শিকার ফেলিয়া মার দৌড়। ভীমসিংহও ভাবিল বাঁচিলাম, সিংহও ভাবিল 'বাঁচিলাম'।

ইতিমধ্যে এই শব্দ কেল্লার লোকদিগের কাণে পৌছিয়াছিল। তাহারা ভীমসিংহের কোন বিপদ হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া বন্দুক, লাঠি, তরবার লইয়া ছুটিয়া আসিতেছিল, কিন্তু পথেই ভীমের সহিত দেখা হইল। ব্যাপার কি শুনিয়া সকলেই হেসে আকুল।

যাহা হউক, সিংহের পিঠে ভগবতীর মত চাপিয়া মাতালের একটা উপকার হইল, সেইদিন হইতে সে প্রতিজ্ঞা করিল, 'আর কখনও মদ খাইব না'। সে অনেক দিনের কথা। আমরা শুনিয়াছি তাহার সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয় নাই। ভীমসিং আজও মদ খায় না।

---

"সহচরী" হইতে পরিবর্ত্তিত।

## নরেনের স্বর্গ দর্শন।

### ( উপকথা )

ঠাকুরমার গল্প না শুনিলে নরেনের ঘুম আসিত না। সন্ধ্যা হইলেই নরেন ঠাকুরমার কাছে গিয়া বসিত ও কত রকম গল্প শুনিত। ঠাকুরমার গল্প ঠাকুরদের কথা লইয়াই হইত। ঠাকুরদের কথা বলিতে গেলেই স্বর্গের কথা আসিত; ইন্দ্রভুবন, পারিজাত কানন, কিন্নর, অপ্সরা, বিদ্যাধরী, প্রহ্লাদচরিত্র, ধ্রুবচরিত্র ইত্যাদি কত রকম গল্প হইত। নরেন এই সকল কথা এক মনে শুনিত, নরেনের মনে হইত স্বর্গ কি দেখা যায় না? স্বর্গ দেখিবার জন্য নরেনের বড়ই ইচ্ছা হইল।

নরেনের অবিনাশ কাকা নরেনকে একখানি ছবির বই দিয়াছিল। নরেন ছবি দেখিতে বড় ভাল বাসিত। ঘরের এক কোণে নরেন ছবি দেখিতেছিল। প্রথম ছবি খানি ইন্দ্রালয়। সহস্রলোচন ইন্দ্রদেব সিংহাসনে বসিয়া আছেন, সম্মুখে অপ্সরাগণ নৃত্য করিতেছে। সিংহাসনের চতুর্দ্দিকে গন্ধর্ব্ব বালকগণ দাঁড়াইয়া; তাহাদের কেমন হাসি হাসি মুখ। নরেনের ইচ্ছা হইল ঐ বালকদিগের সহিত খেলা করে। এমন কি চারিদিক চাহিয়া ছবির বালকগণকে নরেন বলিয়াছিল "আমার সঙ্গে ভাব কর্‌বে, আমি সন্দেশ দিব"। আর একখানি ছবি, পদ্মবনে বীণাপাণি সরস্বতী বীণা হস্তে বসিয়া আছেন, সম্মুখে ছোট ছোট বালকগণ বসিয়া পড়িতেছে। স্বয়ং বীণাপাণি বালকগণকে পড়াইতেছেন। নরেন গুরু মহাশয়ের কাছে পড়িতে ভাল বাসিত না। গুরু মহাশয় বড় ধমক দেন। ছবির বালকদিগের সহিত বসিয়া নরেনের পড়িবার ইচ্ছা হইল। তৃতীয় ছবিখানি বৈকুণ্ঠধাম। শ্রীকৃষ্ণ বালক ধ্রুবের হস্ত ধরিয়া লক্ষ্মীর সম্মুখে উপস্থিত। লক্ষ্মী দুই হাত বাড়াইয়া কত আদর করিয়া ধ্রুবকে কোলে লইতেছেন। এইরূপ অনেকগুলি মনোহর ছবি দেখিয়া নরেনের স্বর্গ দেখিবার সাধ আরও প্রবল হইল। কাহার না হয়?

নরেন মনে করিল, ঠাকুরমা স্বর্গ দেখিবার সন্ধান বলিতে পারেন। এক দিন নরেন ঠাকুরমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল "হ্যাঁ, ঠাকুরমা, ঐ যে আকাশ দেখা যাচ্ছে, অ্যাঁ ঐ যে চাঁদ উঠেচে অ্যাঁ ওর ভিতর কি স্বর্গ আছে?" ঠাকুরমা বলিল,



"হ্যাঁ দাদা ওরই ভিতর স্বর্গ আছে।" "আচ্ছা, ঠাকুরমা স্বর্গ কি দেখা যায় না?" "এখানকার লোকে কি স্বর্গ দেখিতে পায়। এখন যে ঘোর কলি পাপে ভরা। সে কালের লোকদের সঙ্গে ঠাকুর দেবতারা কথা কহিতেন। তারা স্বর্গ দেখিতে পাইতেন!"

নরেন তাহার অবিনাশ কাকাকে জিজ্ঞাসা করিল "হ্যাঁ কাকা আকাশের ভিতর যাওয়া যায়?" "তুর, আকাশের কাছে গেলে মানুষ মরে যায়, আকাশ কেবল ধোঁয়া বইত নয়।" "তবে দেবতারা থাকে কেমন করে।" নরেনের কাকা হাসিয়া বলিল, "দেবতারা কি আর আছেন, তাঁরা ধোঁয়ার ভিতর দম আট্‌কে মরে গেছেন। তেত্রিশ কোটি দেবতার মধ্যে কেবল একজন আছেন, কিন্তু তাঁকে লইয়াও টানাটানি হইতেছে।" নরেন বুঝিল কাকা তামাসা করিলেন।

একটু সূর্য্যকিরণ নরেনের বাক্সের মধ্যে ঢুকিয়া খেলা করিতেছে। কখন একটি বেলোয়ারির মার্বেলের উপর পড়িয়া কত রকম রং ফলাইতেছে। আবার সরিয়া যাইতেছে, আবার আসিতেছে। নরেন এক দৃষ্টে বাক্সর দিকে চাহিয়া স্বর্গ দেখিতেছিল হঠাৎ মনে হইল, কিরণ স্বর্গে থাকে, বলিতে পারে কিরূপে স্বর্গ দেখা যায়। ছেলে বুদ্ধি তাড়াতাড়ি কিরণ টুকুকে হাত চাপা দিয়া ধরিল "অ্যাঁ, তুমি আমার খেলানা লইয়া খেলা করিতেছ, আজ তোমায় ছাড়িব না, আগে বল আমায় স্বর্গ দেখাইবে?" কিরণটুকু হাসিতে হাসিতে নরেনের আঙুলের ফাঁক দিয়া পলাইয়া গেল, নরেন শুনিতে পাইল কে যেন বলিল "সহজে কি স্বর্গ দেখা যায় দিব্য চক্ষু পাইবার চেষ্টা কর, তবে স্বর্গ দেখিতে পাইবে।"

দিব্য চক্ষু পাইলেই স্বর্গ দেখা যায়! তবে আর কি নরেনের দুটি টাকা ছিল, বাক্স হইতে টাকা দুটি লইয়া কেষ্টোর দোকানে ছুটিল। "কেষ্টো, কেষ্টো? দিব্যচক্ষু আছে।" "দিব্যচক্ষু না বাবু আমরা দিব্যচক্ষু বেচি না, লজঞ্চুষ চাই?" দিব্যচক্ষু কিনিতে পাওয়া গেল না।

এক দিন নরেন বাগানে বেড়াইতেছে, একটি সুন্দর গঙ্গাফড়িং আসিয়া একটি গোলাপ ফুলে বসিল। নরেনের একটি পাখী ছিল, পাখীকে খাওয়াইবার জন্য নরেন ফড়িং দেখিলেই ধরিত। এটিকেও পা টিপে টিপে যাইয়া ধরিল। কিন্তু ফড়িং কথা কহিয়া উঠিল। তাইত ফড়িং কি পাখীর মতন পড়িতে পারে? এমন সুস্বরে কথা কয় কে? নরেন এমন কথা ত কখন শুনে নাই! অবাক হইয়া ইতস্ততঃ চাহিয়া দেখিল তাহার হাতের ভিতর ফড়িংটির উপর বসিয়া একটি পরমা সুন্দরী স্ত্রীলোক—প্রজাপতির ন্যায় পোষাক। পরিধানে প্রজাপতির ডানা। দেখিতে বড়ই সুন্দর। তিনিই নরেনকে বলিতেছিলেন "ছি বাবা, কাহাকেও পীড়ন করা ভাল নয়,ফড়িংটি ছাড়িয়া দাও, অনেক দূর আসিয়া বড়ই কষ্ট হইয়াছে, তাই তোমার গোলাপ ফুলে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছিল। সন্ধ্যা হইল, ছাড়িয়া দাও, আমাদের অনেক দূর যাইতে হইবে।" নরেন আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল "তোমার বাড়ী কতদূর।" "ঐ যে আকাশে একটী আলো দেখিতে পাইতেছ ঐ খানে আমার বাড়ী।" এই বলিয়া নরেনকে একটি আকাশের তারা দেখাইয়া দিল। "ও তবে তুমি স্বর্গে থাক, তোমায় কখন ছাড়িব না। একবার আমাকে স্বর্গ দেখাইতে পার, তা হ'লে ছাড়িয়া দিই, নতুবা আমার বাক্সর ভিতর পুরিয়া রাখিব।" সুন্দরী বড়ই বিপদে পড়িলেন। স্ত্রীলোকটী আর কেহ নয় স্বর্গের একটী অপ্সরা। অপ্সরা নরেনের আবদার শুনিয়া অবাক। নরেন তাহাকে ভাবিতে দেখিয়া বলিল, আচ্ছা স্বর্গ না দেখাইতে পার, আমাকে দিব্যচক্ষু দাও তা হ'লে তোমাকে ছাড়িয়া দিতেছি।" "দিব্যচক্ষুর যে দাম অনেক।" "কত দাম আমি

এখনি তোমায় টাকা দিতেছি।" অপ্সরা বলিল "বোকা ছেলে, স্বর্গের জিনিষ কি তোমাদের সামান্য টাকায় পাওয়া যায়, স্বর্গের টাকা চাই? তা এক কাজ কর তোমাকে একটি ছোট কৌটা দিতেছি—একটি সুকাজ করিলেই কৌটার মধ্যে একটি টাকা আপনি আসিবে; কিন্তু একটি কুকাজ করিলেই জমানো টাকা হইতে একটি উড়িয়া যাইবে। এইরূপে যখন তোমার এক কৌটা টাকা হইবে, আমি আসিয়া তোমায় দিব্যচক্ষু দিব।"

নরেন হাঁ করিয়া কথা শুনিতেছিল, ফড়িং আলগা পাইয়া এক লাফে চলিয়া গেল। নরেন কৌটা লইয়া নাচিতে নাচিতে বাড়ী আসিল। নরেন বাটীতে প্রবেশ করিয়া দেখিল, একজন ভিখারী একটী পয়সার জন্য চীৎকার করিতেছে। নরেনের কাছে পয়সা ছিল, কিন্তু ভিক্ষুককে দিবার ইচ্ছা ছিল না। নরেন ভিক্ষুককে তাড়াইবার চেষ্টা করিতে ছিল এমন সময় তাহার অবিনাশ কাকাকে জানলায় দেখিতে পাইল। অবিনাশ কাকা নরেনকে দান করিতে দেখিলে বড় খুসি হন এবং দানের চতুর্গুণ পুরস্কার দেন। কাকাকে দেখিয়া নরেন ভিখারীকে দুইটী পয়সা দিল। সে দিন নরেনের কাকা বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, নরেনকে একটি আধুলি বকসিস দিলেন। নরেন মনে করিল দেখি দেখি কৌটায় টাকা আসিয়াছে কি না, ভিখারীকে পয়সা দেওয়া ত খুব ভাল কাজ! কৌটা খুলিয়া দেখিল ফোকা। কে যেন বলিল "আধুলির লোভে পয়সা দিয়াছিলে, আধুলি পাইয়াছ আর টাকা পাইবে না।"

নরেনের বন্ধু বরেনের বড় জ্বর। নরেন বরেনকে দেখিতে গিয়াছিল। বরেন ডালিমের জন্য বড় আবদার করিতেছে। মা বুঝাইতেছিলেন "ডালিম কোথা পাব, বাবা! ছিঃ কেঁদনা, এই দেখ ঘড়া বাঁধা দিয়া তোমার চিকিৎসা হইতেছে।" ছেলেয় তা কি শোনে; বরনের মার কথা শুনিয়া নরেনের বড়ই দুঃখ হইল, সে কাহাকে কিছু না বলিয়া কেষ্টোর দোকানে আসিয়া দুটি বেদানা কিনিয়া বরেনকে দিয়া আসিল। বরেনের মা কত আশীর্ব্বাদ করিল। ঠুন ঠুন! ওকি! নরেন কৌটা খুলিয়া দেখে দুটি চকচকে টাকা কৌটায় আসিয়াছে।

বাড়ী আসিয়া নরেন দেখিল, তাহার ছোট বোন "বুড়ী" তাহার এ, বি লিখিবার খাতা লইয়া হিজিবিজি কাটিতেছে। "পোড়ার মুখী, কি কচ্ছিস্" বলিয়া বুড়ীকে একটী চড় মারিয়া খাতা কাড়িয়া লইল। ঠুন! কৌটার একটি টাকা নাই।

একদিন নরেন কতকগুলি সিসের ফৌজ লইয়া খেলা করিতেছে। দুই দিকে দুই দল সৈন্য বন্দুক ঘাড়ে করিয়া খাড়া রহিয়াছে। নরেন এক বার একটীকে সরাইতেছে, ওটিকে সম্মুখে আনিতেছে, আর একটীকে পশ্চাতে দাঁড় করাইতেছে। ভয়ানক ব্যস্ত! তুমুল যুদ্ধের পূর্ব্বে কোন্ সেনাপতি স্থির থাকিতে পারেন? এ সময়ে বুড়ী ডাকিল "দাদা দাদা, আমার অতের নিশেন পয়ে গেল, অ্যা—!" আঃ এমন সময়েও বিরক্ত করে। এক বার মনে করিল ধমক দিয়া বুড়ীকে তাড়াইয়া দিই। কিন্তু আবার মনে পড়িল মা বলিয়াছেন "ছি ছোট ভাই-বোনের সঙ্গে কি ঝগড়া করে, তারা যে ছেলেমানুষ তাদের কি বুদ্ধি আছে।" যুদ্ধ থামাইয়া, নরেন বুড়ির রথের নিশান সারিয়া দিল। ঠুন! আবার টাকা আসিয়াছে। তাই ত স্বর্গের টাকা খুব সস্তা।

প্রথম প্রথম টাকার লোভে সৎকার্য্য করিয়া নরেনের এমনই অভ্যাস হইয়া গেল যে নরেন এখন আর ভুলেও অন্যায় কার্য্য করে না।

আজ নরেনের এক কৌটা টাকা। বড়ই আহ্লাদ। তুমি বলিতেছ নরেনের এত আহ্লাদ কেন, তোমার এক সিন্দুক টাকা আছে তোমার



ত এত আহ্লাদ হয় না। কেন হবে? এ টাকায় আর তোমার টাকায়? নরেন কি পরের অন্ন মারিয়া টাকা জমাইয়াছে, না অপরকে ঠকাইয়া নিজের কৌটা পূর্ণ করিয়াছে?

অপ্সরার কথা মিথ্যা হয় না। এখন স্বর্গ দেখিবার উপায় হইল। মনের আনন্দে নরেন বাগানে বেড়াইতেছে। এক জন বৃদ্ধ সন্ন্যাসী আসিয়া নরেনকে আশীর্ব্বাদ করিয়া দাড়াইল। নরেন কিছু জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বেই সন্ন্যাসী বলিতে লাগিল "তোমার হাতের কৌটা দেখিয়া আসিয়াছি, উহাতে স্বর্গের টাকা আছে, আমারও ঐরূপ এক কৌটা টাকা ছিল, কাল গঙ্গাস্নান করিবার সময় কৌটাটি জলে পড়িয়া গিয়াছে। বৃদ্ধ বয়সে স্বর্গে যাইয়া বাস করিব মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু সম্বল হারাইয়াছি, কেমন করিয়া যাই? অমাকে কৌটাটি যদি দাও তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে স্বর্গে চলিয়া যাই।—" সর্ব্বনাশ! সন্ন্যাসী তো জানিত কতকষ্টে এক কৌটা টাকা হয়। নরেনের এত যত্নের ধন চাহিতে তাহার লজ্জা হইল না?

কিন্তু নরেনের মনে এরূপ দ্বিধা উপস্থিত হয় নাই। নরেন ভাবিল, সন্ন্যাসী যে প্রকার বুড়ো হইয়াছে টাকা সংগ্রহ করিয়া স্বর্গে যাওয়া তাঁহার পক্ষে অসম্ভব, আমার বিস্তর সময় আছে, ইচ্ছা করিলে এমন কত কৌটা জমাইতে পারিব। নরেন অম্লান বদনে সন্ন্যাসীর হস্তে কৌটা দিল। সন্ন্যাসী কৌটা পাইয়া বলিল, "তোমার দান মিছা হইবে না, আমার নিকট একটী জিনিষ আছে তোমাকে দিই। চক্ষু মুদ্রিত কর।" নরেন চক্ষু মুদিল। সন্ন্যাসী নরেনের চক্ষুতে হস্ত বুলাইল। নরেন চাহিল। সন্ন্যাসী নাই। কিন্তু নূতন চক্ষে সে সকলই নূতন দেখিতে লাগিল।

নরেন যে দিব্য চক্ষুর জন্য ব্যস্ত হইয়াছিল সেই দিব্য চক্ষু লাভ করিল। সে পৃথিবীতে থাকিয়া স্বর্গের শোভা দেখিতে পাইল; পৃথিবীতে থাকিয়া স্বর্গের মনোরম সুখ পাইতে লাগিল। হে বালক বালিকাগণ! যদি পৃথিবীতে থাকিয়া স্বর্গ দেখিতে চাও, যদি মর্ত্ত্যে থাকিয়া স্বর্গসুখ লাভ করিতে চাও, তবে পরোকার কার্য্যে প্রাণ মন ঢালিয়া দাও। স্বার্থপরতা ও ছোট মন লইয়া আর থাকিও না।

## শিশু-স্বাস্থ্য-রক্ষা।

### পঞ্চম উপদেশ।

### নিদ্রা।

ঘর্ষণে ঘর্ষণে প্রস্তর ক্ষয় হয়, পরিশ্রমে শরীর ক্ষয় হয়, সেই ক্ষয় দূর করিবার জন্য শরীরের বিশ্রাম চাই। এই জন্যই নিদ্রা অতিশয় আবশ্যক। নিদ্রা সকলেরই প্রয়োজনীয় এবং যাহার সুনিদ্রা হয়, সেই সুস্থ ও সুখী। কোন কারণেই নিদ্রায় অন্যথা করা অনুচিত।

২৪ ঘণ্টার মধ্যে অন্ততঃ ৬।৭ ঘণ্টা নিদ্রা যাইবে। রাত্রিই নিদ্রার প্রকৃত সময়। সকাল রাত্রে শয়ন ও অতি প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিলে শরীর ভাল থাকে। অনেক ছাত্রের এমন অভ্যাস আছে যে তাহারা দিবসে আলস্য করিয়া কেবল রজনীতে অধ্যয়ন করে এবং ১২টা কি ১টা রাত্রির সময় তাহারা শয়ন করে, তাহাদিগের যত রোগ হয় এই রূপ অনিয়মই তাহার বিশেষ কারণ; সুতরাং কেহ এরূপ করিও না। ১০টা কি ১১টার সময়ে নিদ্রা যাওয়া কর্ত্তব্য। যে ঘরে শয়ন করিবে তাহা যেন পরিষ্কার বায়ুযুক্ত হয়। এক বিছানায় এক জনের অধিক শয়ন করা অন্যায়, যদি নিতান্তই তাহা করিতে হয়, তবে যাহাতে একজনের নিশ্বাস অন্যের শরীরে না লাগে এরূপ করিবে। গৃহমধ্যে বায়ুর প্রচুরতা আবশ্যক বটে, কিন্তু তাহা বলিয়া মুক্ত বায়ুপথে শয়ন করা অনুচিত। শয়নকালে অন্যান্য জানালা খুলিয়া দিয়া মস্তকের নিকটস্থ জানালা সকল আবদ্ধ করিয়া শয়ন করিবে। রাত্রির বাতাস নিদ্রিত ব্যক্তির শরীরে লাগিলে অপকারের সম্ভাবনা।

গুরুতর আহারের পরে চিৎ হইয়া শয়ন করা অনুচিত, বাম কি দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন করিবে। চিৎ হইয়া শয়ন করিলে নিশ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট হয়, সুতরাং নানা প্রকার ভয়ানক দুঃস্বপ্ন দেখা যায়। লোকে যাহাকে "বোবায় ধরা" বলে তাহাও এইরূপ কারণে উৎপন্ন হয়।

যদি কখনও কোন কারণ বশতঃ নিদ্রার আবির্ভাব না হয় তবে হাত পা স্থির ভাবে রাখিয়া মনে মনে পড়া বিষয়ক বা অন্য কোন চিন্তা করিবে। যদি তাহাতেও নিদ্রা না হয়, তবে এক হইতে একশত পর্য্যন্ত গণনা করিবে। এরূপ উপায়েই অনেকের নিদ্রাকর্ষণ হয়। কেহ কেহ শায়িত অবস্থায় পুস্তক লইয়া পড়িতে পড়িতে সহজে নিদ্রিত হইতে পারেন।

যদি এ সকল উপায় নিষ্ফল হয়, তবে উপযুক্ত চিকিৎসকের নিকট ব্যবস্থা লইয়া ঔষধ দ্বারা নিদ্রা আনায়ন করিবে।

---

## ষষ্ঠ উপদেশ।

### উপাসনা।

ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টিকর্ত্তা এবং তিনিই আমাদিগকে পালন ও সর্ব্বসুখ প্রদান করিতেছেন। সুতরাং আমাদিগের শরীর ও মন সম্বন্ধে যেমন নানা প্রকার কর্ত্তব্য আছে, ঈশ্বরের উপাসনাও তদ্রূপ।

উপাসনা দ্বারা ঈশ্বর সন্তুষ্ট হয়েন কি না সে কথায় কায নাই। কিন্তু কৃতজ্ঞতা মনুষ্যের স্বাভাবিক। যখন আমরা সামান্য উপকার পাইয়াই বন্ধুগণের নিকট অতিশয় কৃতজ্ঞ হই তখন যাঁহার নিকট হইতে সমস্ত পাইয়াছি তাঁহাকে হৃদয়ের সহিত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা কি আমাদের কর্ত্তব্য নহে?

উপাসনা করিলে মন সবল ও সুস্থ হয়, সৎ প্রবৃত্তি সকল সতেজ হয়, পাপের চিন্তা দূর হয় এবং পাপ করিবার ইচ্ছা কমিয়া যায়। নিষ্পাপ হইলে শরীর সুস্থ থাকে, সুতরাং উপাসনার এক ফল শারীরিক সুস্থতা লাভ।

অনেকে মনে করেন যে, ছাত্রদিগের উপাসনা করিবার কোন প্রয়োজন নাই। বৃদ্ধেরাই তাহা করিবেন। এ বিশ্বাস অত্যন্ত ভুল। শৈশবই আমাদিগের শিক্ষার সময়। এই সময়ে যাহা অবহেলা করিবে, তাহাই শিক্ষা হইবে না।

যাহারা উপাসনা করেন, তাঁহারা শারীরিক ও মানসিক কর্ত্তব্য পালনে তৎপর হয়েন। যাহারা ঈশ্বর প্রেমিক ও উপাসনাশীল, তাঁহারাই ধার্ম্মিক ও সচ্চরিত্র হয়েন, যাহারা ঈশ্বর মানে না ও উপাসনা করেনা, তাহারা কুচরিত্র ও পাপী হয়। অনেক উত্তম ছাত্রেরাই উপাসনাশীল। উপাসনার পরে সাহস ও স্ফূর্ত্তির সহিত অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হওয়া যায়।

অতএব দিবসে অন্ততঃ দুই বার উপাসনা করিবে। প্রাতে ও সন্ধ্যা সময়ে। এক এক বার অর্দ্ধ ঘণ্টাই বালক বালিকার পক্ষে যথেষ্ট।

---

## সখা-সংক্রান্ত নিয়মাবলী।

১। সখার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য এক টাকা মাত্র। মফস্বলে ডাকমাশুলসহ ১।০ এক টাকা চারি আনা। প্রতি খণ্ডের নগদ মূল্য ⁄১০ মাত্র। পোষ্টাল নোট, মণিঅর্ডার বা অর্দ্ধ আনার ডাক টিকিটে, "সখা কার্য্যাধ্যক্ষ" এই নামে সখার মূল্যাদি পাঠাইতে হইবে। ডাকটিকিটে মূল্য পাঠাইলে প্রত্যেক টাকার কমিশন বলিয়া ⁄০ এক আনা অধিক পাঠাইতে হইবে।

২। পত্রিকাস্থ চিত্রের সংখ্যা কিছুই নির্দ্দিষ্ট থাকিবে না তবে প্রত্যেক সংখ্যায় যাহাতে অন্ততঃ এক খানি চিত্র থাকে আমরা সেদিকে দৃষ্টি রাখিব।

৩। বালকবালিকাদিগের রচনা উৎকৃষ্ট হইলে তাহা সাদরে গৃহীত হইবে; তবে সুদীর্ঘ হইলে প্রকাশিত হইবে না।

৪। শিক্ষক এবং অভিভাবকদিগের পরামর্শ প্রভৃতি সাদরে গৃহীত হইবে।

৫। বালক বালিকাদিগের উপকারে আসিতে পারে, কেহ এরূপ কোন রচনা বা কোন সংবাদ কিম্বা সত্য ঘটনার বিশেষ বিবরণ আমাদিগের নিকট পাঠাইলে আমরা তাহা সাদরে প্রকাশ করিব।

৬। সখা সংক্রান্ত সমস্ত পত্রাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইতে হইবে। কেবল রচনা, পরামর্শ প্রভৃতি সম্পাদকের নামে কার্য্যালয়ের ঠিকানায় পাঠান আবশ্যক।

৭। ঠিকানার পরিবর্ত্তন, নামের গোল বা কার্য্যসম্বন্ধীয় অন্য কোন অসুবিধা হইলে মোড়কের উপরে যে নম্বর দেওয়া থাকিবে সেই নম্বরের উল্লেখ করিয়া পত্র লিখিতে হইবে।

"সখা" কার্য্যালয়,
৫০ নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট।
কলিকাতা।
} কার্য্যাধ্যক্ষ।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে মুদ্রিত এবং ৫০নং সীতারামঘোষের ষ্ট্রীট, "সখা" কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

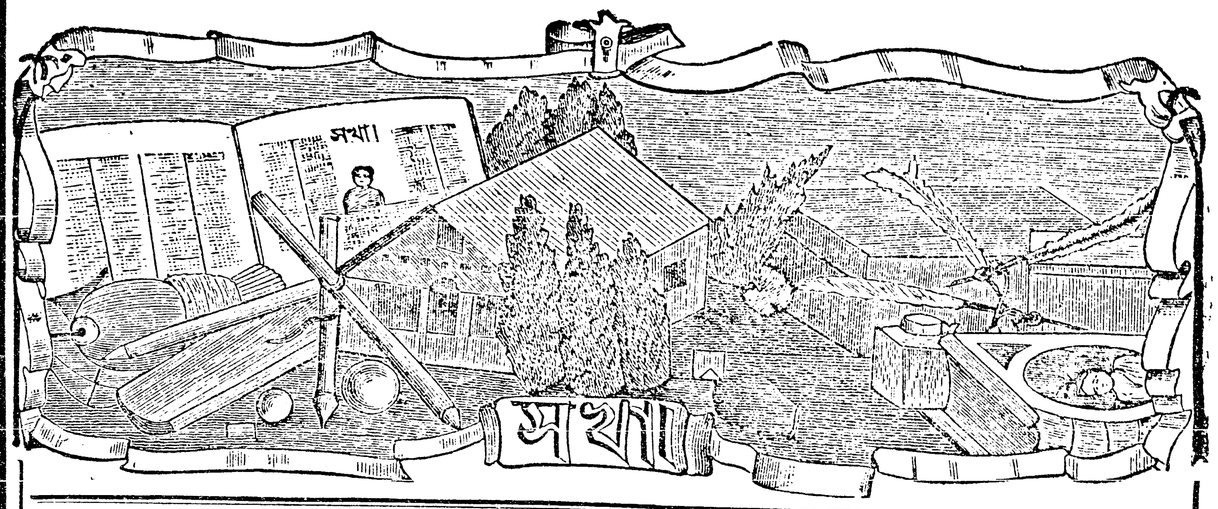


প্রথম ভাগ। অক্টোবর, ১৮৮৩। ১০ম সংখ্যা।

## ভীমের কপাল।

### ১১শ অধ্যায়।

বিপিন এখানে কেমন করিয়া আসিল, তাহা বলা আবশ্যক। যেদিন রাত্রিতে ভীমেন্দ্র রাগ করিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছিল, বিপিন সেই রাত্রিতেই অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত ঘুরিয়া ঘুরিয়া ভীমেন্দ্রকে অন্বেষণ করিয়াছিল, কিন্তু খুঁজিয়া পাইল না, তখন বিমর্ষভাবে বাড়ীতে ফিরিয়া গেল। পরদিন প্রাতে বিপিন মাতুলালয় হইতে বিদায় লইয়া ভীমেন্দ্রের অন্বেষণে বাহির হইল। মাতুলের আদেশ ছিল যখন যেখানে যাইবে, সেইখান হইতেই আমাকে জানিতে দিবে ভীমেন্দ্রকে খুঁজিয়া পাইলে কি না, অথবা কতদূর সন্ধান হইল। এইজন্য বিপিনের পকেটে কতগুলি ডাক কাগজ, টিকিট-লেফাপা এবং একটা পেন্সিল সর্ব্বদা থাকিত। বিপিন বল্লভগঞ্জ পর্য্যন্ত অনায়াসেই সন্ধান করিতে করিতে গেল—সেখানে গিয়া শুনিল বিপিন যেরূপ বালকের কথা বলিতেছে সেইরূপ একটী বালক আসিয়া জমিদারের বাড়ীতে বন্ধ ছিল বটে, কিন্তু তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহার পর সে যে কোথায় গিয়াছে তাহা কেহই বলিতে পারে না। বিপিন খুঁজিয়া পরিশ্রান্ত হইয়া বিশ্রামের জন্য একটী ময়রা দোকানে গিয়া বসিল, সেখানে শুনিল ভীমেন্দ্রের মত একটী বালক সম্মুখে রাস্তা দিয়া খাবার খাইতে খাইতে চলিয়া গিয়াছে। বিপিনের আশা হইল; তখন সে সেই রাস্তা ধরিয়া চলিল। খানিক দূর গিয়া শুনিল—একটী ছেলে আর একটী ছেলেকে বলিতেছে মার্‌তে পাল্লি না? না চেয়েই কেড়ে নিলে? কতবড় সে ছেলেটা? যাহাকে বলা হইতেছিল সে উত্তর করিল "মস্ত বড় ছেলে—মাল্লে পার্ব্বো কেন? আর মারতে ইচ্ছে হলো না, দেখে বোধ হল যেন কদিন খায় নাই।" বিপিন গিয়া জিজ্ঞাসা করিল "তোমরা কোন্ ছেলের কথা বল্‌ছ? তাহার কি এই রকম চেহারা?" ছেলেরা বলিল হাঁ। বিপিন বলিল "ভাল, সে ছেলেটী কোন্ পথে গিয়াছে বলিতে পার?" এক জন বালক পথ দেখাইয়া দিল। বিপিন অনেকক্ষণ সেই পথে চলিয়া পরিশ্রান্ত হইয়া একটা গাছতলায় খানিকক্ষণ বিশ্রাম করিল, এবং নিকটে গোপালনগরের ডাকঘরে মাতুলের নিকট একখানি পত্র লিখিয়া পুনশ্চ পথ চলিতে লাগিল। যে রাস্তায় বিপিন যাইতেছিল সেই পথের প্রত্যেককেই বিপিন ভীমেন্দ্রের কথা জিজ্ঞাসা করিতে করিতে

যাইতে লাগিল। এইরূপে কতদূর গিয়া বিপিন শুনিল দুজন প্রাচীন লোক নিজের দুষ্ট ছেলেদের কথা বলিতে বলিতে যাইতেছেন। তাঁহারা অত্যন্ত দুষ্টমতি, পিতামাতার কথার অবাধ্য এই কথা বলিয়া তাঁহারা নিজের নিজের কপালের নিন্দা করিতেছিলেন। একজন বলিলেন "লোকের যদি ছেলে হয় তবে যেন সুজনখালীর মিত্রদের ছেলের মত হয় তাহার বাপ মাকে কি ভক্তি! গরিব দুঃখীকে কি দয়া! সেদিন একটী পরের ছেলেকে রাস্তায় মরার মত পড়ে আছে দেখে কি যত্নটাই করলে। আজও সে ছেলেটী তাদের বাড়ীতে রয়েছে।" বিপিন বলিল 'মহাশয় সে ছেলেটীর নাম কি জানেন?' প্রাচীন বলিলেন 'ভীমেন্দ্র।' বিপিন নিতান্ত চঞ্চল হইয়া বলিল "মহাশয় সে বাড়ী কোথায় আমাকে বলিতে পারেন? সে বালকটী আমার ভাই, রাগ করিয়া বাড়ী হইতে আসিয়াছে।" প্রাচীন সুজনখালী যাইবার পথ বলিয়া দিলেন। বিপিন কি ভাবে সুজনখালীর মিত্রদের বাড়ী গেল তাহা তিনিই বুঝিতে পারিবেন যিনি কোন ভাই অথবা ভগিনী বহুকাল পরে বিদেশ হইতে বাড়ীতে আসিতেছে শুনিয়া নদীর কাছে অথবা রেলওয়ের ধারে তাহাকে অগ্রসর হইয়া আনিতে যান! বিপিন মিত্রদের বাড়ীতে গেল। শুনিল ভীমেন্দ্র গত রাত্রিতে কি অদ্য ভোর বেলায় যে কোথায় গিয়াছে তাহার এখনও খোঁজ হইতেছে না। অল্পকালের মধ্যেই সন্ধান হইল গ্রামের একজন লোক গত কল্য বিকাল বেলা ভীমেন্দ্রকে নদীর ধারে দেখিয়াছে। তখন বিপিন দীনদয়াল বাবুর সহিত মিলিত হইয়া নদীর ধারে গেল, এবং ভীমেন্দ্র কোনও নৌকায় চলিয়া গিয়াছে কি না তাহার সন্ধান করিতে লাগিল। এক মাঝি বলিল 'আপনারা যে রকম চেহারার কথা বলিতেছেন, সেই রকম একটী ছোঁট বাবু কলিকাতায় যাইবার জন্য আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, আমরা যাই নাই; ঘাটে যত নৌকা বাঁধা ছিল তাহার মধ্যে কেবল বগুড়ার নৌকা খুলিয়া গিয়াছে। আর সকল নৌকাই রহিয়াছে যদি সে নৌকায় গিয়া থাকেন, তাহা বলিতে পারি না।" নৌকায় বগুড়ায় যাইবার সম্ভাবনাও যত হাঁটিয়া অন্যত্র যাইবার সম্ভাবনাও তত। তখন দীনদয়াল বিপিনকে কি করিতে পরামর্শ দিবেন ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। খানিকক্ষণ উভয়ে স্থির হইয়া নদীতটে বসিয়া রহিলেন—তখন বিপিন বলিল বগুড়ায় যাওয়া অগ্রে উচিত। দীনদয়াল অনেক ভাবিয়া সম্মতি দিলেন। অবশেষে যে নৌকায় ভীমেন্দ্রের যাইবার কথা ছিল, সেই নৌকার মাঝির সহিত বগুড়ায় যাইবার বন্দোবস্ত করা হইল। মাঝিকে কিছু বায়না দিয়া বিপিন দীনদয়ালের সহিত তাঁহাদের বাড়ীতে গেল। মধ্যাহ্নে দীনদয়ালের বাড়ীতে আহার করিয়া ভীমেন্দ্রের উপকারকর্ত্তা দীনদয়াল ও তাঁহার ভগিনীর নিকট হইতে বিদায় লইয়া বিপিন নৌকায় উঠিল। দীনদয়াল ও তরু বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিলেন যেন ভীমেন্দ্রের সন্ধান করা হইলেই তাঁহাদিগকে পত্র লেখা হয়। নৌকা সুজনখালীর নিকটবর্ত্তী নদীর ঘাট হইতে খুলিয়া গেল।

যথাসময়ে নৌকা বগুড়ায় পৌঁছছিল। বিপিন নামিয়া সহর খুঁজিতে লাগিল। অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত কোন সন্ধানই হয় না—তখন সে পুনশ্চ নদীর ঘাটে আসিয়া মাঝিদের জিজ্ঞাসা করিল "বগুড়ার যে নৌকা সেই রাত্রিতে খুলিয়া আসিয়াছিল, সে নৌকা কাহার জন্য?" মাঝিরা বলিল 'এখানকার দারোগা গঙ্গাধর বাবুর।' তখন বিপিন খুঁজিতে খুঁজিতে দারোগা বাবুর বাড়ীতে গেল এবং তাঁহার নৌকাতে কোনও বালক আসিয়াছে কি না, বাড়ীর লোকদের তাহা জিজ্ঞাসা করিল। দারোগা বাবুর বাড়ীর বহির্ব্বাটীতে একজন লোক বসিয়াছিল সে দারোগা বাবুর মাঝিদের মুখে এই কথা শুনিয়াছিল—সে বলিল 'হাঁ এই রকম একটী ছেলে এসেছিল বটে কিন্তু সে কোথায় গিয়াছে, তাহা জানি না।' বিপিন কতক আশ্বস্ত হইয়া আবার খুঁজিতে বাহির হইল। এই বারে সৌভাগ্য-ক্রমে হরিপদ বাবুর সহিত দেখা হইল। হরিপদ বাবু বিপিনকে এদিকে ওদিকে তাকাইতে দেখিয়া, এবং তাঁহার মুখের দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া আছে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কে? কেন এসেছ?" বিপিন নিজের অবস্থা এবং তথায় আসিবার কারণ বলিল। তখন হরিপদ বাবু বলিলেন "ভীমেন্দ্র আমার বাড়ীতেই ছিল বটে, কিন্তু সে গত রাত্রিতে চৈতন্য গ্রামে গিয়াছে; কোনও ভয় নাই, বোধ হয় কলিকাতায় শীঘ্রই পৌঁছিবে।" তখন হরিপদ বাবু জানিতেন না ভীমেন্দ্র ভুলিয়া রসুলপুরে গিয়া পড়িয়াছে। বিপিন বিদায় লইয়া চতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রাম খুঁজিতে খুঁজিতে চৈতন্যগ্রামে চলিল। পথে ১০।১২ দিন কাটিয়া গেল। অবশেষে একদিন বিপিন দেখিতে পাইল একজন গাড়োয়ান শুধুগাড়ী গরুর বদলে নিজে টানিয়া আনিতেছে, তাহার কাপড়ে রক্তের দাগ লাগিয়া রহিয়াছে। বিপিন তাহাকে এইরূপ অবস্থায় পড়িবার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। গাড়োয়ান সমস্ত খুলিয়া বলিল। পাঠক পাঠিকা বোধ হয় বুঝিয়াছেন, এ সেই গাড়োয়ান। বিপিন গাড়োয়ানের সহিত আলাপ করিয়া বুঝিল ভীমেন্দ্র হয় ডাকাতের হাতে মরিয়াছে, না হয় ডাকাতেরা তাহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। এত পরিশ্রম করিয়া বিপিন কি এই সংবাদ শুনিতে আসিল? বিপিন অন্ধকার দেখিতে লাগিল, এবং তেজের সহিত প্রতিজ্ঞা করিল হয় ভীমের কি হইয়াছে সন্ধান করিব, নতুবা দস্যুদের যাহাতে জব্দ করিতে পারি তাহার চেষ্টা করিব। বিপিন কিছু না বলিয়া পথ চলিতে লাগিল। কত দূরে গিয়া দেখিল রাস্তায় খানিকটা রক্তের চিহ্ন দেখা যাইতেছে। বিপিন দেখিয়া বুঝিল, এই খানেই ভীমেন্দ্র দস্যুদিগের হাতে পড়িয়াছে। পাগলের মত বিপিন নিকটবর্ত্তী মাঠ দিয়া ছুটিল, এবং অনেক দূরে গিয়া একটা গাছতলায় বসিয়া পড়িল। বিপিন ভাবিতেছিল "যদি ভীমেন্দ্রের দেখা না পাই, তবে আর কলিকাতায় যাইব না। যখন মাসীমা ভীমেন্দ্রের কথা জিজ্ঞাসা করিবেন তখন কি বলিব? জগদীশ্বর, এইবার যেন ভীমেন্দ্রের দেখা পাই।" এই ভাবিতে ভাবিতে বিপিন আবার চলিতে লাগিল, আবার একটা গ্রামের মধ্য দিয়া দ্বিপ্রহর রৌদ্রের সময় যাইতে যাইতে বিপিন বিশ্রামের জন্য একটা গাছতলায় বসিল। খানিকক্ষণ বসিয়া বিপিন দেখিল একটী বালক আসিতেছে; সে আসিয়া কাঁদিল, গামছায় পা বাঁধিল, এবং জলে ঝাঁপ খাইয়া পড়িল। বিপিন অবিলম্বে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঝাঁপাইয়া পড়িল। তাহার পরের ঘটনা পাঠক পাঠিকাদিগের অবিদিত নাই।



## ১২শ অধ্যায়।

বিপিনকে দেখিয়া ভীমের মনে আশার উদয় হইল। বিপিনকে বিদায় দিয়া ভীমেন্দ্র গৃহে গেল। তাহাকে রক্ষা করিয়াছেন বলিয়া ভীমেন্দ্র মন খুলিয়া ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিল। প্রাণের কাতরতার সহিত ঈশ্বর যা' করেন বলিয়া ভীমেন্দ্র যেন নূতন লোক হইয়া গেল। ভীমেন্দ্রের দৃঢ় বিশ্বাস হইল, তাহার পক্ষে যাহা ভাল ঈশ্বর তাহা নিশ্চয় করিবেন। তখন ভীমেন্দ্র দুঃখের ভাব ছাড়িয়া প্রফুল্ল হইল। দাসী এটা বুঝিতে পারিল। তখন ভীমেন্দ্র তাহার নিকট যাহা হইয়াছে সমস্ত ঘটনা বলিল। বুড়ী কাঁদিয়া, হাসিয়া, ভীমেন্দ্রের মাথায় হাত দিল এবং আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিল 'বাবা! যেখানে থাক

সুখে থেক, আর বুড়ীকে মনে রেখ।' রঘুরাম সেই দিন হইতে দেখিল ভীমেন্দ্র ১০ ঘা বেত খাইয়াও দুঃখ প্রকাশ করে না। রঘুরাম ভারি চতুর লোক—বুঝিতে পারিল ভীমেন্দ্র পলাইবার উদ্যোগ করিয়াছে, এবং পলাইয়া বাঁচিতে পারিবে তাহার আশা হইয়াছে। রঘো ডাকাত তখন অল্পকালের মধ্যেই তাহার দলের লোকদের ডাকিল, এবং ভীমেন্দ্রের সম্বন্ধে কি কর্ত্তব্য তাহা জানিতে চাহিল। অনেকেই পরামর্শ দিল 'মারিয়া ফেল'। রঘো সে পরামর্শ শুনিল না। বলিল "আমার যে ধন চুরী গিয়াছে তাহার মত যাহাকে পাই, তাহাই মঙ্গল; উহাকে শাস্তি দিতে পার, প্রহারে আধমারা করিতে পারে, কিন্তু মারিও না, মারিলে আর হবে না।" রঘু ডাকাত এরূপ দয়ার কথা কেন বলিতেছে, জানিতে ইচ্ছা হয়? তবে শোন। রঘু এক জন ভয়ানক অত্যাচারী জমীদারের প্রজা ছিল। জমীদারের অত্যাচারে তাহার ও তাহার প্রতিবেশীদিগের আর কষ্টের শেষ ছিল না। এক দিন জমীদার একটা সামান্য ছল করিয়া এক দল লোক লইয়া রঘুরামের বাড়ীতে প্রবেশ করে এবং তাহার ৬।৭ বর্ষ বয়সের ছেলেকে কাড়িয়া লইয়া, স্ত্রীকে প্রহারে মারিয়া ফেলিয়া চলিয়া যায়। সেই রাত্রিতেই রঘুরাম তাহার প্রতিবেশীদের সহিত বনে আসিয়া ডাকাতির দল করে। এ আজ ৮।৯ বৎসর পূর্ব্বের কথা। যে দিন ভীমেন্দ্রের গাড়োয়ানকে ও ভীমেন্দ্রকে প্রহার করিয়া রঘোর দল তাহাদের জিনিশাদি কাড়িয়া লইয়াছিল রঘুরাম সেদিন রাত্রিতে দেখিয়াছিল ভীমেন্দ্রের মুখ তাহার হারাণ ছেলের মত; পাছে মমতা হয়, এই জন্য প্রদীপ নিভাইয়া দিতে বলিয়াছিল, তাহা বোধ হয় পাঠক পাঠিকাবর্গের স্মরণ থাকিতে পারে। আলো জ্বালা হইলে যখন ভীমেন্দ্র জোর করিয়াছিল, তখন যে ভীমেন্দ্রের মাথায় লাঠি মারিয়াছিল—সেও পাছে কেউ কাপুরুষ মনে করে, এই ভয়ে এবং যখন একজন ডাকাত বালকের দুঃখে দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিল, তখন রঘো মনে মনে অত্যন্ত খুশী হইলেও নিজের ক্ষমতা দেখাইবার জন্য রাগের ভান করিয়াছিল। ভীমেন্দ্রকে একদিন বই রঘু নিজে প্রহার করে নাই, এবং কখনও একাকী পায় নাই বলিয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে পারে নাই, কিন্তু রঘোর নিশ্চয় বিশ্বাস হইয়াছিল ভীমেন্দ্র তাহার পুত্র,—সুতরাং তাহাকে যে প্রহার করিয়াছিল, অথবা করিতে অনুমতি দিয়াছিল—সেও এই জন্য যে ভীমেন্দ্রের উচিত রঘুরামের সহিত মিশিয়া অত্যাচারী জমিদার দিগকে জব্দ করিতে চেষ্টা করা। যাহা হউক এখন মূল ঘটনার কথা বলা যাউক। এখন বোধ হয় সকলে বুঝিয়াছেন—'আমার যে ধন চুরী গিয়াছে' ইত্যাদি যে সকল কথা রঘু বলিয়াছিল, তাহার অর্থ কি।—রঘু ভীমেন্দ্রের সম্বন্ধে অন্য একরূপ বন্দোবস্ত করিল। স্থির হইল যে যতদিন ভীমেন্দ্রের পলায়নের ইচ্ছা না যায়, ততদিন তাহাকে অন্য স্থানে নিয়া রাখিতে হইবে। এই স্থির হইলে তাহারা কয়েকজন সেই রাত্রিতেই দাসীটীকে ও ভীমেন্দ্রকে চক্ষু বাঁধিয়া লইয়া সে স্থান হইতে যাত্রা করিল। কতক গরুর গাড়ীতে, কতক নৌকায়, কতক হাঁটিয়া, পুনশ্চ গরুর গাড়ীতে, পুনশ্চ নৌকায়, এইরূপে অনেক পথ চলিয়া ভীমেন্দ্র এক বাড়ীতে পৌঁছিল। তখন ভীমেন্দ্র ও দাসী উভয়ের চোখ খুলিয়া দেওয়া হইল।—রঘুরাম ভীমেন্দ্রকে স্বাধীনতা দিল, কিন্তু দুজন লোক সর্ব্বদা সঙ্গে থাকিত এবং মনোযোগ করিয়া দেখিত ভীমেন্দ্র কখনও পুলিশের থানায় না যাইতে পারে। আমরা এই গল্প পড়িতে পড়িতে এখন আশ্চর্য্য হই, ভাবি ভীমেন্দ্র কেন ছুটিয়া গিয়া পুলিশে খবর দিল না; কিন্তু তখন পুলিশে খবর দেওয়া বড় সহজ কাজ ছিল না। তখন পুলিশের অধিকাংশ ছোটকর্ত্তারা ডাকাতদিগের নিকট



হইতে ঘুস লইয়া তাহাদের সহায়তা করিতেন। একি এখনকার দিন? ভীমেন্দ্র কি করিবে? তবুও রঘুরাম সতর্ক হইয়া ভীমেন্দ্রকে পুলিশ থানার কাছে যাইতে দেয় না। অবশেষে ভীমেন্দ্র সুযোগ বুঝিয়া ঘরে বসিয়া বিপিনকে পত্র লিখিল—তাহাতে বাড়ীটী কিরূপ যায়গায়, কি রকম, ভীমেন্দ্র তাহা খুলিয়া লিখিল, এবং অনেক দিন সুযোগ খুঁজিয়া খুঁজিয়া এক দিন গোপনে ডাকঘরে ফেলিয়া দিল। ভীমেন্দ্র নিশ্চিন্ত মনে গৃহে গেল। তাহার সঙ্গীরা কিছুই বুঝিতে পারিল না। যথাসময়ে বিপিনের হাতে চিঠি পড়িল—বিপিন দেখিল চিঠিতে খিদিরপুরের ছাপ। তখন বিপিন ভীমেন্দ্রের একজন কাকার নিকটে গেল। তিনি আলিপুরের একজন বড় উকীল ছিলেন। তাঁহাকে পত্র দেখাইয়া বিপিন তাঁহাকে ইহার উপায় করিতে বলিল। বলা বাহুল্য তিনি অনেক অনুসন্ধান করিয়া বাড়ী বাহির করিলেন, এবং একদল পুলিশের দ্বারা বাড়ী ঘেরাও করিয়া রঘুকে গ্রেপ্তার করাইলেন। আলিপুরে তাহার বিচার হইল। ভীমেন্দ্র ও বৃদ্ধার সাক্ষ্যে রঘু যে একজন ভয়ানক ডাকাত তাহা প্রমাণ হইল—ইতিপূর্ব্বে তাহার নামে অনেক মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছিল, রঘু পাহাড়ের মতন স্থিরভাবে বিচারপতির নিকট দাঁড়াইয়া সে সকল স্বীকার করিল; কিন্তু অশিক্ষিত মূর্খ চাষা রঘু যখন বিচার হইবার পূর্ব্বে কেন সে ডাকাতি কার্য্যে যায়, তাহার কথা বলিতে লাগিল—যখন অত্যাচারী জমীদারের ভয়ানক অত্যাচারের কথা বলিতে লাগিল—তখন অনেকেরই খুব আশ্চর্য্য বোধ হইল। কিন্তু তাহা হইলে কি হইবে? বিচারপতি বিচারে তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আজ্ঞা দিলেন। রঘু একবার ভীমেন্দ্রের দিকে তাকাইল—কঠিন হস্তে চক্ষের জল মুছিল, এবং পাহারাওয়ালাদের সহিত জেলঘরে গেল।

ভীমেন্দ্র তাহার কাকাকে দেখিয়া যখন বাড়ীতে যাইতে চাহিল, তখন বুড়ী ছুটিয়া আসিয়া ভীমেন্দ্রকে জড়াইয়া ধরিল, এবং বলিল 'বাবা, আমার কি হবে? আমাকে এখন কে দেখ্‌বে?" ভীমেন্দ্র কাকার দিকে তাকাইয়া বলিল "তুমি আমাদের বাড়ীতে এস।"

ভীমেন্দ্র আর বিলম্ব করিতে পারিল না। বিপিনের সহিত আলিপুর হইতে বাড়িতে আসিল। তাহার বিধবা মাতা কাঁদিয়া কাঁদিয়া শুকাইয়া গিয়াছিলেন—একমাত্র ছেলেকে বহুকাল পরে আসিতে দেখিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। অচিরাৎ তাঁহার মূর্চ্ছাভঙ্গ হইল। তখন জননীর আহ্লাদের কথা কে বুঝিবে? যে সকল বালক অথবা বালিকা অকারণে বা সামান্য কারণে মাতার উপর রাগান্বিত হইয়া কটূক্তি করিতে ছাড়ে না; যে সকল বালক অথবা বালিকা মাতার দুঃখ, ক্লেশ বুঝিতে না পারিয়া, মাতা কখনও একটু কর্কশ কথা বলিলে সমস্ত দিন মুখ ফুলাইয়া কাল কাটায় এবং আহার না করিয়া বিছানা পত্র উল্টা পাল্টা করিয়া রাগ প্রকাশ করে, তাহারা এই স্নেহের কথা কি বুঝিবে?

ভীমেন্দ্র ঘরে ফিরিল। বুড়ী মৃত্যু পর্য্যন্ত ভীমেন্দ্রের বাড়ীতে স্থান পাইল। ভীমেন্দ্র এইরূপে নানা বিপদে আপদে পড়িয়া যে সকল অমূল্য শিক্ষা লাভ করিল পাঠক পাঠিকা তাহা বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছেন। বাল্যকালে ভুগিয়া ঠেকিয়া যাহা তিনি শিখিয়াছিলেন তাহা আজও তাঁহার মনে গাঁথা আছে। কিন্তু এইরূপে শিক্ষালাভ করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। সেই যথার্থ বিজ্ঞ, যে বিপদে পড়িবার পূর্ব্বে আপনার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সমস্ত শিক্ষা করিয়া রাখে। ভীমেন্দ্রের গল্প শেষ হইল—ভরসা করি এইখান হইতেই পাঠক পাঠিকাদিগের শিক্ষার আরম্ভ হইবে।

---

# ঠাকুরদাদার গল্প।

সেদিন সন্ধ্যাকালে কিশোরী অন্যান্য বালকগণকে লইয়া উদ্যানে নানা জাতীয় ফুল কাটিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছিল, এমন সময়ে নবীন বাবু তথায় উপস্থিত হইয়া তাহাদের শিক্ষার আন্তরিক যত্ন দেখিয়া পরম আনন্দ করিতে লাগিলেন। কিশোরীর প্রতি সর্ব্বাপেক্ষা সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন:—"জ্ঞান লাভের এই-ই প্রকৃত পথ, সংসারে সুখী হইবার এই-ই প্রধান উপায়। প্রত্যেক বালক বালিকা যদি শুদ্ধ ক্লাশের পাঠ্য ২।১ খানি পুস্তক পাঠ হইলেই নিশ্চিন্ত না হইয়া এইরূপে প্রকৃতির শোভা দর্শনে অশেষ জ্ঞান ও শিক্ষা লাভ করিতে জানিত তাহা হইলে আর তাহারা বৃথা আমোদে সময় নষ্ট বা জীবনে মূর্খ, অজ্ঞান ও অসুখী হইয়া কালাতিপাত করিত না। যে সময় তাহারা অনর্থক নষ্ট করে তাহার কিছু অংশও যদি সৎজ্ঞান ও সৎশিক্ষায় ব্যয় করিতে পারে তাহা হইলেই যথেষ্ট হয়।"

কিশোরী:—"দাদা মহাশয়! সকল বালকের দোষ নহে। তাহারা ত আর শিখাইবার লোক না পাইলে এ প্রকারে জ্ঞান লাভে সমর্থ হয় না। ইতিপূর্ব্বে আমরাও ত সেইরূপ ছিলাম; এ প্রকার শিক্ষা করিতে যে কত আমোদ তাহা যে অবধি বুঝিয়াছি সেই অবধিই এই আমাদের খেলা, এই আমাদের সুখ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যদি সকল বালক একবার বুঝিতে পারে তাহা হইলে আর তাহারা বৃথা সময় নষ্ট করিবে না।" আমরা সখার পাঠক পাঠিকা মাত্রকেই অনুরোধ করি তাঁহারা যেন প্রত্যেকেই কিশোরীর মত সুবোধ হইয়া বহুবিধ জ্ঞানলাভে সুশিক্ষিত হইবার জন্য কোন জ্ঞানী আত্মীয়ের সাহায্য লন।

অমূল্য:—"দাদা মহাশয়! সেদিন যে বলিয়াছিলেন উদ্ভিদ সম্বন্ধে আরও অনেক কথা আছে, কি কথা বলুন না। সামান্য গাছ পালার মধ্যে যে এত কৌশল তাহা কখন জানিতাম না। আরও কি, সমস্ত শুনিতে ইচ্ছা হইতেছে।" নবীন বাবু বড় সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "সে দিনকার কথাগুলি সকলে মন দিয়া শুনিয়াছ ও বুঝিয়াছ? (সকলেই 'হাঁ উত্তম বুঝিয়াছি।') তাহা হইলে আর উদ্ভিদ যে কেবল অপদার্থ তাহা বোধ হয় তোমাদের মনে হইবে না। কিন্তু এ বিষয়ে আরও বিশেষ কথা আছে। যে সকল উদ্ভিদের কথা সে দিন বলিয়াছি তাহাদের সকলেরই ফুল হয় ও ফল হয়। সচরাচর যে সমস্ত বৃক্ষ লতাদি "গাছ" বলিয়া পরিচিত তাহারা সকলেই প্রায় এই জাতীয়, ইহাদের পুষ্প হয় বলিয়া ইহাদিগকে 'সপুষ্পক' উদ্ভিদ বলা যায়। আর কয়েক প্রকার উদ্ভিদ আছে তাহাদের ফুল হয় না (অপুষ্পক)। ইহারা প্রায়ই নিতান্ত ছোট, কিন্তু এই জাতীয় উদ্ভিদই পৃথিবীর অধিকাংশ অধিকার করিয়া আছে। তোমরা ইহাদের বৃত্তান্ত শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবে, ঈশ্বরের অপার ক্ষমতা বুঝিয়া তাঁহাকে অগণ্য ধন্যবাদ দিবে।

ঐ যে দেয়ালের গায়ে কেমন সুন্দর একটী ছোট গাছ হইয়াছে উহা এই অপুষ্পক জাতীয় উদ্ভিদ।

এই জাতীয় গাছেরা প্রায়ই শীতপ্রধান দেশে জন্মে, হিমালয় পর্ব্বতের কোলে দার্জিলিঙে এই জাতীয় উদ্ভিদের অভাব নাই। ইহাদের প্রধান লক্ষণ পাতার অগ্রভাগ শুঁড়ের মত ঘোরান(চিত্র দেখ)। পুষ্করিণীর শুষুণীশাক এই জাতীয় উদ্ভিদ। ইহারা সচরাচর জলনির্গমনের নল বা নরদামার নিম্নে প্রাচীরের গায়ে জন্মে।



ইহাদের পাতার নীচের পিঠে কাল কাল বিন্দু বিন্দু এক রকম দাগ দেখা যায়, এই গুলির মধ্যে এক প্রকার অতি সূক্ষ্ম চূর্ণ থাকে, তাহাই ইহাদের বীজের কার্য্য করে। পাতা শুকাইয়া গেলে এই গুঁড়া মাটীতে পড়ে ও বর্ষার জল পাইলে ক্রমে ক্রমে উদ্ভিদ জন্মায়।

ভিন্ন জলে যে অসংখ্য শৈবাল (শেওলা) জন্মে সে সমস্তই অপুষ্পক জাতীয় উদ্ভিদ্। তোমরা জান পৃথিবীর অর্দ্ধেকেরও অনেক অধিক যায়গা জলে আবৃত, এই অপার সাগরের অতল জল এই শৈবাল জাতীয় উদ্ভিদে পরিপূর্ণ। সুতরাং দেখ আমরা যাহাকে বৃক্ষ বলি তাহা অপেক্ষা অনেক গুণ উদ্ভিদ্ জলে থাকে। আরও দেখ আম্র, জাম, কাঁঠাল, নীম প্রভৃতি প্রায় সমুদায় বৃক্ষেরই ছালের উপর এক প্রকার শাদা দাগ দেখা যায়। এখনি যাও দেখিবে গোল গোল দাগ আছে। সেই দাগ গুলি বৃক্ষের ছালের অংশ নহে, তাহারা এক জাতীয় উদ্ভিদ্! ইহারাও অপুষ্পক। অণুবীক্ষণ দিয়া দেখিলে যে ইহাদিগকে কি চমৎকার দেখায় তাহা বলা যায় না। যেন অগণিত হীরক, চুণি, পান্না প্রভৃতি মহামূল্য মণি দিয়া গঠিত। এই এক একটী বৃক্ষে এমন কত শত সহস্র "লাইকেন্" আছে তাহার সংখ্যা নাই, তাহাতে আবার জগতে কত বৃক্ষ আছে মনে কর। তাহা হইলে সর্ব্বশুদ্ধ পৃথিবীতে কতই যে এই জাতীয় উদ্ভিদ্ আছে, তাহা কল্পনাতেও ধারণা হয় না!! আর ইহাদের এক একটীতে যে কি অপূর্ব্ব কৌশল, তাহা যখন বড় হইবে তখন বুঝিবে।

ঐ প্রাচীরের গায়ে যে সবুজ বর্ণের মখ্‌মলের মত কি সুন্দর ছোট ছোট, খুব ছোট গাছ রহিয়াছে, উহারাও অপুষ্পক জাতীয়। ইহাদেরও সংখ্যা নাই, বর্ষাকালে যেদিকে চাহিবে সেই দিকেই দেখিতে পাওয়া যায়! ইষ্টকের উপরেই অধিক জন্মে, সর্ব্বত্রই আছে। ইহাদের বংশবৃদ্ধি বড় চমৎকার। কিন্তু তোমরা এখন বুঝিতে পারিবে না। তবে এই মাত্র জানিয়া রাখ যে ইহারা যেখানে থাকে ক্রমে ক্রমে প্রকাণ্ড স্থান অধিকার করে, ইহাদের শিকড় হইতেই নূতন নূতন গাছ জন্মে। শীতপ্রধান ও পার্ব্বত্য দেশেই ইহাদের জন্মের বড় সুবিধা, ঐ ঐ স্থানে ইহারা অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে ও সহস্র সহস্র জাতিতে দেখা যায়। ইহাদের সংখ্যা বৃক্ষ লতাদির অপেক্ষা অনেক অধিক।

তৎপরে তোমরা সকলেই কোঁড়ক ও "বেঙের ছাতা" দেখিয়া থাকিবে। (ছবি দেখ) তাহাও এই অপুষ্পক জাতীয় উদ্ভিদ্, বেঙের ছাতা নহে। গরিব ভেক ছাতা কোথা পাবে? (সকলে হাস্য করিল) কোঁড়ক উদ্ভিদ্, অন্য কিছুই নহে। তদ্রূপ আরও কত যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্ভিদ্ আছে, তাহাদিগকে চিনাই যায় না। আচ্ছা, চুন্‌কাম করা দেয়াল এক বৎসরেই যে কাস দাগে ঢাকিয়া যায় তাহার কারণ কি জান? (সকলে "না") আর কিছুই নহে, বর্ষার জল লাগিয়া উহাতে এক প্রকার অপুষ্পক উদ্ভিদ্ জন্মে তাহাই পরে শুষ্ক হইয়া যায় ও ঐ রূপ কাল দাগে দেয়াল আচ্ছন্ন হয়—এই মাত্র। বর্ষাতে পথে ঘাটে যে "পেছল" হয়, তাহাও উদ্ভিজ্জ। আর বড় বৃষ্টির পর উঠানে যে এক প্রকার বর্ণহীন জীয়ল আটার ন্যায় পেছল

পদার্থ দেখা যায়, তাহাও উদ্ভিজ্জ। এখন তোমরা অবাক হইতেছ,—দুগ্ধ, দধি প্রভৃতি খাদ্য দ্রব্য বাসি হইলে তাহাদের উপর শ্বেত বা হরিদ্রা বর্ণের যে ছাতা ধরে, তাহাও উদ্ভিজ্জ। জামা, কাপড় প্রভৃতি অনেক দিন অবধি ঘর্ম্মাক্ত হইলে তাহাতে যে তিলের মত "ম'সে" ধরে তাহাও এক জাতীয় উদ্ভিজ্জ বৈ আর কিছু নহে।

পৃথিবীর এমন স্থান প্রায় নাই যেখানে কোন না কোন জাতীয় উদ্ভিদ্ দেখা যায় না। এমন কি শীতের আবাস ভূমি বরফের অঙ্গেও উদ্ভিদ্ জন্মে। উদ্ভিদ্ পৃথিবীর কত যে উপকারী তাহার সীমা নাই। যাবতীয় পশু, পক্ষী, মনুষ্যাদি প্রাণী সকলেই উদ্ভিদের উপরে বা উদ্ভিদ্‌ভোজী জন্তুর উপরে নির্ভর করিয়া জীবন ধারণ করে। উদ্ভিদেরা পৃথিবীর অলঙ্কার ও জীবের জীবন ধারণের উপায়। ইহারা পরম কৌশলী পরমেশ্বরের অত্যাশ্চর্য্য ও অপার বুদ্ধির পরিচয় দিতেছে। তাই বলি সামান্য তৃণকেও তুচ্ছ জ্ঞান করিও না।" অতঃপর সকলে বাটী গেলেন।

---

## শিশু-স্বাস্থ্য-রক্ষা।

### সপ্তম উপদেশ।

একদিন উপবাস করিলে শরীর কেমন দুর্ব্বল বোধ হয়, মাথা ঘূরে, চক্ষে অন্ধকার দেখিতে হয়, পা চলে না, শরীরের কি মনের কোন কার্য্যই করা যায় না, ইহা কে না জানে? আবার পরিমিতাহারের ক্ষণকাল পরেই শরীরে ও মনে কেমন স্ফূর্ত্তি বোধ হয়। বাস্তবিক আহার জীবন রক্ষার প্রধান উপায়। কিন্তু কেবল আহার করিলেই যে যথেষ্ট হইল, তাহা নহে, এমন দ্রব্য আহার করা চাই, যাহা শরীর রক্ষার উপযুক্ত। কতকগুলি অসার-বস্তু দ্বারা উদর পূর্ণ করা অপেক্ষা অনাহারই ভাল। অতএব বিশেষ বিবেচনা সহকারে আহার্য্য পদার্থ নির্ব্বাচন করিবে।

সচরাচর যে সকল দ্রব্য আমরা আহার করি, তাহাকে চারি ভাগ বিভক্ত করা যায়।

এক শ্রেণীর মধ্যে ভাত, রুটী, ডাউল, মৎস্য, মাংস, হংসডিম্ব প্রভৃতি প্রধান। মনুষ্য মাত্রেরই এই শ্রেণীর পদার্থ সকল প্রধান আহার। ইহারা শরীরের পুষ্টি করে, তাহার সারাংশ উৎপাদন করে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যে চিনি, আলু, অনেক সুপক্ক ফল প্রভৃতি প্রধান, এতদ্দ্বারা শরীরের তাপ রক্ষা হয়।

তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যে তৈল, ঘৃত, নবনীত, মেদ, ইত্যাদি। ইহারাও তাপ রক্ষা করে ও মেদ উৎপাদন করে।

লবণ পৃথক ভাবে ও শাক সবজির মধ্যে নানা প্রকারে অবস্থিতি করে, ইহা রক্তের উপাদান, ও অস্থি প্রভৃতি মধ্যে অবস্থিতি করে, ইহা চতুর্থশ্রেণী।

এই চারি শ্রেণীর সকলগুলিই শরীর রক্ষার্থ আবশ্যক, সুতরাং প্রকৃত শরীর রক্ষার উপযোগী খাদ্য তাহাই, যাহাতে এই চারি শ্রেণীর পদার্থ সকল উপযুক্ত পরিমাণে অবস্থিতি করে। সুতরাং আহারের উপযুক্ত দ্রব্য নির্ণয় করিতে হইলে সকল শ্রেণীর পদার্থই কতক পরিমাণে গ্রহণ করিবে। আহারের পরিমাণ শরীরের বৃদ্ধি, বয়স, পরিশ্রম, অবস্থা প্রভৃতি অনুসারে পৃথক প্রকার, সুতরাং তাহা নির্দ্দেশ করা সম্ভব নহে। নিম্নে বালকদিগের আহার সম্বন্ধে একটা সাধারণ নিয়ম লিখিতেছি, তদ্দ্বারা বোধ হয় অনেকেই চলিতে পারিবেন। কিন্তু এই নিয়ম যে সকলের উপযুক্ত, এমত বলি না, কারণ এরূপ নিয়ম সম্ভব নহে।

সকাল বেলা দুগ্ধ ও ডিম্ব বা রুটী চিনি ও দুগ্ধ, কিম্বা দুগ্ধ ও ভাত। অল্প পরিমাণে এই সকল দ্রব্য আহার করিবে। যাহার অবস্থা এ সকলের উপযোগী নহে, তিনি গরম ভাত, মৎস্য প্রভৃতিও খাইতে পারেন। পক্কফল—আম্র, কমলালেবু—প্রভৃতিও উত্তম।



৯৷৷০ টা বেলার সময় অর্থাৎ স্কুলে যাওয়ার পূর্ব্বে ভাত, ঘৃত, মৎস্য, ডা'ল, মাংস ও দুগ্ধ প্রভৃতি যথোপযুক্তরূপে আহার করিবে। নিতান্ত দরিদ্র হইলেও ভাত, মৎস্য, ডা'ল, এবং দুগ্ধ ইহার কম কিছুতেই শরীর পোষিত হয় না। লবণাদি যাহা আবশ্যক, স্বভাবই তাহা শিক্ষা দিয়া থাকে সুতরাং তাহা পৃথক ভাবে লিখিলাম না।

স্কুল হইতে আসিয়া লুচি, দুগ্ধ ও রুটী প্রভৃতি আহার করিবে; কিন্তু তখন পূর্ণ ভোজন করিবে না। অধিক মিষ্টান্ন খাইবে না, কারণ তাহাতে উপকার যা হউক না হউক, বিলক্ষণ অপকার হয়।

রজনীতে আবার মধ্যাহ্নের ন্যায় পূর্ণ আহার করিবে। কেহ কেহ ভাতের পরিবর্ত্তে রুটী ব্যবহার করেন; যাহা হউক, তাহা অভ্যাস অনুসারে হইয়া থাকে। অন্যান্য পদার্থ মধ্যাহ্নের ন্যায়।

নিম্নে বিশেষ বিশেষ খাদ্যের গুণাগুণ লিখিলাম।

বাঙ্গালা দেশে ভাত প্রধান খাদ্য, ইহাতে শরীর রক্ষা করিতে পারে বটে, কিন্তু ময়দার রুটী তদপেক্ষা অধিক উপকারী।

মৎস্য, মাংস, ডিম্ব, এই সকল খাদ্য শরীর পোষণ করে, বলবৃদ্ধি করে, শরীর ও মনের স্ফূর্ত্তি উৎপাদন করে। কিন্তু ইহা যে শরীর রক্ষার জন্য একান্ত আবশ্যক এমন কথা বলি না। কারণ হিন্দু জাতির মধ্যে অনেক সম্প্রদায় ইহা ব্যতীতও সবলকায় ও সুস্থ শরীর থাকে।

ডা'ল অতিশয় পুষ্টিকারক, ইহার মধ্যে মসুর, মুগ, প্রধান; মটর ও খেসারি উৎকৃষ্ট নহে। মাংসাদির পরিবর্ত্তে ডা'ল ব্যবস্থা হইতে পারে। নিরামিষভোজীদিগের ইহা একমাত্র শরীর-পোষক কিন্তু অধিক পরিমাণে ডা'ল খাইলে উদরের পীড়া হইতে পারে।

দুগ্ধ অতিশয় পুষ্টিকর, রক্ত বৃদ্ধি করে, বল বৃদ্ধি করে, শিশুর শরীর এতদ্দ্বারাই রক্ষা হয়। পূর্ণবয়স্কের পক্ষেও ইহা অতি আবশ্যক। এরূপ সুস্বাদু নির্দ্দোষ ও উৎকৃষ্ট খাদ্য কিছুই নহে।

আলুও পুষ্টিকর। তরকারীর মধ্যে ইহা সর্ব্বপ্রথম। আয়র্লণ্ড প্রভৃতি দেশে ইহাই প্রধান খাদ্য।

কচু, কাঁচকলা, শালগম প্রভৃতিও উত্তম তরকারী মধ্যে গণ্য। পটল, মূলো, বেগুন, প্রভৃতি তরকারী মন্দ নহে কিন্তু বেগুন অধিক পরিমাণে ও অনেক দিন আহার করিলে চর্ম্মরোগ হয়।

পক্ক ফলের মধ্যে কলা, আম্র, কমলালেবু, নারিকেল প্রভৃতি উত্তম ও উপকারী। আতা, পেয়ারা, লিচু, জাম, কুল, প্রভৃতি অল্প পরিমাণে আহার করিবে। কাঁঠাল অধিক পরিমাণে খাইলে অজীর্ণ উৎপাদন করে, অল্প পরিমাণে আহার করিলে মন্দ নহে। তাল অতি অপকারক। অম্ল ও কাঁচা ফল—জলপাই, কামরাঙ্গা, কুল, আমড়া—প্রভৃতি অপকারক।

ঘৃত, নবনীত, সর শরীর পুষ্ট করে, মেদবৃদ্ধি করে, কিন্তু ইহা পরিমিতরূপে আহার করিবে।

ক্ষীর অতি গুরুপাক, সুতরাং অধিক আহার করা উচিত নহে। দধি ঘোল প্রভৃতি বিশেষ উপকারী নহে, অল্প পরিমাণে আহার করা উচিত। তবে ঘোল অজীর্ণতার উপকার করে।

পিষ্টকাদি বিশেষ উপকারক নহে, কখনও ইহা খাইতে হইলে অল্প পরিমাণে আহার করিবে! মিষ্টান্ন সকলই তদ্রূপ।

অধিক পরিমাণে মশলা দ্বারা যে খাদ্য প্রস্তুত হয়, যেমন পোলাও, মাংসের নানা প্রকার ব্যঞ্জন, ইত্যাদি অতিশয় গুরুপাক। অধিক মশলার পাকের বস্তু আহার করিবে না। উপযুক্ত পরিমাণে মশলার পাকই উত্তম। অতি ভোজন অনু

চিত, বরং অল্প অল্প ক্ষুধা রাখিয়া আহার কর্ত্তব্য। ধীরে ধীরে আহার করিবে। আহারের সময় গল্প করিবে। আহারের পূর্ব্বে বা পরেই স্নান, ব্যায়াম বা পাঠ করিবে না। আহারের পর দুই ঘণ্টা বিশ্রাম চাই।

ক্রমশঃ।

---

বড় বালক বালিকাদিগের জন্য লিখিত।

## বীরেন্দ্রসিংহের রত্ন-লাভ।

[আমরা গতবারে নরেনের স্বর্গ দর্শন নামক সুন্দর গল্পটী 'সহচরী' পত্রিকা হইতে তুলিয়া দিয়া কাহারও কাহারও কাছে গালাগালি খাইয়াছি; তাঁহারা বলেন যে "মিথ্যা গল্প দিলে বালকদিগের মনে অনেক বিষয়ে ভুল বিশ্বাস হয়।" যাহারা কোন্‌টী সত্য কোন্‌টী মিথ্যা বুঝিতে না পারে, তাহাদের পক্ষে 'সখা' নয়, এরূপ আমরা বলিতে সাহস করি না; তবে নীচের গল্পটী কেবল তাঁহারাই পড়িবেন, যাঁহারা সত্য মিথ্যা বাছিয়া উপদেশ লইতে পারেন।]

পুরাকালে ভারতবর্ষে বীরেন্দ্র সিংহ নামে এক সুবিখ্যাত, এবং মৃগয়া-প্রিয় রাজা ছিলেন। একদিন তিনি সসৈন্য-সভাসদ-সঙ্গে মৃগয়ায় গমন করিলেন,—সহস্র সহস্র অশ্ব পদদাপে প্রান্তর পথ কম্পিত করিয়া মৃগয়া-ক্ষেত্রে আসিয়া উপনীত হইল। ক্ষেত্রের প্রান্ত-সীমা হইতে একটী হরিণশাবক, সচকিতে ভয়-বিহ্বল-নেত্রে অশ্বারোহীদিগের প্রতি একবার চাহিয়া দেখিয়া সহসা দ্রুতবেগে পলায়ন করিল, মহারাজ সঙ্গীবর্গকে পশ্চাতে ফেলিয়া তাহার অনুসরণ করিলেন।

দ্বিপ্রহর হইয়া পড়িয়াছে, সূর্য্যের প্রখর কিরণে চারিদিক ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে, উত্তপ্ত বায়ুস্রোতে উত্তপ্ত ধূলিকণার তরঙ্গ উঠিয়াছে, চারিদিক নিস্তব্ধ—বিশাল দিগন্ত শূন্য প্রান্তরে মৃগশিশুটি বিদ্যুতের মত এক একবার মহারাজকে দেখা দিয়া মাঝে মাঝে একটি গাছ গাছড়া ও তৃণ মণ্ডলীর আড়ালে আবার অদৃশ্য হইয়া পড়িতেছে। আর লোক নাই, আর পশু নাই,—অগ্নিময় প্রান্তর যেন জীবশূন্য। অতিরিক্ত পরিশ্রমে মহারাজের শরীর শ্রান্ত ক্লান্ত, মৃগয়া উৎসাহে তথাপি তিনি শ্রান্তি অনুভব করিতেছেন না—অবিশ্রান্ত অবারিত বেগে মৃগের অনুসরণ করিতেছেন। দেখিতে দেখিতে মৃগ প্রান্তর ছাড়াইল, তিনিও প্রান্তর ছাড়াইলেন, মৃগ এক অনিবিড় বন মধ্যে প্রবেশ করিল, তিনিও প্রবেশ করিলেন; বন মধ্যে একটি মন্দির ছিল, তথায় মৃগশিশু প্রাণপণ গতিতে আশ্রয় গ্রহণ করিল—রাজা হতাশ হইয়া মন্দিরের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলেন, বুঝিলেন তাহা মন্দিরের প্রতিপালিত মৃগ—তাহা অবধ্য।

নিরাশ অবসন্ন রাজা শ্রান্তি দূর করিতে মন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। পুরোহিতের আতিথ্য-সৎকারে সজীব হইয়া কিছুক্ষণ পরে দেব-চরণে প্রণাম করিতে গমন করিলেন। অপরাহ্ণের নিস্তেজ সূর্য্যরশ্মি মন্দির ভেদ করিয়া দেবমূর্ত্তি উজ্জ্বল করিতে অক্ষম,—মন্দিরস্থিত জ্বলন্ত দীপালোকে ব্রহ্মার চতুর্ম্মুখ মূর্ত্তি বিভাসিত। প্রণাম করিয়া উঠিবার সময় মহারাজের প্রদীপে দৃষ্টি পড়িল—কি আশ্চর্য্য! দেখিলেন প্রদীপ তৈলশূন্য অথচ তাহার প্রজ্জ্বলন্ত দীপ্তির কিছুমাত্র হ্রাস নাই। মহারাজকে বিস্মিত দেখিয়া পুরোহিত বলিলেন "মহারাজ বিস্মিত হইবেন না ইহার নাম ইচ্ছাদীপ্ত প্রদীপ। এই প্রদীপের নিম্নভূমিতে ব্রহ্মা একটি দেবরত্ন রাখিয়া ইহা জ্বালাইয়া রাখিয়াছেন। যদি কেহ সেই রত্নটি গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় তবেই এই প্রদীপ নিভিবে নহিলে ইহার নির্ব্বাণ নাই—"



মহারাজ অতি আগ্রহের সহিত বলিলেন "সে রত্নটি কি?" পুরোহিত বলিলেন "তাহা জগতের সার রত্ন তাহা লাভ হইলে দেবত্ব লাভ হয়।"—মহারাজের লোলুপ হৃদয় তাহা লাভ করিতে উৎসুক হইল; তিনি বলিলেন "তাহা কিরূপে লাভ করা যায়?" পুরোহিত বলিলেন "ইহা লাভ করিতে হইলে পৃথিবীজয়ী হইতে হইবে, পৃথিবী জয়ী না হইলে আশা বৃথা।" মহারাজ তাহা লাভ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। যাইবার সময় পুরোহিত তাঁহার হস্তে একটি কুশাঙ্গুরীয় পরাইয়া তাহাতে দেব প্রদীপের কালী মাখাইয়া বলিলেন "যেদিন দেখিবে এই কালীর দাগ মুছিয়া গিয়াছে সেইদিন বুঝিও তুমি পৃথিবী জয়ী হইয়া এই রত্ন লাভে অধিকারী হইয়াছ—দীপ নিভিয়াছে।"

রাজা বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন,—দিগ্বিজয়ের সমস্ত বন্দোবস্ত হইল, মহারাজ দিগ্বিজয়ে গমন করিলেন। তখন রাজাগণ ভারত জয় করিতে পারিলেই আপনাদিগকে পৃথিবী জয়ী জ্ঞান করিতেন। বীরেন্দ্র সিংহ সমস্ত ভারতবর্ষ জয় করিয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, আহ্লাদে হৃদয় উন্মত্ত, তিনি মানব হইয়া স্বক্ষমতায় দেবরত্ন লাভ করিবেন এপর্য্যন্ত ধরাধামে এরূপ সৌভাগ্য কাহারো ঘটে নাই;—কিন্তু সহসা তাঁহার সে আহ্লাদ দূর হইল, পুরোহিত কুশাঙ্গুরীয় পরাইয়া যে কথা বলিয়াছিলেন তাহা মনে পড়িল, হস্তের দিকে চাহিয়া দেখিলেন অঙ্গুরীয়কের কালীর চিহ্ন যেমন তেমনি রহিয়াছে। মহারাজ নিরাশ হৃদয়ে মহা মহোপাধ্যায় শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদিগের সভা আহ্বান করিলেন। মন্দিরের বৃত্তান্ত তাঁহাদিগকে বলিয়া এসম্বন্ধে তাঁহাদের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। পণ্ডিতগণ বলিলেন "পুরোহিতের কথামত আপনি পৃথিবী জয় করিলেন কিন্তু তাহাতেও যখন অঙ্গুরীয়কের কালী মুছিল না, তখন পুরোহিতের কথার যথার্থ অর্থ তাহা নহে। পৃথিবীর রক্তপাতে যথার্থ পৃথিবী জয় হয় না। যখন আপনি পৃথিবীর হৃদয় জয় করিতে পারিবেন তখন যথার্থ পৃথিবী জয়ী হইবেন। জগতের লোক ভয়দৃষ্টিতে আপনাকে মনুষ্য-হন্তারক বলিয়া না দেখিয়া যখন ভাল বাসার চক্ষে, ভক্তির চক্ষে দেখিবে, যখন জগতের হৃদয় অধিকার করিবেন, তখনি আপনি পৃথিবী জয়ী হইতে পারিবেন।"

মহারাজ এই কথা সত্য বলিয়া বুঝিলেন;—রাজ্যের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ধন রত্ন ঢালিয়া দিতে লাগিলেন, যশে জগৎ ধ্বনিত হইল, কিন্তু হায়! রাজা ব্যথিত হৃদয়ে দেখিলেন তাঁহার অঙ্গুরীয়ক এখনো কালীময়। শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদিগের কথাও ব্যর্থ দেখিয়া কালী মুছিবার উপায় জানিতে, তিনি ভগ্ন হৃদয়ে আবার সেই দেব মন্দিরের পুরোহিতের নিকট যাত্রা করিলেন। যাইবার সময় পথে একজন সন্ন্যাসী তাঁহার ম্লান বদন দেখিয়া তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। সবিশেষ শুনিয়া সস্নেহে বলিলেন "বৎস! রক্তপাত করিয়া কিম্বা যশের কামনা পরবশ হইয়া পৃথিবী জয়ী নামের আশা করিও না। তাহাতে সে প্রদীপ নিভিবে না। যদি আত্মজয় করিতে পার তাহা হইলেই যথার্থ পৃথিবী জয়ী হইবে ও তাহা হইলেই তুমি সেই দেবরত্নের অধিকারী।"

সন্ন্যাসীর কথায় মহারাজের চৈতন্য হইল। তিনি মন্দিরে না গিয়া পথ হইতে বাটী ফিরিয়া আসিলেন। অন্যায় রূপে যে সকল রাজত্ব কাড়িয়া লইয়াছিলেন—তাহা ফিরাইয়া দিলেন, নিজের দুষ্প্রবৃত্তি সকল দমন করিয়া নিঃস্বার্থভাবে পরোপকারে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। আন্তরিক প্রার্থনায় ঈশ্বর তাঁহার সহায় হইলেন—ক্রমে লোভ, ঈর্ষা, অহঙ্কার সকলি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল—তিনি ঈশ্বরে আত্ম সমর্পণ করিতে সমর্থ হইলেন। তখন তাহার হস্তের কালী মুছিয়া গেল, কিন্তু তখন আর কোন রত্ন লাভে তাঁহার লোভ রহিল না, তিনি বাসনাহীন হৃদয়ে পুরোহিতকে ধন্যবাদ করিতে

এবং মন্দিরদেবকে কৃতজ্ঞতা উপহার দিতে সেই মন্দিরে গমন করিলেন ;—দেখিলেন প্রদীপ নিভিয়া গিয়াছে। পুরোহিত বলিলেন—"তুমি যে রত্ন লইতে আসিয়াছ, তাহা ইতিপূর্ব্বেই তোমার হইয়াছে এই দেখ দীপ নির্ব্বাপিত। এখন তুমি কেবল মাত্র পৃথিবী জয়ী নহ—ত্রৈলোক্যজয়ী!"

"সত্যমেব ব্রতং যস্য দয়া দীনেষু সর্ব্বদা
কামক্রোধৌ বশে যস্য তেন লোকত্রয়ং জিতম্।
ন বিভেতি রনাদ্ যোবৈ সংগ্রামেহপ্য পরাংমুখঃ
ধর্ম্ম যুদ্ধে মৃতোবাপি তেন লোকত্রয়ং জিতম্।"

সত্যই যাঁহার ব্রত এবং সর্ব্বদা দীনে যাঁহার দয়া এবং কাম ক্রোধ যাঁহার বশীভূত তাঁহার দ্বারা তিন লোক জিত হইয়াছে।

ধর্ম্মযুদ্ধে যিনি ভীত হয়েন না, সংগ্রামে যিনি পরাঙ্মুখ হয়েন না, ধর্ম্মযুদ্ধে যিনি মৃতই বা হয়েন তাঁহার দ্বারা তিন লোক জিত হইয়াছে।

---

## বানর।

মানুষের বুদ্ধি বেশী; মানুষ সকলের রাজা; মানুষের পরেই বানর। দুয়ের চেহারায় অনেকটা সাদৃশ্য আছে। অনেক সময় স্বভাবের ও সাদৃশ্য দেখা যায়। ভাবিয়া চিন্তিয়া এক পণ্ডিত ঠিক করিয়াছেন বানর মানুষের পূর্ব্ব পুরুষ! অর্থাৎ বানরই কালে রূপান্তরিত হইয়া মানুষ হইয়া উঠিয়াছে।

বানর শব্দটীর উপর কিছু মন্তব্য আবশ্যক হইয়াছে! এই জাতীয় জন্তুদের মধ্যে যাহাদের লেজ আছে তাহারাই যথার্থ আইন-সঙ্গত বানর। "হুকু" "বনমানুষ" প্রভৃতি কয়েক সম্প্রদায় আছে তাহাদের বানরত্ব পরিচায়ক ঐ বিশেষ চিহ্ন টুকু নাই; এ স্থলে বানর বলিতে আমরা তাহাদিগকেও বুঝিব।

তবে দেখা যাইতেছে প্রধানতঃ বানর দুই প্রকার;—সলাঙ্গূল আর অলাঙ্গূল। সলাঙ্গূলদের মধ্যেও দুইটী সম্প্রদায় আছে। এক দলের লেজ, আমরা যতদূর বুঝি শোভার জন্য; আর লোমে ঢাকা। অপর দলের লেজ প্রায় লোমশূন্য, কিন্তু তাহার এই বিশেষ গুণ আছে যে তদ্দ্বারা স্পর্শন, অবলম্বন, প্রভৃতি হাতের প্রায় সমস্ত কার্য্য হয়। সকল বানরেরই সাধারণ কয়েকটী গুণ আছে; যথাঃ—বুদ্ধি, কৌতূহল, অনুকরণপ্রিয়তা ক্ষতি-প্রিয়তা ইত্যাদি। আসিয়া, আফ্রিকা, আমেরিকা এই তিন খণ্ডেই অসংখ্য বানর দেখিতে পাওয়া যায়, সামুদ্রিক দ্বীপ সকলেও বানরের অভাব নাই। তবে সভ্য দেশ বলিয়াই হউক কি অন্য কোন কারণেই হউক, ইউরোপে বানর বড় নাই। প্রায় সকল বানরেই নিরামিষ খায়, পাছে থাকে এবং বিরক্ত হইলে তিরস্কার স্বরূপ নানা প্রকার হাস্যোদ্দীপক মুখভঙ্গী করে। বানরের সম্বন্ধে ইংরাজি বই এবং অন্যান্য স্থান হইতে আমরা কতকগুলি সুন্দর গল্প সংগ্রহ করিয়াছি। সেই গুলি আজ পাঠকবর্গকে উপহার দিব।

অপত্য স্নেহ।—কোন ডাক্তার সাহেবের চাকর একটী ছোট বানর ধরিয়া সাহেবের তাঁবুতে লইয়া আসিল। বানরটীকে খুব যত্ন করা হইত। কিন্তু তাহাকে ধরিয়া আনাতে একটী বুড়ো বানর—বোধ হয় তাহার মা—এত কষ্টে পড়িল যে সে সর্ব্বদাই তাঁবুর কাছে বসিয়া থাকিত আর কিচ্ মিচ্ করিয়া ডাক্তার সাহেবকে মনের কষ্ট জানাইত। ডাক্তার সাহেব তাহার চীৎকারে থাকিতে না পারিয়া অবশেষে বানরটীকে ছাড়িয়া দেওয়াইলেন। বুড়ী তাহাকে লইয়া আনন্দে স্বজাতীয়ের সমাজে গেল। কিন্তু বোধ হয় বানরদের 'পঞ্চায়েৎ" মনে করিলেন যে এদের জাত গিয়াছে সুতরাং ইহাদিগকে গ্রহণ করা হইবে না। তখন সকলে মিলিয়া হতভাগিনীকে প্রহার করিয়া তাড়াইয়া দিল।



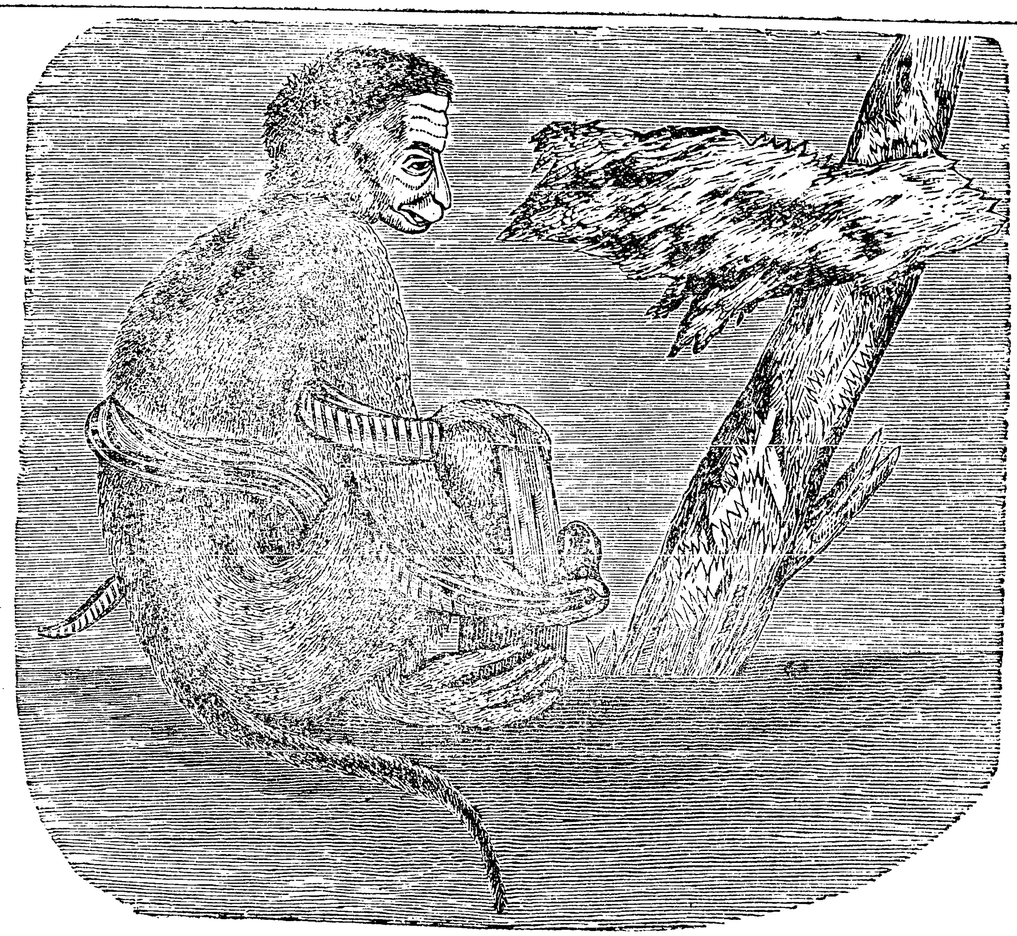

কয়েক দিন পরে ডাক্তার সাহেব দেখিলেন সেই বানর বুড়ী ছানা লইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। সে আপনা আপনি তাঁবুর ভিতরে আসিল। এবং আস্তে আস্তে সেখানে ছানাটীকে রাখিয়া কিছু দূর যাইয়াই পড়িয়া মরিয়া গেল। মৃত শরীরটী পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল যে সে ভয়ানক রোগা হইয়া গিয়াছে, আর সমস্ত গায় প্রহারের এবং আঁচড়ের দাগ।

স্বার্থপরতা।—আমেরিকার এক সাহেব কাফির ক্ষেত করিয়াছেন। কাফি প্রায় সংগ্রহ করিবার উপযুক্ত হইয়াছে। এক দিন ক্ষেতের দিকে একটা ভয়ানক গোলমাল শুনিতে পাইলেন। তখন দুরবীণ দিয়া দেখিলেন যে একদল বানর কাফি খাইতে আসিয়াছে। কাফির প্রায় প্রত্যেক গাছেই বোলতার বাসা। নিষ্কণ্টকে কাফি খাওয়ার পক্ষে বড়ই ব্যাঘাত হইতেছে। দলপতি তখন ভাবিলেন "নিজে কেন ঠকি?" সুতরাং তিনি বোলতা তাড়াবার জন্য ছোট ছোট বানর গুলিকে গাছে ফেলিয়া দিতেছেন। বোলতার কামড়ে বেচারারা ক্যাচ ম্যাচ করিতেছে; তাই অত গোলমাল।

প্রতিহিংসা।—একটা স্তম্ভে একটা বানর বাঁধা ছিল। কাকগুলি মনে করিল যে "বাঁধা আছে, এই বেলা বড় সুযোগ"। তাহার খাবার জিনিস দুটী একটী করিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। বেচারা কি করে! শেষটা মড়ার মত হইয়া মাটিতে পড়িয়া থাকিল। পক্ষীগুলি আস্তে আস্তে কাছে আসিতে লাগিল, বানর কিছু বলে না। কাক মহাশয়েরা মনে করিলেন বুঝি মরিয়া গিয়াছে। তখন আর স্থানাস্থান রহিল না, পারিলে তাহার বুকে উঠিয়া মুখের খাবার খুলিয়া খান। বানরের কার্য্যোদ্ধারের সময় উপস্থিত। সে খপ্ করিয়া এক জনকে গ্রেপ্তার করিয়া বসিল। মারিয়া ফেলিলে উপযুক্ত শাস্তি হইবে না একথাটা বানর বুঝিতে পারিল। সে নিকর্ম্মার মত বসিয়া আস্তে আস্তে এক একটী করিয়া কাকের সমস্ত পালক ফেলিয়া দিল। তার পর তাহাকে ছাড়িয়া দিলে কি হইল বুঝিতেই পার।

বানর এবং কেউটে সাপ।—বানরটী পাটনার একটা বড় বটগাছে থাকিত। গাছে উঠিতে যাইবে এমন সময় গাছের গোড়ায় একটা বড় কেউটে সাপ দেখিতে পাইল। সে গাছে উঠিতে চাহিলেই সাপটা মাথা তুলিয়া কামড়াইতে আসে। বানর ঘুরিয়া গাছের ও পাশে গেল। সাপও সঙ্গে সঙ্গে সেখানে হাজির। কোন মতেই গাছে উঠিতে দিবে না। ইহা দেখিয়া বানর লাফাইতে আরম্ভ করিল। একবার এখানে যায়, আবার ওখানে যাইয়া লাফায়, কখনো বা সাপের গলা ধরিতে হাত বাড়ায়। সাপও কোন দিক রক্ষা করিবে বুঝিতে না পারিয়া ক্রমাগত বানরের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতে লাগিল এবং শেষটা ক্লান্ত হইয়া মাটিতে পড়িয়া রহিল। তখন বানর আস্তে আস্তে অতি সাবধানে সাপের কাছে আসিয়া হঠাৎ তাহার গলা ধরিয়া ফেলিল। সাপ ও বানরের গা জড়াইয়া ধরিল। বানর কিছুমাত্র ভয় না পাইয়া নিকট হইতে এক খানা ইট লইয়া সাপের মাথা ক্রমাগত ঘসিতে লাগিল। ঘসিতে ঘসিতে মাথার আর কিছুই রহিল না। তখন মৃত সাপটা দূরে ফেলিয়া দিয়া বানর নির্ব্বিবাদে গাছে উঠিল।

অনুকরণ-প্রিয়তা।—জাবাদ্বীপে একজন ডাক্তার সাহেব থাকিতেন তাঁহার খুব বড়-জাতীর একটা বানর ছিল। মৃত শরীর পরীক্ষা করিতে হইলে সাহেব একটা টেবিলের উপর ফেলিয়া অস্ত্রদ্বারা কাটিয়া দেখিতেন; বানর কাছে বসিয়া তামাসা দেখিত। একদিন সাহেব যাই ঐ টেবিলের কাছে গিয়াছেন অমনি বানর তাঁহাকে ধরিয়া চিৎ করিয়া টেবিলের উপর ফেলিল। তার পর মড়া কাটিতে হইলে সাহেব যেরূপ অস্ত্র শস্ত্র লইয়া প্রস্তুত হইতেন বানর তাহাই করিতে লাগিল। সাহেব নিতান্ত 'বেকায়দা গোছ' দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে সাহায্য প্রার্থনা করিতে লাগিল। কতকগুলি লোক ঘরে আসিলে বানর থামিল।

## দুর্গা-পূজা।

লেগে গেল ঘোর রঙ্গ, উৎসবে মাতিল বঙ্গ,
রেলের গাড়ীর ঘরে বাধিয়াছে গোল—
সহরের ঘরে ঘরে, ছেলে গুলো গোল করে,
দোকানী পশারী সবে তুলিয়াছে রোল।
পটকা বন্দুক লয়ে, মারবেল বোঝা ব'য়ে,
ছেলে বাবু তাড়াতাড়ি চলিছেন ঘরে,
কর্ত্তার না হয় ঘুম, পূজার বাড়িছে ধুম,
কি হইবে, কি করিব, ভাবেন অন্তরে।
শুকায়েছে কাদা জল, হাসিতেছে নভস্তল,
পরিয়ে চাঁদের আভা—আপনার গলে,
কুহুহু কোকিলা গায়, কূলকুল নদী ধায়,
শ্যামলা প্রকৃতি যেন হাসে প্রাণ খুলে।
পূজার বাড়ীতে আজি, মনোহর বেশে সাজি,
ঘোর ফেরে দলে দলে ছেলে আর মেয়ে;
গরিবের ছেলে যারা, মনোদুঃখে মনে মারা,
তারাও পরেছে আজি সুবসন চেয়ে।
কিন্তু এ আনন্দ দিনে, আহা! কত দীন হীনে
অনাহারে দিনে দিনে যায় শুকাইয়ে,
পিতা মাতা নাহি যার, দিবা রাতি হাহাকার,
সুখহাসি চির তরে গেছে পলাইয়ে।
উৎসবেতে রুচি নাই, হেন কত শত ভাই,
নীরবে আকাশে চেয়ে ফেলে নেত্র নীর—
'কবে প্রাণ বাহিরিবে, এ যাতনা দূরে যাবে,'
ভাবে তাই কোলে বসি ঘোর রজনীর।
আজি ইহাদের তরে, কার অশ্রু জল ঝরে,
উৎসবেতে উষ্ণশ্বাস পড়ে আজি কার?
কার প্রাণ দয়া ক'রে, আজি অভাগারে স্মরে,
কে শুনিছে আজি ওই ঘোর হাহাকার?
আমার ভগিনী ভাই! প্রাণে ব্যথা, বলি তাই,
দুখীরে রাখিও মনে এই সুখ-দিনে,
আর কি চাহিতে পারি,— বিন্দুমাত্র অশ্রুবারি,
ফেলাইও ফেলাইও স্মরি দীন হীনে।



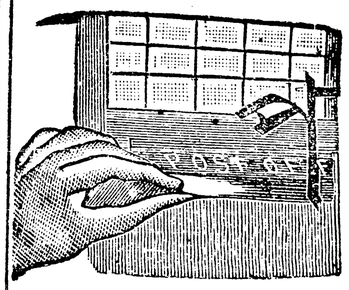

## ত্র প্রেরকের প্রতি

শ্রীমহম্মদ জামালুদ্দিন, শম্ভুগঞ্জ।—স্থানাভাব।

শ্রীমোহিনী নাথ রায়, পলাশডাঙ্গা।—আপনার 'নবকথা' মনোনীত নহে। শ্রীনলিনমোহন গোস্বামী, শ্রীরামপুর।—এরূপ পদ্য লিখিয়া ফল কি? আপনার দ্বিতীয় পত্র পাইয়াছি; 'দুর্গা-পূজা' পদ্যটী কি আপনার রচনা? প্রকাশ করিবার স্থান নাই। শ্রীতারাপ্রসন্ন বসু ধুলজুড়ি।—১। আপনার ন্যায় 'নাছোড়' পত্রপ্রেরক পাওয়া ভার। 'সখা'র সম্পাদক যিনিই হউন, তাঁহার নাম আপাততঃ প্রকাশ করা যাইবে না; লেখক লেখিকাদিগের নামও আমরা এখন প্রকাশ করিব না।—যদি নিতান্তই জানিতে ইচ্ছা করেন, দয়া করিয়া বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করুন, তখন কিছুই জানিতে বাকি থাকিবে না। ২। আপনার ধাঁধার উত্তর না পাঠাইলে উহা মুদ্রিত হইতে পারে না।

শ্রীমনসাচরণ চট্টোপাধ্যায়, ঢাকা।—যাঁহাদের পড়া শুনার দিকে মন আছে, তাহারা অল্প বয়সে বিবাহ করা ভাল মনে করেন না। দেশের বৃদ্ধ লোককে পরামর্শ দেওয়া ভাল নহে। যাহাদের অল্প বয়সে বিবাহ হওয়ার সম্ভাবনা তাঁহাদেরই দল বাঁধিয়া প্রতিজ্ঞা করা উচিত। আপনার রচনা প্রকাশ করিয়া আর বিশেষ লাভ কি?

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেন, সৈয়দপুর।—লিখিয়াছেন, যে ছোট গোয়ালে পাতার রস সাপেকাটা যায়গায় রক্তের সহিত মিশাইয়া দিলে রোগী আরাম হয়। পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত। আমরা সাপের ঔষধের কথা লিখিয়া, তাহার কিছু দিন পরে আর একটী ডাক্তারী ঔষধের কথা জানিতে পারিয়াছি; খ্রীষ্টীয় বান্ধব বলেন—"পোটাসিয়াম আইওডাইটের সহিত উগ্র সোলিউশান অভ আইওডাইট মিশ্রিত করিয়া সর্পদষ্ট রোগীকে পান করাইলে বিশেষ উপকার দর্শে।"

শ্রীআ————, কাশী।—আমরা ইতিপূর্ব্বে দুটী প্রশ্ন দিয়া যে পত্র ছাপাইয়াছিলাম, তাহার উত্তর পাঠাইয়াছেন। প্রশ্ন ও উত্তর এইরূপ: (১) প্রশ্ন—পাখীর স্বাভাবিক মৃত্যু কেহ দেখিয়াছেন, কি না? উত্তর, স্বাভাবিক মৃত্যু হয়, কারণ কোন জিনিশই চিরস্থায়ী নহে; দ্বিতীয়তঃ উহাদেরও রোগ হইতে পারে, তাহা হইতে তাহাদিগের মৃত্যু হইতে পারে।" (২) প্রশ্ন, সম্পূর্ণ গোল ঘুড়ি উড়ে কি না? উত্তর—জানি না!!!

শ্রীভুবনমোহন দাসগুপ্ত, গফরগাঁও।—লিখিয়াছেন, "উহার (সখার) কোন এক খণ্ডে তামাক সেবনের দোষ বর্ণিত আছে তাহা দেখিয়া আমি আমার বহুকালের (১১ বৎসরের) 'পাপ' পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইয়াছি।" আমরা এই সম্বাদে বড়ই সুখী হইয়াছি, আশা করি যাঁহারা তামাক খান, তাঁহারা এ বিষয়ে একবার ভাবিয়া দেখিবেন, এবং আমাদিগকে তামাক ছাড়ার সংবাদ দিয়া আরো সুখী করিবেন।

শ্রীকৃষ্ণবন্ধু সান্যাল লিখিয়াছেন যে কোড়কদি গ্রামে একটী ধুমপান বিরোধিনী সভা হইয়াছে। এ বড়ই সুখের সংবাদ। গ্রামে গ্রামে এইরূপ সভা হইলেই মঙ্গল।

## প্রাপ্তি-স্বীকার।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে নিম্নলিখিত সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকাগুলি আমরা 'সখা'র পরিবর্ত্তে নিয়মিতরূপে পাইতেছি; আশা করি অন্যান্য বাঙ্গালা পত্রিকার সম্পাদক

মহাশয়েরাও আমাদের সহিত পরিবর্ত্তন করিবেন।—(১)বঙ্গবাসী; (২) সাধারণী; (৩) চারু বার্ত্তা; (৪) ভারতমিহির; (৫) সঞ্জীবনী; (৬) সময়; (৭) সারস্বত পত্র; (৮) ভারতী; (৯) খ্রীষ্টীয় বান্ধব; (১০) ভারতসুহৃৎ; (১১) কিরণ; (১২) বামাবোধিনী; (১৩) নব্যভারত; (১২) বিজ্ঞান-দর্পণ; (১৫) বেঙ্গল পাব্লিক ওপিনিয়ান। এতদ্ভিন্ন "চিত্তরঞ্জিনী" নামে একখানি সুন্দর দ্বিমাসিক পত্রিকাও আমরা পাইয়াছি।

[ গত কয়েক বারে স্থানাভাবে ধাঁধা দিতে না পারাতে আমরা দুঃখিত আছি। ]

## ধাঁধা।

১। ব্রজ বাবুর ছেলে বিপিন এক দিবস আমাকে ঠিক সমান দুভাগ করিয়া ফেলিল। আমি বলিলাম "ও কি করিলি?" তা,—সে উত্তর না দিয়া দেখিল দুই ভাগই ঠিক একরূপ; তখন সে এক ভাগের নাম ধরিয়া জোরে ডাকিল; তাহাতে ব্রজ বাবুর স্ত্রী এসে বলিলেন "কেন রে বিপিন?" বলতো বিপিন আমার কে?

২।—হস্ত পদ নাই তার, নাহিক নয়ন,
তবু আমাদের মাথা রাখেন সে জন;
রজনীতে তিনি যদি না রন্ সহায়,
কত কষ্ট পেতে হয় বলা নাহি যায়।
বলতো সুবোধ শিশু স্থির করি মন
(ঈশ্বর নহেন তিনি) তবে কোন জন?

৩। একটি ছেলে একজন বৃদ্ধকে বলিল "আপনি না একবার কলিকাতায় গিয়াছিলেন?" বৃদ্ধ কয়েকটী অঙ্ক লিখিয়া দেখাইলেন। বালক বুঝিয়া বলিল "তবে?" বৃদ্ধ আবার সেই কয়টি অঙ্ক লিখিয়া তাহাদের মধ্যে একরকমের কয়টি চিহ্ন দিয়া বালককে দেখাইলেন। বালক বলিল 'ইঃ আর দুই হইলেই তো এক কম পঁচিশ হইত!"

ছেলেতে বুড়োতে কি কথা হইল বল তো?

## সখা-সংক্রান্ত নিয়মাবলী।

১। সখার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য এক টাকা মাত্র। মফস্বলে ডাকমাশুলসহ ১।০ এক টাকা চারি আনা। প্রতি খণ্ডের নগদ মূল্য /১০ মাত্র। পোষ্টাল নোট, মণিঅর্ডার বা অর্দ্ধ আনার ডাক টিকিটে, "সখা কার্য্যাধ্যক্ষ" এই নামে সখার মূল্যাদি পাঠাইতে হইবে। ডাকটিকিটে মূল্য পাঠাইলে প্রত্যেক টাকায় কমিশন বলিয়া /০ এক আনা অধিক পাঠাইতে হইবে।

২। পত্রিকাস্থ চিত্রের সংখ্যা কিছুই নির্দ্দিষ্ট থাকিবে না, তবে প্রত্যেক সংখ্যায় যাহাতে অন্ততঃ এক খানি চিত্র থাকে আমরা সেদিকে দৃষ্টি রাখিব।

৩। বালকবালিকাদিগের রচনা উৎকৃষ্ট হইলে তাহা সাদরে গৃহীত হইবে; তবে সুদীর্ঘ হইলে প্রকাশিত হইবে না।

৪। শিক্ষক এবং অভিভাবকদিগের পরামর্শ প্রভৃতি সাদরে গৃহীত হইবে।

৫। বালক বালিকাদিগের উপকারে আসিতে পারে, কেহ এরূপ কোন রচনা বা কোন সংবাদ কিম্বা সত্য ঘটনার বিশেষ বিবরণ আমাদিগের নিকট পাঠাইলে আমরা তাহা সাদরে প্রকাশ করিব।

৬। সখা-সংক্রান্ত সমস্ত পত্রাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইতে হইবে। কেবল রচনা, পরামর্শ প্রভৃতি সম্পাদকের নামে কার্য্যালয়ের ঠিকানায় পাঠান আবশ্যক।

৭। ঠিকানার পরিবর্ত্তন, নামের গোল বা কার্য্যসম্বন্ধীয় অন্য কোন অসুবিধা হইলে মোড়কের উপরে যে নম্বর দেওয়া থাকিবে সেই নম্বরের উল্লেখ করিয়া পত্র লিখিতে হইবে।

"সখা" কার্য্যালয়,
৫০ নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট।
কলিকাতা।
} কার্য্যাধ্যক্ষ।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে মুদ্রিত এবং ৫০নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট, "সখা" কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

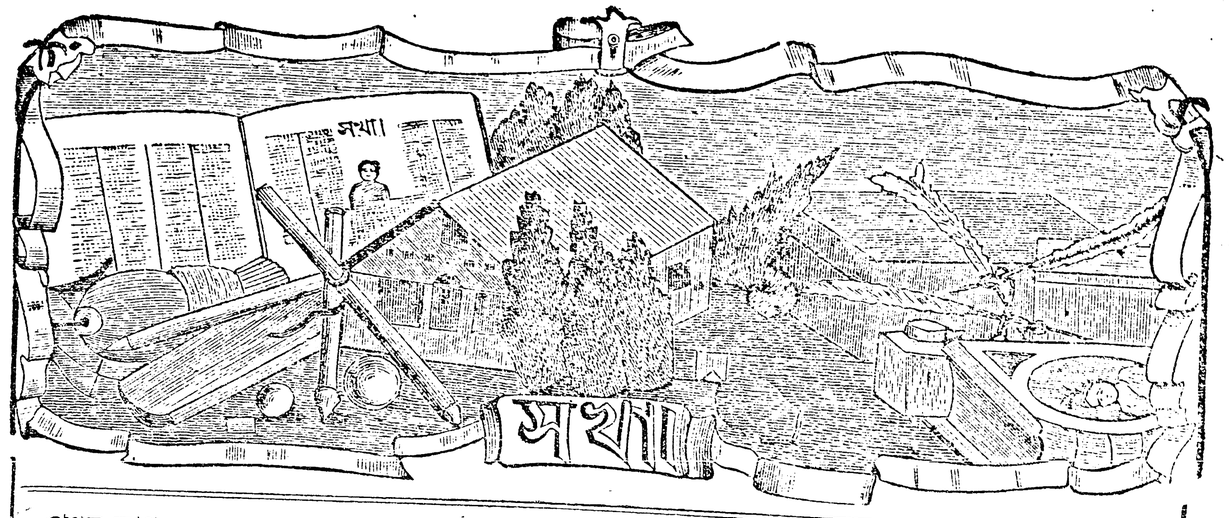


প্রথম ভাগ। নবেম্বার, ১৮৮৩। ১১শ সংখ্যা।

## ঠাকুরদাদার গল্প।

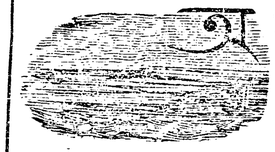

অদ্য বালকেরা সকলে পরামর্শ করিয়া স্থির করিয়াছে দাদা মহাশয়কে একটী প্রশ্ন করিবে:—কতকগুলি বস্তু বেশ শক্ত আর কতকগুলি পাৎলা কেন? নবীন বাবু আসিবামাত্র সকলে প্রণাম করিয়া এক বাক্যে ঐ প্রশ্নটী জিজ্ঞাসা করিল। তিনিও সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন "ক্রমে তোমরা কঠিন বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছ, তা ভাল; আমিও বুঝাইয়া দিব, কেবল তোমরা খুব মনোযোগ দাও, যেখানে না বুঝিবে অমনি বলিবে। এক মনে শুন। পৃথিবীতে যতগুলি বস্তু আছে সমস্তকেই তিনটী ভাগ করা যায়,—যথা, কঠিন, তরল ও বাষ্পীয়। ধাতু, কাষ্ঠ, পাথর, কাচ, কাগজ, জন্তুদিগের হাড়, প্রভৃতি যে সকল শক্ত জিনিষ দেখা যায় তাহারা 'কঠিন'। দুগ্ধ, জল, তৈল, প্রভৃতি যে সকল দ্রব্যকে আমরা পাৎলা বলি তাহারাই 'তরল'। এবং বায়ু, জলীয় বাষ্প, ধূম প্রভৃতি পদার্থ গুলিকে 'বাষ্পীয়' কহে। এই তিন জাতীয় বস্তুর মধ্যে কঠিন দ্রব্য সকলের নির্দ্ধারিত আকৃতি আছে, যেখানেই রাখ ইহাদের সে আকার বদ্‌লিয়া যায় না। কিন্তু পাৎলা জিনিষের কোন রকম নির্দ্দিষ্ট আকার নাই, যে পাত্রে তাহারা থাকে সেই পাত্রেরই আকার অবলম্বন করে, বুঝিলে? (সকলে "হাঁ")। বাষ্পীয় পদার্থের বিশেষ গুণ এই যে উহারা কোন সীমাবদ্ধ পাত্রে বা স্থানে আবদ্ধ থাকিতে চায় না, কেবল উড়িয়া উড়িয়া ছড়াইয়া বেড়ায়। একটী বাটিতে এক বাটি জল রাখিলে তাহা তেমনি থাকে, কিন্তু এক বাটি ধূম রাখিলে সেরূপ থাকে না; অমনি উড়িতে আরম্ভ করে ও কয়েক মিনিটের মধ্যেই বাটি বায়ুতে পূর্ণ হইয়া সমস্ত ধূম অদৃশ্য হয়, না? (সকলে "তা জানি"।) কঠিন বস্তুকে ভিন্ন আকারের করিতে হইলে, কি বিভাগ করিতে হইলে অনেক বল আবশ্যক; তরল বস্তুকে বিভাগ করা খুব সহজ, অতি সামান্য বলেই জলীয় পদার্থ সকল ভিন্ন হইয়া পড়ে; বায়বীয় পদার্থকে বিভাগ করিতে একটুও বল লাগে না, তাহারা আপনারাই সর্ব্বক্ষণ বিভিন্ন হইতে চেষ্টা করিতেছে, বরং তাহাদিগকে একত্র রাখিতেই বলের আবশ্যক। সোডা ওয়াটারের বোতলের ভিতর যে বাষ্প থাকে তাহাকে উহার মধ্যে রাখিবার জন্য একটা খুব মজবুত ছিপি শক্ত তার দিয়া বাঁধিয়া রাখিতে হয়, যাই ঐ তার খোলা যায় অমনি দম্ করিয়া ছিপিটী ছিট্‌কিয়া যায় এবং ঐ গ্যাস বাহির হইতে

থাকে, ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে কতকটা জলও বাহির হয়। ইহাতেই দেখা যাইতেছে, কতকটা জলীয় পদার্থ একটা পাত্রে রাখিয়া দিলেই ঠিক থাকে; কিন্তু বাষ্পীয় কোন পদার্থ অধিক পরিমাণে কোন পাত্রে রাখিলে কিছুতেই সেরূপ থাকে না, কেবল বলপূর্ব্বক তাহাকে সেইরূপে রাখিতে হয়। কেমন? (সকলে "সত্যি? তাতো জানিতাম না"।) কোন টেবিলের উপর একটী কঠিন দোয়াত ঠিক বসাইয়া রাখা যায়, কিন্তু তাহা হইতে খানিকটা কালি ঢালিলে ঐ কালী কখন উঁচু হইয়া দোয়াতের মত থাকে না, উহা গড়াইয়া যাইবে, কিন্তু বাষ্পীয় পদার্থের মত উড়িয়া যাইবে না। কোন কঠিন দ্রব্য ভাঙ্গিয়া তাহা আর যোড়া যায় না, ভাঙ্গা হাঁড়ী যোড়া লাগে না। কিন্তু কোন তরল বস্তুকে যেমন সহজে বিভাগ করা যায় তেমনি সহজেই আবার একত্র করিলেই মিশিয়া যায়। বাষ্পীয় পদার্থ স্বাধীন, স্বেচ্ছামত আপনা আপনিই বিভক্ত হইতেছে, আবার মিশিতেছে, যেখানে ইচ্ছা যাইতেছে, মানুষের কথা শুনে না"। (সকলের হাস্য)

কিশোরী একটু ব্যস্ত হইয়া বলিল "ও সব জানি। কেন এরূপ হয়, তাহাই বুঝাইয়া দিন না?" নবীন বাবু বলিলেন "তাই বলিব শ্রবণ কর। কোন জিনিষকে ভাগ করিতে করিতে ক্রমে খুব ছোট হইয়া যায়, আরও ভাগ কর, ১০০, ২০০, ২০০০, ২০০০০ ভাগ, আরও আরও এইরূপ করিতে করিতে অবশেষে একটী এমন ছোট বিন্দুবৎ কণা পাওয়া যাইবে যাহা আর ভাগ করা যায় না। (তত ছোট বস্তু দেখাই যায় না, ভাগ করিব কিরূপে?) তবু মনে কর যদি করা সম্ভব হইত, তাহা হইলে সর্ব্বশেষে এ প্রকার বিভাগ করা অসম্ভব এমন একটী কণা পাওয়া যাইত—এইটীর নাম "পরমাণু"। পৃথিবীর যাবতীয় পদার্থ এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরমাণুর দ্বারা প্রস্তুত। কি কঠিন, কি তরল, কি বাষ্পীয়, কি স্বর্ণ, কি লৌহ, কি মৃত্তিকা, কি রক্ত, কি বৃক্ষলতাদি, সমস্ত বস্তুই এই পরমাণুর সমষ্টি মাত্র। কোটী কোটী পরমাণু মিলিত হইয়া এক একটী বালুকাকণা নির্ম্মিত হইয়াছে। কোটী কোটী পরমাণু লইয়া এক একটী জলীয় বাষ্পের কণা হইয়াছে। এইরূপ অসংখ্য অসংখ্য পরমাণু লইয়াই এ বিশ্ব সংসারের সৃষ্টি।"

মন্মথ:—যদি একই পরমাণু দ্বারা সমুদায় বস্তু প্রস্তুত হইয়াছে, তবে ভিন্ন ভিন্ন বস্তু ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ইহার কারণ কি?"

অমূল্য:—তবে একটী বা শক্ত কেন, আর একটী নরম কেন?

নবীনবাবু:—এই পরমাণুগুলির একটী প্রধান গুণ এই যে ইহারা পরস্পরকে আপনার দিকে টানে। প্রত্যেক পরমাণু অপর সকলগুলিকেই নিজের দিকে টানে, তবে স্থান ও অবস্থাভেদে সকল পরমাণুর টানের জোর সমান নহে। কিন্তু এমন একটীও নাই যে এই "আকর্ষণের" অধীন নয়। চারিদিকে আমরা যে সকল বস্তু দেখিতে পাই সে সমস্ত এই আকর্ষণের বলেই বর্ত্তমান আছে। যে দ্রব্য কেন হউক না, এ আকর্ষণ না থাকিলে থাকিত না। ক্রমে যখন বড় হইবে এই আকর্ষণ শক্তির যে কত ক্ষমতা, ইহা দ্বারা যে পৃথিবীর কত কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে তাহা বুঝিতে পারিয়া অবাক্ হইবে। একটা ঢিল উপরে ছুড়িয়া দিলে, ছুড়িবার বল যতক্ষণ রহিল, উহা ততক্ষণ উর্দ্ধে উঠিল, তৎপরেই মাটীতে পড়িবে কেন? (সকলেঃ 'মাটী বুঝি উহাকে টানে?") ঠিক বলিয়াছ। এই পৃথিবী অতি প্রকাণ্ড, ইহাতে অসংখ্য পরমাণু আছে, সুতরাং পৃথিবীতে যত বস্তু আছে তাহাদের সকলের অপেক্ষা পৃথিবীর নিজের আকর্ষণ শক্তি বেশী। মনে কর তোমার দলে ১০ জন লোক, আমার দলে ১০০ জন, কিশোরীর দলে হাজার জন। তাহলে কার বেশী জোর হবে?



(সকলেঃ—"কিশোরীরই"। তেমনি পৃথিবীতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক পরমাণু আছে বলিয়া অন্য সমস্ত দ্রব্য অপেক্ষা ইহার টানিবার ক্ষমতা বেশী। এই জন্যই সব জিনিষ পৃথিবীতে আছে, এজন্যই ফলগুলি পাকিলে মাটীতে পড়িয়া যায়। এজন্যই লৌহের দ্রব্য ভারী বোধ হয়, কেন না তাহাকে হাতে লইলেই পৃথিবী টানিতে থাকে, সেই টান ভার বলিয়া বোধ হয়। বুঝিলে?

কিশোঃ—যেমন একটা জিনিষের একদিকে আমি আর একদিকে আর কেহ টানিলে আমার হাতে জোর লাগে, ঠিক তেম্নি, আমি ধরিয়া আছি পৃথিবী নীচে হইতে টানিতেছে এজন্য ভারী হয়, এই ত?

নবীনবাবু সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন—"হাঁ ঠিক বুঝিয়াছ, তাই বটে। শুধু লৌহের দ্রব্য কেন, পৃথিবীতে যত বস্তু আছে সমস্তই এই আকর্ষণের বশ। ইহাকে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ কহে। তদ্ভিন্ন প্রত্যেক বস্তুর নিজের পরমাণুগুলির যে পরস্পর আকর্ষণ আছে তাহার কাজ ঐ পরমাণুগুলিকে একত্র রাখিবার চেষ্টা করা। এই আকর্ষণকে আণবিক আকর্ষণ বলে। এটী থাকাতেই আমরা প্রত্যেক বস্তুর আকার দেখিতে পাই, নতুবা কেবল রাশি রাশি পরমাণু পৃথিবীময় ছড়ান দেখিতাম। সুন্দর বৃক্ষলতা, চমৎকার সুবর্ণালঙ্কার, পরম শোভাময় কাচের বাসন, বৃহৎ অট্টালিকা, প্রকাণ্ড পর্ব্বত, কোন বস্তুই থাকিত না। ঐ পরমাণুগুলিকে একত্র করিয়া রাখিবার ক্ষমতা মাধ্যাকর্ষণের নাই, ইহা বরং উহাদিগকে টানিয়া আলাদা করিতে চায়, কঠিন বস্তুর আণবিক আকর্ষণ অধিক বলিয়াই পারে না। এখন বেশ বুঝিলে প্রত্যেক পরমাণুর উপর দুইটী শক্তি কার্য্য করিতেছে; একটী তাহার নিকটবর্ত্তী পরমাণুগুলির সঙ্গে তাহাকে মিশাইতে চায়, আর একটী তাহাকে তাহাদের নিকট হইতে ভিন্ন করিয়া পৃথিবীর দিকে ফেলিয়া দিতে চায়। এখন সহজেই বুঝিতে পারিবে, যে শক্তিটী অধিক বলবান হইবে তাহারই দিকে সেই পরমাণুটী যাইবে। যদি মাধ্যাকর্ষণ শক্তির বল আণবিক আকর্ষণ অপেক্ষা অধিক না হয় তাহা হইলে পৃথিবী আর তাহাকে ভিন্ন করিতে পারিল না; কেমন? (সকলে "হাঁ তাত হবেই।")

সুতরাং তাহার যেমন আকার তেমনি থাকিয়া গেল। এইরূপ পদার্থকেই 'কঠিন' বলে। আবার যে বস্তুতে আণবিক আকর্ষণ অপেক্ষা মাধ্যাকর্ষণের শক্তি অধিক, সে বস্তুর পরমাণুদিগকে পৃথিবী টানিয়া আলাদা করিয়া ফেলে, সব পরমাণু গড়াইয়া, আল্‌গা হইয়া, মাটীতে ছড়াইয়া পড়ে। ইহাদিগকেই 'তরল' বা পাৎলা বলে। ইহাদের নিজেদের ভিতরে তেমন আঁট্ নাই, অথচ শক্ত পৃথিবী সর্ব্বদাই ইহাদিগকে ছাড়াইবার চেষ্টা করিতেছে, কাজেই ইহারা আর ঠিক থাকিতে পারে না। এইরূপে আমরা বেশ বুঝিলাম, কি প্রকার বস্তু কঠিন ও কি প্রকার দ্রব্য তরল। যাহার আণবিক আকর্ষণ পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের অপেক্ষা অধিক বলবান তাহার পরমাণুরা পৃথিবীকে যেন বলে 'তুমি টান না, তোমার চেয়ে আমাদের মিল বেশী, আমরা কখন আলাদা হব না।' এই সকল দ্রব্যই 'কঠিন' হয়। তাহাদের মধ্যে এমনি 'ভাব' যে পৃথিবীর মত প্রকাণ্ড জিনিষও তাহাদের মধ্যে 'আড়ী' করাইতে পারে না। (সকলে হাসিল ও বলিল "বেশ বুঝিয়াছি।") আর যে সকল জিনিষের পরমাণুদের আকর্ষণ অপেক্ষা পৃথিবীর আকর্ষণ-শক্তি বেশী, পৃথিবী তাহাদিগকে বলে—'কেমন জব্দ, এখন আয়, সব ছাড়িয়া পড়্।' ইহারাই পাৎলা ইহাদের এইরূপ অসহায় অবস্থা বলিয়াই আমরা ঘটী, বাটী, হাঁড়ী, খোরা প্রভৃতি পাত্রে ইহাদিগকে রাখি, তাহা হইলে আর ইহারা ছড়াইতে পারে

না, কঠিন পদার্থের মত ইহাদিগকে রেকাবীতে কিম্বা টেবিলে রাখিবার যো নাই।

"কঠিন ও তরল দুই প্রকার দ্রব্য কি রূপে হয় তাহা বুঝিলে; এই বার বাষ্পীয় দ্রব্যের কারণ বলিব শ্রবণ কর। বাষ্পীয় পদার্থেরও পরমাণুকে পৃথিবী আকর্ষণ করে, কিন্তু তাহাদের আর একটী গুণ আছে. তাহাদের পরমাণুগুলিতে আর একটী শক্তি কার্য্য করিতেছে, সে শক্তিটী বড় প্রবল। উহার বল এত অধিক যে আণবিক ও পৃথিবীর আকর্ষণ দুটী শক্তিও তাহার সমকক্ষ হইতে পারে না। পৃথিবী সমস্ত বলে ইহাকে টানিতেছে তথাপি উহা মাটীতে কঠিন ও তরল দ্রব্যের মত পড়িয়া থাকে না। এই তৃতীয় শক্তির নাম—'আণবিক বিয়োজন'। ইহার কার্য্য কেবল প্রত্যেক পরমাণুকে অন্য সকল পরমাণু হইতে দূরে ব্যাপ্ত করা। ইহা যেন পরমাণুদের মধ্যে গৃহবিচ্ছেদ ঘটাইবার জন্যই আছে। যাহাতে এক একটী অণু অন্য সকল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বতন্ত্র হয়, ইহাই এই বিয়োজন শক্তির উদ্দেশ্য। এই জন্যই, কি আণবিক আকর্ষণ, কি মাধ্যাকর্ষণ, ইহার কাছে কাহারও বল খাটে না। এজন্যই বায়ু, বাষ্প প্রভৃতি পদার্থ সকল স্বাধীনভাবে আকাশে বেড়ায়, কোন সীমাবদ্ধ পাত্রে আবদ্ধ থাকিতে চায় না। বিস্তীর্ণ আকাশই ইহাদের গৃহ। পুষ্করিণী, নদী, হ্রদ, সমুদ্র প্রভৃতি হইতে জল বাষ্প হইয়া এই নিমিত্তই আকাশে উঠে এবং সেখানে মেঘরূপে ইতস্ততঃ বিচরণ করে।

"এখন বোধ করি বুঝিলে কি প্রকারে পরমাণুগুলির অবস্থাভেদে পদার্থ সকল কঠিন, তরল ও বাষ্পীয় তিন প্রকারে বিভক্ত। পৃথিবীর সমস্ত বস্তুই এই তিন অবস্থার একটী না একটীতে দেখা যায়। হয় কঠিন, না হয় পাৎলা, নয়ত বাষ্পীয়। এ সম্বন্ধে আর একটী কথা বলিয়া আজ বাড়ী যাইব। কঠিন দ্রব্যও তরল করা যায় ও বাষ্পীয় করা যাইতে পারে। তরল বা বাষ্পীয় দ্রব্যকেও কঠিন করা যায়।" অমূল্যঃ—"কেন যাবে না? বাতী, গালা প্রভৃতি কত কঠিন পদার্থ আগুণে দিলেই গলিয়া পাৎলা হয়। আবার দুধ, মালাই, লেবুর রস প্রভৃতি সব ঠাণ্ডা করিয়া কুল্পী তৈয়ার করে, তখন ঐ পাৎলা জিনিষগুলি ত জমিয়া কঠিন হয়।" বিনয়ঃ—"আর বরফ? বরফ ত জল জমিয়াই হয়।"

নবীন বাবু বড় সুখী হইয়া বলিলেন "ঠিক। উত্তাপদ্বারা কঠিন দ্রব্য তরল হয়, এবং তরল দ্রব্য বাষ্পীয় হয়। তোমরা সকলে জান স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি ধাতু আগুনে দিলেই গলিয়া যায়। আরও জান রৌদ্রে জল গরম হইয়া বাষ্প হয়, ও কড়ায় দুধ জ্বাল দিবার সময়ে কড়া হইতে বাষ্প উঠে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে উত্তাপ তরল বস্তুকে বাষ্পীয় করে ও কঠিন দ্রব্যকে তরল করিয়া দেয়। ইহার কারণ এই যে—উত্তাপের একটী বিশেষ গুণ—উহা দ্রব্য মাত্রেরই আণবিক আকর্ষণ হ্রাস করিতে থাকে, সুতরাং অল্পক্ষণ মধ্যেই কঠিন স্বর্ণ রৌপ্যাদি পদার্থ উত্তপ্ত হইলে প্রথমে কোমল ও পরে তরল হয়। আরও উত্তাপ দিলে অবশেষে উহাদের আণবিক আকর্ষণ একবারে বিনষ্ট হয়, এবং বিয়োজন বর্দ্ধিত হইয়া তাহাদিগকে বাষ্প করিয়া দেয়। উত্তপ্ত হইলে এইরূপ যেমন পরমাণুর আকর্ষণ হ্রাস হয়, শীতল হইলে তদ্রূপ উহা বর্দ্ধিত হয়, এবং তজ্জন্য শীতে বাষ্প ঘন হইয়া তরল হয় এবং আরও শৈত্য পাইলেই তরল পদার্থ সকল জমিয়া কঠিন হইয়া যায়। এই কারণেই জলের বাষ্প জমিয়া জল হয়, এইজন্য শ্লেটে হাই দিলে মুখের জলীয় বাষ্প সকল প্রশ্বাসের সঙ্গে আসিয়া শীতল শ্লেটে লাগিয়া জমিয়া যায় ও জলকণারূপে দেখা যায়। এই জন্যই একটা গ্লাস বরফ রাখিলে, ঐ ঠাণ্ডা গ্লাসের গায়ে লাগিয়া বায়ুর অদৃশ্য জলীয় বাষ্প সকল জমিয়া যায় ও গ্লাস



ঘামে বলিয়া বোধ হয়। এই জন্যই আবার দুধ, মালাই, লেবুরস, আনারসের জল প্রভৃতি তরল পদার্থ সকল বরফের মধ্যে রাখিয়া জমাইয়া বরফ করে ও কুল্পী করিয়া ফেরিওয়ালারা বিক্রয় করে। এই জন্যই বৃষ্টির ফোঁটা জমিয়া গিয়া শিলাবৃষ্টি হয়। এই জন্য শীত-প্রধান দেশে জল জমিয়া বরফাকারে কঠিন হয়।"

কিশোরীঃ—শক্ত নরম জিনিষের বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া আজ আমরা কত নূতন কথা শিখিলাম। পরমাণু, আণবিক আকর্ষণ, আণবিক বিয়োজন পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ—কত শিখিলাম। দেখ ভাই, যখন 'সখাতে' এ বিষয় লেখা হবে তখন এই সকল কথা আবার অনেক বার পড়িব, না হইলে মনে থাকিবে না, আর এ শিক্ষার কোন ফলই হইবে না।" তৎপরে হৃষ্টমনে সকলে বাড়ী গেলেন।

---

# খোলা ভাঁটীর ফল।

## (১ নং)

### রাধালতার দুঃখের কথা।

আজ কাল আমাদের দেশে সকল স্থানেই মদের দোকান হইয়াছে, এই সকল দোকানে মদ প্রস্তুত হয় বলিয়া দোকানদার বেশ অল্প মূল্যে মদ বিক্রয় করিতে পারে। আগে মদের দাম অধিক ছিল, এই জন্য টাকা না থাকিলে যে সে মদ খাইতে পাইত না, কিন্তু এখন সস্তা হইয়া অনেক গরিব দুঃখী লোকও মদ খাইতে শিখিতেছে। নিজের পরিবারের ছেলেদের হয়ত মুখের খাবার নাই, পরিবার কাপড় নাই, অথচ বাড়ীর কর্ত্তা ঘটী, বাটি বেচিয়া মাতাল হইতেছে, এবং বাড়ীতে সকলের উপরে উৎপাত করিতেছে। আজ কাল এইরূপ যে কত স্থানে হইতেছে তাহার খোঁজ নাই। আমরা এইরূপ একটী পরিবারের দুঃখের কথা বলিব।

রামগোবিন্দ যে গ্রামে বাস করে, সেখানকার পাল্‌কী বেহারাদিগকে 'কাহার' বলে। রামগোবিন্দ এই 'কাহার'এর কাজ করিত। তাহার শরীর বেশ মোটা সোটা; গায়ে বেশ বল, পাল্‌কী বইতে তাহার মতন মজপুত আর কে ছিল? কিন্তু দেশে মদের দোকান বসিয়া মদ সস্তা হইয়া গেল; তখন কি "ভদ্দরলোকের খাবার" না খাইয়া গরিব কাহারের ছেলে থাকিতে পারে? রামগোবিন্দ মদ ধরিল;—কি সর্ব্বনাশ! এক দিন খাইয়া আর একদিন খাইতে ইচ্ছা হইল, তার পর আর এক দিন, তার পর আর একদিন, এই রূপে রামগোবিন্দ ভয়ানক মাতাল হইয়া উঠিল। তাহার স্ত্রী একটী ছোট মেয়েকে লইয়া পাড়ায় ঘুরিয়া কখনও চা'ল, কখনও ডা'ল ভিক্ষা করিয়া আনিত, এবং নিজেদের বাড়ীর পাশের জঙ্গল হইতে শাকটা, পাতাটা, কুড়াইয়া আনিয়া তাহার দ্বারাই কোনমতে বাঁচিয়া থাকিত। অবশেষে মনের দুঃখে, ক্ষুধার জ্বালায়, ব্যামোয় পড়ে, সতী সাধ্বী মরিয়া গেল। একদিন রামগোবিন্দ টলিতে টলিতে ঘরে আসিয়া দেখিতে পাইল যে তাহার স্ত্রী মরিয়া গিয়াছে; তখন সে তথা হইতে চলিয়া গেল। রাধালতা তখন ৯ বৎসরের বালিকা। সে নিরুপায় দেখিয়া কাঁদিতে লাগিল। প্রতিবেশীরা আসিয়া দেখিলেন—মায়ের মৃত শরীরের পাশে পড়িয়া রাধালতা ফুপিয়া কাঁদিতেছে। তখন তাঁহারা দয়া করিয়া রাধার মায়ের শরীর শ্মশানে লইয়া গেলেন—শরীর পুড়িয়া গেল। যাক্; চিরকাল জলে পুড়ে মরা অপেক্ষা একেবারে পোড়া ভাল নয় কি?

অনেকে ভাবিয়াছিল স্ত্রীর মৃত্যুতে মাতাল ভাল হইবে, কিন্তু তাহা হইল না। নেশা ছুটিয়া গেলে রামগোবিন্দ একটু নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিল

"রাধা! তুই রান্না বান্না কর্, আমি একবার বেড়িয়ে আসি। আজ থেকে তোকেই সমস্ত কর্‌তে হবে—আর কে কর্‌বে?" এই কথা শুনিয়া রাধা কাঁধিয়া উঠিল, এবং আস্তে ব্যস্তে উঠিয়া কি রাঁধিবে তাহার উদ্যোগ দেখিতে গেল;—রামগোবিন্দ ও একটুখানি "টানিতে" গেল।

প্রায় আড়াই বৎসর এই ভাবে কাটিল; রাধার বয়স এখন ১১ বৎসরের কিছু অধিক। এত দিন মাতাল রাধাকে কিছুই বলে নাই, কিন্তু এখন বড়ই উৎপাত করিতে লাগিল। নিজে পয়সা দিবে না, ঘটী বাটি সমস্তই, হয় বিক্রয় হইয়াছে, না হয় বাঁধা আছে, অথচ বাড়ীতে আসিয়া খাবার না পাইলে রক্ষা ছিল না। বেচারা রাধা ছেলেমানুষ, এত কষ্ট সহ্য করিতে পারিবে কেন?

শীতকাল, তাহাতে অল্প অল্প বৃষ্টি হইতেছে; পৃথিবীর যত শীত, আজ যেন সমস্তই রাধার ঘরে আসিয়া যুঠিয়াছে। ঘরটীকে ঘর না বলিয়া 'গোয়াল' বলিলেও হয়, চারিদিকে খড় উড়িয়া গিয়াছে, মেটে দেয়াল হাজার ছিদ্রে পূর্ণ, মেজেয় ধূলো উড়িতেছে, এইত দশা; তাহাতে আবার গায়ে মোটা কাপড় ছিল না, কেবল আঁচলটী জড়াইয়া কোন মতে বালিকা শীত বারণ করিতেছিল। ও পাড়ার জগ'পিশী খানকতক কাঠ দিয়াছিলেন, তাহাতে আগুন ধরাইয়া রাধা একটু ছোট আগুন তোয়ের করিয়া শীত থামাইতে লাগিল এবং কখন্ বাবা বাড়ীতে আসিবেন, তাহার ভাবনা ভাবিতে লাগিল। ঘরে একটুখানি বাতি ছিল; রাত্রি হইয়াছে দেখিয়াও রাধা তাহা জ্বালিল না, কারণ ফুরাইয়া গেলে আর কে দিবে? একটী মাদুরের উপর পড়িয়া রাধা নানা রকম দুঃখের কথা ভাবিতে ভাবিতে ঘুমাইয়া পড়িল। সে দিন রাধার খাওয়া হয় নাই,—কে দিবে? রাধা গরিবের মেয়ে, কিন্তু কখনও ভিক্ষা করিতে তাহার ইচ্ছা হইত না! এত ক্ষুধায় বালিকার নিদ্রা আসিল? আশ্চর্য্য! কিন্তু ঘুমাইয়া অধিকক্ষণ থাকিতে পারে নাই, কি একটী শব্দে রাধালতার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল।

রামগোবিন্দ ঘরে আসিতেছে, এ তাহারি শব্দ। হুড়্ মুড়্ শব্দে দরজা ভাঙ্গিয়া রামগোবিন্দ ঘরে ঢুকিল এবং অন্ধকারে 'রাধা' 'রাধা' করিয়া ডাকিতে লাগিল। রাধা বলিল 'বাবা! এসেছ? কি চাও?"—মাতাল আলো জ্বালিয়া খাবার দিতে বলিল। রাধালতা সেই পুঁজিকরা বাতিটুকু ধরাইয়া আলো জ্বালিল বটে, কিন্তু খাবার কোথায় পাইবে? বলিল "বাবা! আজ আর কিছুই নাই—আমি নিজেও কিছুই খাই নাই।" মাতাল ভয়ানক রাগিয়া বলিল "ভিক্ষা ক'রে, না হয় চুরী ক'রে আন্‌তে পারিস্ নি?" বালিকা কি বলিতে যাইতেছিল,মাতাল বাধা দিয়া বলিল "মুখে মুখে উত্তর?" এই বলিয়া বালিকার কোমল শরীরে যে কি ভয়ানক প্রহার করিল, তাহা মনে করিতেও কান্না পায়। প্রহারের জ্বালায় অস্থির হইয়া বালিকা পিতার হাত ছাড়াইয়া ঘরের বাহিরে গেল, এবং "ওমাগো" "ওমাগো" বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে চলিতে লাগিল।—টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে, তাহাতে হাড়ভাঙ্গা শীত। হায়! হায়! মদে কি সর্ব্বনাশ করিল? কেন রামগোবিন্দ মদ ধরিয়াছিল? বালিকা সেই রাত্রে ঘুরিতে ঘুরিতে এক বাড়ীর বারান্দার নীচে দাঁড়াইল, ক্রমে বসিয়া পড়িল, ক্রমে অজ্ঞান হইয়া গেল।

কোন্ দিক দিয়া রাত্রি চলিয়া গেল, রাধা তাহা জানিল না; আবার সূর্য্য উঠিল, পাখীগুলি আবার মনের আনন্দে গান গাহিল, তাহারা দুঃখিনী বালিকার দুঃখ বুঝিল না। রাধালতা চেতনা পাইয়া খানিক দূরে রোদ্ পোহাইতে বসিল; তাও কি বেচারা ক্ষুধার জ্বালায় বসিতে পারে?—সে বসিয়া "ওমাগো! ক্ষুধায় প্রাণ গেল! পরমেশ্বর!" এই বলিয়া কাঁদিতে লাগিল।



রাধার চক্ষের জলে বুক ভাসিয়া যাইতেছে; যদি সে পরমেশ্বরকে ডাকিতে জানিত, তাহা হইলে বোধ হয় এই বলিয়া ডাকিত—"দীনবন্ধু! তুমি না কাঙ্গালকে ভালবাস? কাঙ্গাল কার কাছে যাবে? তুমি না রাখলে কোথায় যাবে?" ক্রমে রাস্তা দিয়া দুই চারি জন লোক চলিতে লাগিল; রাধা আর সহ্য করিতে না পারিয়া ভিক্ষা চাহিতে আরম্ভ করিল, কিন্তু কে তাহাকে ভিক্ষা দেয়—কেহই দিল না!

অতি দুঃখে মানুষ চেঁচিয়ে কাঁদিতে পারে না রাধারও তাহাই হইল। সে দুই হাতে মুখ লুকাইয়া ফুপিয়া ফুপিয়া কাঁদিতে লাগিল। এমন সময় ভট্টাচার্য্যদের বাড়ীর সুবালা সেইখানে আসিল। সুবালা বড় ভাল মেয়ে,—কাহারও সহিত 'ঝগড়াঝাটী' নাই, মুখপোরা হাসি, কথাগুলি বড়ই মিষ্ট, যে শোনে তাহারই মন মোহিত হয়। একটী জিনিশ সুবালা বড়ই ভালবসিত—সেটি খেলা; কিন্তু পুতুলের কাছে খেলাও কিছুই নয়। এই পুতুল কিনিবার জন্য সুবালা একটী সিকি লইয়া পাড়ার পাশে খেলনাদোকানে যাইতেছিল, এমন সময় দেখিল যে তাহারই মত একটী ছোট মেয়ে ভয়ানক কাঁদিতেছে। তখন সুবালার বড় দুঃখ হইল—সে নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল "হ্যাগা, তুমি কেন কাঁদ্‌ছ? বল না? আমায় বলনা?"—রাধা নিজের দুঃখের কথাগুলি সমস্ত বলিল। আহা! মরা যেখানে থাকে, সেখানে বুঝি ছোট বড় থাকে না? বড় লোকের মেয়ে সুবালা গরিবের ঘরের রাধার দুঃখের কথা শুনিতে শুনিতে কাঁদিয়া ফেলিল। ভগ্নী যেমন ভগ্নীর দুঃখে কাঁদে, এ সেইরূপ কান্না; পরে কিছু শান্ত হইয়া বলিল—"তুমি কাল থেকে কিছু খাওনা; এই সিকিটা লইয়া খাবার খাও।" ওইযা! সুবালা পুতুল কিনিবার সিকিটা দিয়া ফেলিল? এত সাধের পুতুল কেনা হবে না? সুবালা সে কথা ভাবিল না—সিকিটী ফেলিয়াই দৌড়িয়া মায়ের কাছে গেল এবং তাঁহাকে সমস্ত ঘটনা বলিল। মা বড়ই খুশী হইয়া সুবালার মুখচুম্বন করিলেন, এবং তাহার সহিত আসিয়া দেখিলেন, রাধা শীতে কাঁপিতেছে, উঠিয়া খাবার আনিতে যাইবে এমন সাধ্য নাই। সুবালার মা তাহাকে মিষ্ট কথা বলিয়া আপনার ঘরে লইয়া গেলেন, এবং সেখানে আগুন জ্বালিয়া, তাহাকে কিছু গরম করিয়া, গরমজলে স্নান করাইয়া দিলেন। সুবালার আহ্লাদ দেখে কে? তাহার খেলিবার একটী সঙ্গী যুঠিল। এখানে থাকিয়া গরিবের মেয়ে রাধা ঘরের কাজকর্ম্ম করিয়া কিছু কিছু উপার্জ্জন করিতে লাগিল, এবং তাহার দ্বারা পিতার খরচ চালাইতে আরম্ভ করিল। তাহার বাপ যখন বুঝিতে পারিল যে তাহার অত্যাচারে রাধা বাড়ী ছাড়িয়াছে, তখন কোথায় তাহার মনে কষ্ট হইয়া মদ ছাড়িয়া দিবে, তাহা না হইয়া সে আগের মতই রহিল। অবশেষে একবার চুরী করিয়া সে জেলে গেল, এবং সেইখানেই ভয়ানক পরিশ্রমে ব্যারাম হইয়া তাহার মৃত্যু হইল। রাধার কানে এই সম্বাদ গেলে সে অনেকদিন কাঁদিয়া কাঁদিয়া শেষে শান্ত হইল। এমন বাপের এমন মেয়ে? বাপ চিরকাল অত্যাচার করিলেন, মেয়ে চিরকালই ভাল বাসিল। কিসে এ তফাৎ? উত্তর—রামগোবিন্দ মাতাল, রাধা মদ স্পর্শও করিত না। মদে এত সর্ব্বনাশ করে? তবুও লোকে মদ খায়।

---

## ডেভিড্ লিভিংষ্টোন্ সাহেব।

মরা সকলেই বোধ হয় ইচ্ছা কর, বড় লোক হই; এমন কেউ আছেন কি না জানি না, যিনি বড় লোক হইতে চান না। মনের কথা বলিতে কি, আমারত বড়ই ইচ্ছা করে; আমি যখন কোন বড় লোকের

জীবনচরিত পড়ি, বা কোন বড় লোকের গল্প শুনি, তখন আমার বড়ই চোখ টাটায়, 'আমার কিছুই হইল না, আমি বড় লোক হইতে পারিলাম না, আমি ইহাঁর মত ভাল লোক হইতে পারিলাম না,' এইরূপ অনেক কথা আমার মনে হয়। দুঃখ হয় বটে, কিন্তু তবুও বড় লোকের কথা শুনিতে ইচ্ছা করে, কারণ বড় লোকের কথা শুনিতে শুনিতে বড় লোক হইতে ইচ্ছা হয়। আমি টাকার বড় লোক হইতে চাই না, কারণ টাকা থাকিলেই মানুষ সুখী হয় না—এমন কত লোক আছেন যাঁহারা ধর্ম্মের জন্য টাকা কড়ি উপার্জ্জন করা ছাড়িয়া দিয়া গরিব হইয়াছেন,—কিন্তু যে কাজ করিলে মানুষ হওয়া যায়, যেরূপ চরিত্র থাকিলে পাপের দিক হইতে মন ফিরিয়া গিয়া ভাল কাজে বসিয়া যায়, আমার বড়ই ইচ্ছা করে আমার কপালে সেইরূপ হয়।

ডেভিড্ লিভিংষ্টোন সাহেবের বাড়ী ইংলণ্ডের উত্তরে ছিল। পিতা অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন বলিয়া তিনি ছেলে বেলা স্কুলে পড়িতে পান নাই। কিন্তু অনেক ছেলে যেমন স্কুলে যাইতে না পাইয়া বাঁদর হইয়া যায়, বাপ মায়ের গুণে ডেভিড্ লিভিংষ্টোনের সেরূপ দোষ হয় নাই। বাপ মা যদি ভাল হন, এবং ছেলেদিগকে ভাল উপদেশ দেন, তাহা হইলে ছেলেরাও যে ভাল হয়, তাহার দৃষ্টান্ত এই সাহেব দেখাইয়াছেন। ছেলে বেলা একটী কলে কাজ করিয়া তিনি কিছু কিছু পয়সা পাইতেন, তাহার দ্বারাই দুই এক খানি করিয়া পুস্তক কিনিয়া পড়িতে আরম্ভ করিলেন। যত্ন থাকিলে কি না হয়? লিভিংষ্টোন সাহেব দিনে কাজ কর্ম্ম করিয়া রাত্রিতে একটী বিদ্যালয়ে পড়িতে লাগিলেন—কারণ রাত্রিতে যে সকল বিদ্যালয় হয়, তাহা গরিবের ছেলের জন্য এবং তাহাতে বেতন লাগে না। এইরূপ নিজের পরিশ্রমের গুণে তিনি বেশ সুন্দররূপ লেখা পড়া শিখিলেন।

তাঁহার ইচ্ছা হইয়াছিল দেশে দেশে খ্রীষ্টানধর্ম্ম প্রচার করিয়া বেড়াইবেন; এই জন্য তিনি সেই ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় পুস্তকগুলি ভাল করিয়া পড়িলেন, এবং ডাক্তারী শিখিয়া বিলাত হইতে বিদেশে যাত্রা করিলেন। যেখানে ইহার পূর্ব্বে সাহেবেরা কেহ কখনও যান নাই লিভিংষ্টোন সাহেব সেই আফ্রিকার মধ্যদেশে গেলেন। দুই চারি বৎসর নয়, ক্রমাগত ষোল বৎসর কাল আশ্চর্য্য সাহসের সঙ্গে বেড়াইলেন এবং লোকের নানারূপ উন্নতির সুবিধা তিনি সেই দেশে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ধর্ম্মের কথা বলিয়া করিয়া দিলেন। এই ষোল বৎসর কাল তিনি কি করিয়াছিলেন, তাহার বিশেষ বিবরণ যাঁহারা জানিতে চান, তাঁহারা এই মহাত্মার প্রণীত "মিশনারী ট্রাভেল্‌স্" নামক সুন্দর পুস্তক খানি পড়িয়া দেখিবেন। এইরূপে ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে লিভিংষ্টোন সাহেব একবার সিংহের হাতে পড়েন; যদিও সিংহ তাঁহাকে একটু 'চেখে' দেখিয়াছিল এবং যদিও সেই 'চাখার' জন্য তাঁহার একটা হাতের হাড় একেবারে খণ্ড খণ্ড হইয়া গিয়াছিল, তথাপি সুখের বিষয় এই যে তিনি প্রাণে মরেন নাই। কেবল ইহাই নহে, একবার তিনি মহাদেবের মত ষাঁড়ে চড়িয়া কোথায় যাইতে ছিলেন কি কারণে জানি না, ষাঁড় ভয় পাইয়া ভয়ানক ছুটিল; সাহেবের প্রাণ আর একটু হইলেই গিয়াছিল, কিন্তু একটা গাছতলা দিয়া ষাঁড় যেমন যাইতেছিল, অমনি সাহেব গাছের ডাল ধরিয়া ফেলিলেন; ষাঁড় মহাশয় সাহেবকে সেইরূপে ঝুলাইয়া রাখিয়াই দৌড়! তাঁহার সঙ্গীরা আসিয়া দেখে তিনি ঝুলিয়া আছেন!!

এইরূপ কত বিপদাপদ সহ্য করিয়াও সাহেব ধর্ম্ম প্রচারে ক্ষান্ত হন নাই,—কত নূতন স্থানে গেলেন, কত নূতন লোককে শিক্ষা দিলেন, কত নদীর উৎপত্তি স্থান বাহির করিলেন, নূতন নূতন হ্রদ বাহির করিয়া লোককে জানাইলেন। তাঁহার

স্ত্রী সঙ্গে ছিলেন—যেমন স্বামী, স্ত্রীও তেমনি। স্ত্রীটী একজন বড় ধর্ম্ম-প্রচারকের মেয়ে; পিতার কাছে শিখিয়া ধর্ম্মের জন্য কষ্ট স্বীকার করিতে বেশ জানিতেন, কাজেই স্বামীর সাহায্য করা ভিন্ন একদিনের জন্য ব্যাঘাত করেন নাই। আমাদের দেশের বালিকাদিগের এই কথা স্মরণ রাখা উচিত।

অবশেষে একবার একটী নূতন দেশে যাইতে, পথের কষ্টে তাঁহার প্রাণ গেল! আহা! ধর্ম্মের জন্য, সৎকার্য্যের জন্য প্রাণ গেল! লিভিংষ্টোন সাহেব পূর্ব্ব হইতেই জানিতেন অসভ্যদিগের দেশে বন্ধুবান্ধব ছাড়িয়া একাকী বেড়াইলে একদিন তাঁহার প্রাণ যাইতে পারে, কিন্তু তবু তিনি

ঘুরিয়া বেড়াইতে ছাড়েন নাই। কি সাহস! আমরা কবে সকলেই এইরূপ ভাল কাজ করিতে সাহসী হইব! এখন যে আমরা কোন একটা কাজকে ভাল জানিয়াও, পাছে কেউ নিন্দা করে, কি শাস্তি দেয়, এই ভয়ে সে কাজ করিতে সাহস পাইনা, কবে আমাদের এ ভাব যাইবে! যে মহাত্মার ছবি আমরা দিলাম, তাঁহার মতন হইতে আমরা কবে চেষ্টা করিব!

---

## একটী অন্ধ সীলের* কথা।

সে প্রায় চল্লিশ বছরের কথা। ক্লু উপসাগরে একটী সীলের ছানা ধরা পড়ে। সমুদ্রের ধারেই একটী ভদ্রলোক থাকিতেন, তিনি তাকে তাঁর রান্নাঘরে রাখিয়া পুষিতে লাগিলেন। সে খুব বাড়িতে লাগিল; চাকরদের সঙ্গে তাহার খুব ভাব, বাড়ীর এবং বাড়ীর লোকের প্রতি বেশ মমতা। স্বভাবটী অতি মৃদু, কারু কিছু ক্ষতি করেনা, ছেলেদের সঙ্গে খেলা করে, আর কর্ত্তার ডাক শুনলেই কাছে হাজির হয়। তার প্রভুভক্তির কথা বলিতে হইলে বুড়ো বলিতেন "যেমন কুকুরটী;" আর আমোদ তামাসার কথা বলিতে হইলে বলিতেন "যেমন বিড়াল ছানাটী।"

সীলটী রোজ মাছ ধরিতে যাইত, আর নিজের যোগাড় হইলে পর প্রায়ই কর্ত্তার জন্য দু একটী মাছ আনিত। গ্রীষ্মের সময় রৌদ্রে বসিয়া থাকিত আর শীতের সময় ঘরের আগুনের এক পাশে একটা যায়গা পাইলে বড় খুসী হইত। আর হুকুম পাইলে তুন্দুরটার† ভিতর যাইয়া বাসা লইত।

বার বছর এইরূপে সীলটীকে পোষা হইল। এরপর একবার কর্ত্তার "গোয়ালে" এক প্রকার রোগ দেখা দিল। কতকগুলি পশু মরিয়া গেল; অন্যান্য পশুদের রোগে ধরিল। অন্য লোকের গরু স্থান পরিবর্ত্তনে ভাল হয়; কিন্তু কর্ত্তার গরুর তাহা হইল না। কর্ত্তা একটী স্ত্রী-ওঝার নিকট পরামর্শ লইলেন। সে বলিল "ওগো! তুমি ওটা কি ধরে এনেছ, তাতেই তোমার গরু মরে যায়। ওটাকে তাড়িয়ে দাও নৈলে আমার ওষুদেও ধরবে না, রোগও সারবে না!" সুতরাং সীলটীকে একটী নৌকায় তুলিয়া অনেক দূরে গিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইল, সেখানে তার যা খুসী তাই করুক। নৌকা ফিরিয়া আসিল; বাড়ীর সকলে ঘুমাইল। সকালে একটী চাকরাণী আসিয়া কর্ত্তাকে খবর দিল "সীল তুন্দুরের ভিতরে শুয়ে আছে।" বাড়ীর মায়ায় বেচারা রাত্রি করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। একটী জানালা খোলা পাইয়া ঘরে ঢুকিয়া তাহার যায়গা দখল করিয়া বসিয়াছে।

পরদিন আর একটী গরুর ব্যারাম হইল। সীলটাকে আর রাখা হইল না। অনেক দূর হইতে জেলে-নৌকা মাছ লইয়া আসিয়াছিল, তাহার মাঝি ২।৩ দিনের পথ লইয়া গিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিতে স্বীকার পাইল। তাহাই করা হইল। একদিন এক রাত্রি গেল। পরদিন সন্ধ্যার সময় চাকর আগুন উস্কিয়া দিতেছিল, এমন সময় দরজার কাছে খট্ মট্ শব্দ হইল। চাকর মনে করিল কুকুরটা বুঝি; অমনি দরজা খুলিয়া দিল—আর থপ্ থপ্ করিয়া সীলটা ঘরে আসিল। অনেক পথ হাঁটিয়া ক্লান্ত হইয়া বাড়ী আসিয়াছে, তাই এক প্রকার অব্যক্ত শব্দ করিয়া মনের সন্তোষ জানাইল, তারপর হাত পা ছড়াইয়া আগুনের কাছে সুখে নিদ্রা গেল।

এই অমঙ্গলের খবর কর্ত্তার কাণে গেল। কর্ত্তা বিপদ ভাবিয়া 'জান'কে জাগাইয়া পরামর্শ চাহিলেন। জান বলিল "সীল মার্‌লে অশুভ হয়, তবে চোখ দুটো খুঁড়ে ফের সমুদ্রে ফেলে দিয়ে এস।" কর্ত্তার বুদ্ধি চড়ায় ঠেকিয়াছে, কর্ত্তা তাহাতেই রাজি। নিষ্ঠুরেরা সেই নির্দ্দোষ বেচারার চক্ষু দুটী নষ্ট করিয়া ফেলিল। পরদিন সকালে বেচারা যাতনায় ছট্ ফট্ করিতেছে এরূপ অবস্থায় তাহাকে সমুদ্রে ফেলিয়া দেওয়া হইল।

এক সপ্তাহ কাল গেল। কর্ত্তার অমঙ্গল যেন যো পাইল। গরু ক্রমাগত মরিতে লাগিল। শেষটা ওঝা আসিয়া বলিলেন "ওগো আমি আর পারিনে। তোমায় বড় ভূতে পেয়েছে; আমার আর সাধ্যি নেই।"

আটদিনের দিন ভয়ানক তুফান হইল। মাঝে মাঝে বিরামের সময় দরজার নিকট কান্নার শব্দের মত শব্দ শুনা যাইতে লাগিল। সকালে দরজা খোলা হইল। সিঁড়ির উপর সীলটী মরিয়া পড়িয়া রহিয়াছে।

---

* প্রাণীবৃত্তান্তে সীলের বাঙ্গালা মকর লেখা হইয়াছে, আমাদের বড় ভাল না লাগাতে, আমরা 'সীল'ই রাখিলাম।

† রুটী প্রস্তুত করিবার বড় উনুনকে 'তুন্দুর' বলে।



## শরদের নিশি।

১

কাননে ফুটেছে ফুল,
গগনে ফুটেছে তারা,
শরদের নিশি খানি,
হাসিতেছে মুখভরা।

২

বিমল চাঁদিমা খানি
সুনীল গগন-কোলে,
হাসিতেছে ভাসিতেছে
ডুবিছে মেঘের কোলে।

৩

ঝক্ মক্ করিতেছে
যেন রজতের থালা,
মেঘে ডুবি খেলিতেছে
কত লুকোচুরী খেলা!

৪

ধবল আলোক তার
পড়েছে গঙ্গার গায়;—
ঝিকি মিকি করিতেছে
মরিকি শোভিছে হায়!

৫

ঝপা ঝপ্ দাঁড় বেয়ে
তরণী দিয়েছে সারি,
দাঁড়ি মাঝি মন খুলে
গাইছে সুখের শারি।

৬

কাঁপিছে গাছের পাতা
মৃদুল পবন বায়,
আহা কি শীতল বায়ু
শরীর জুড়ায়ে যায়।

৭

যে দিকে ফিরাই আঁখি,
সকলি ধবল ময়,
ধবল তুষারে বিশ্ব
নিরমিত মনে হয়।

৮

সাধ হয় মনে মনে
বিষম দাসত্ব ফেলে,
আজীবন শুয়ে থাকি
এ হেন নিশির কোলে।

৯

টুপ টাপ্ পড়িতেছে
বকুলের ফুল গুলি;
প্রভাতে গাঁথিব মালা
ভাই বোন্ দোঁহে মিলি।

১০

এ হেন সুখের নিশি,
হেরিনু কৃপায় যাঁর,
আয় বোন্ করযোড়ে
প্রণমি চরণে তাঁর।

# সর্ব্বোত্তম ছাত্রী।

সাবিত্রী দেবী নাম্নী একটী ভদ্র স্ত্রীলোক কালীঘাটের নিকটে কোন এক স্থানে বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ছোট ছেলে মেয়েদিগকে পড়াইতে কত পরিশ্রম হয়, তাহা তিনি জানিতেন, কিন্তু তিনি বালকবালিকাদিগকে বড় ভাল বাসিতেন বলিয়া তাঁহার এ কাজে কিছুমাত্র ভয় হয় নাই। এক দিন রাত্রিতে তিনি কর্ম্মস্থলে গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং দেখিলেন যে স্কুলের নিকটে তাঁহার জন্য একটী ছোট বাড়ী ঠিক করা হইয়াছে। সাবিত্রী দেবী বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াই দেখিলেন, একজন স্ত্রীলোক প্রফুল্লমুখে তাঁহার জন্য খাবার প্রস্তুত করিতেছেন। তাঁহাকে দেখিয়া স্ত্রীলোকটী উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং বলিলেন,—"আসুন, নমস্কার। স্কুলের অধ্যক্ষ আপনার সুবিধার জন্য সব প্রস্তুত করিয়া রাখিতে বলেছিলেন। আমার বোধ হয়, সব ঠিক হয়েছে। আমার স্বামী কর্ম্মস্থান হইতে বাড়ীতে আসিলে, আপনার জিনিষ সব উপরে তুলিয়া দিয়া আসিবেন।"—নূতন শিক্ষয়িত্রী অল্প হাসিয়া বলিলেন, "আপনারা আমার জন্য অনেক কষ্ট স্বীকার করেছেন। এ বাড়ীটী বেশ;—তার মধ্যে এই ঘরটী সকলের চেয়ে ভাল।" প্রতিবেশিনী উত্তর করিলেন,—"এ বাড়ীটী বেশ। এইটী বসবার ঘর, ঐটী রান্নাঘর, আর উপরে দুটী শোবার ঘর আছে। সকলেরই পক্ষে বাড়ীটী সুবিধাজনক, কেবল মহামায়াদেবীর আর মন উঠ্‌লো না।"

সাবিত্রী। তিনি বুঝি আগে এই স্কুলের শিক্ষয়িত্রী ছিলেন?

"হাঁ! কিন্তু তিনি পল্লীগ্রামে থাকার উপযুক্ত ছিলেন না। তিনি ইচ্ছা কর্‌তেন মেয়েরা খুব বেশী বেশী শিখে যাক্, কিন্তু তাঁহার মনের মতন না হইলে ভয়ানক বকিতেন। আপনার চেহারা দেখে বোধ হয় আপনি ছেলে মেয়েদের সঙ্গে বেশ মিশে চল্‌তে পারবেন। তা, আমি এখন যাই, আমার স্বামীর আস্‌বার সময় হ'ল। আমাদের বাড়ী ওই দেখা যায়। যদি কোন কিছু দরকার হয়, তবে 'শোভার মা' 'শোভার মা' বলে ডাক্‌লেই আস্‌ব; আর আমার শোভনা আপনার অনেক কাজ করে দেবে।"—এই কথা বলিয়া শোভার মা চলিয়া গেলেন। তিনি চলিয়া গেলে সাবিত্রী দেবী মনের আনন্দে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া আহার করিতে বসিলেন। বিদেশে গিয়া কোথায় থাকিব, কেহ ভালবাসিবে কি না, বন্ধুবান্ধব যুটিবে কি না, আগে এই সকল ভাবনা ছিল, কিন্তু এখন তাঁহার আশা হইল শোভার মায়ের মত যত্ন যদি পাওয়া যায়, তাহা হইলে আর কিছুই কষ্ট বোধ হইবে না। সাবিত্রীদেবী এইরূপ ভাবিতেছিলেন, এমন সময় কে দরজার কড়া নাড়িল। তিনি উঠিয়া দরজা খুলিয়া দিলেন এবং দেখিলেন যে একটী ছোট মেয়ে একটী মাছ হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাঁহাকে দেখিয়া মেয়েটী বলিল, 'মা আপনাকে এই মাছ দিয়াছেন।"

শিক্ষয়িত্রী। কেন? এত কষ্ট ক'রে তোমার মা না পাঠালেও পার্‌তেন ত? তোমার নাম কি?

বালিকা উত্তর করিল "আমার নাম শোভনা।"

শিক্ষয়িত্রী। ওঃ. তুমি তাঁর মেয়ে। এস বাছা এস। তোমাদের স্কুলের যত খবর জান, আমায় বলত।

শোভনা স্কুলের বিষয় যাহা জানিত সমস্তই বলিল;—মনোরমা বসু সব চাইতে ভাল মেয়ে, সুনীতি দেবী পড়া না পারাতে রোজ কোণে দাঁড়ায়; সরলতার বড় লজ্জা, কথা বল্‌তে মুখ লাল হ'য়ে উঠে, মাটী থেকে চক্ষু তোলে না; স্কুলের অধ্যক্ষ বুড়ো মানুষ, তিনি প্রায় রোজই



স্কুলে আসেন, মেয়েদের বড় ভালবাসেন—এ সকল কথাই বলিল। অবশেষে সাবিত্রীদেবীর কাজের কিছু কিছু সাহায্য করিয়া বাড়ী যাইবার সময়, তাঁহার প্রদত্ত একখানি সুন্দর ছবির বই লইয়া গেল। শোভনা বাড়ীতে গিয়াই মাকে পুস্তক খানি দেখাইল। তাহার মা বলিলেন "বা! বা! দেখ দেখি কেমন ভালমানুষ! তোমাদের আগের শিক্ষয়িত্রী কি মেয়েদের এমন ভালবাসিতেন, না কাহাকেও এমন ছবির বই দিতেন? এবার তোমরা বড় ভাল শিক্ষিয়িত্রী পাইলে।" শোভনা কিছু বলিল না, কেবল মনে মনে ভাবিল "যাহাতে ইনি বিরক্ত না হন, এইরূপ ব্যবহার করিতে সর্ব্বদা চেষ্টা করিব।"

পরদিন সাবিত্রীদেবী স্কুলের কাজ আরম্ভ করিলেন। কে কি রকম মেয়ে তাহা চিনিয়া বাহির করিতে তাঁহার অধিক সময় লাগিল না। তিনি মনে বুঝিলেন শোভনাই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল ছাত্রী। যদিও মনোরমার বেশ বুদ্ধি, কিন্তু সে ছোট ছোট মেয়েদের সঙ্গে বড় চোখ রাঙ্গাইয়া কথা কয়! বুদ্ধি থাকিলেই ভাল হয় না—যে সৎ অথচ বুদ্ধিমতী সেই ভাল। শোভনা সর্ব্বদাই ছোট মেয়েদের প্রতি ভাল ব্যবহার করে, অথচ তাহার বেশ বুদ্ধি আছে, এই জন্য শোভনাকে নূতন শিক্ষয়িত্রীর বড়ই মনে ধরিয়াছিল।

কিছুদিন চলিয়া গেলে সাবিত্রীদেবী দেখিলেন যে, সমস্ত স্কুল একা চালান যায় না। তখন তিনি স্কুলের অধ্যক্ষকে বলিয়া স্থির করিলেন যে সর্ব্বাপেক্ষা ভাল দুটী মেয়েকে ছোট ছোট মেয়েদের পড়াইবার কতক ভার দিবেন। ছোট মেয়েদিগকে ভালবাসে এবং তাহাদের সহিত আপনার লোকের মত মিশিতে পারে, এইরূপ কোন বালিকাকে বাছিবার পরামর্শ হইল।

তখন সাবিত্রীদেবী এক সপ্তাহকাল মেয়েদের বাড়ীতে ঘুরিয়া, কে কিরূপ ব্যবহার করে, কে কি করিতে ভালবাসে তাহার খোঁজ করিলেন এবং স্কুলের ব্যবহারের সহিত তাহা মিলাইয়া দেখিলেন।

একদিন মেয়েরা অঙ্ক কষিতেছিল, এমন সময় সাবিত্রীদেবী সকলকে ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ, আমি তোমাদের একটা কথা বলি, ছোট মেয়েদের পড়াবার জন্য যে দুটী মেয়েকে পসন্দ করিবার ভার আমার উপরে ছিল, আমি তাহাদিগকে বাছিয়াছি; সে দুটী মেয়ে—শোভনা রায় ও সুকুমারী চট্টোপাধ্যায়।" এই কথা শুনিবামাত্র মনোরমা একেবারে চম্‌কিয়া গেল—"কি? আমার নাম হ'ল না?"—পাশের মেয়েটীর কাণে কাণে বলিল—"হ্যাঁ, আমার নাম হ'ল না; আমি মাকে বলে দিব।" এই কথা শুনিয়া আর একটী বালিকা চম্‌কিয়া গেল—সে শোভনা। কিন্তু তাহার চম্‌কিয়া উঠিবার অন্য কারণ। সে বলিল 'আমি তো বড় নই; আমি ভাল পার্‌ব না; অন্য বড় মেয়েরা এ বন্দোবস্ত বোধ হয় ভালবাসবেন না। শিক্ষয়িত্রী হাসিয়া বলিলেন,—"আচ্ছা কে ভাল, কে মন্দ, তাহা ঠিক করিবার ভার আমার উপর। তুমি বেশ লিখিতে পড়িতে পার, ছোট মেয়েরাও তোমাকে ভালবাসে, তুমি আমার বেশ সাহায্য করিতে পারিবে।"

"আচ্ছা আমি চেষ্টা করিব" এই বলিয়া শোভনা কতক আহ্লাদে, কতক ভয়ে বাড়ীতে গেল।

সাবিত্রীদেবী যাহা ভাবিয়াছিলেন, তাহাই হইল। শোভনা যতদিন স্কুলে ছিল, সেই সকলের অপেক্ষা ভাল ছাত্রী ছিল, এবং ভবিষ্যতেও তাহার জীবন বাল্যকালের মত হইল। সৎচরিত্র এবং সুবুদ্ধি, এই দুই গুণ থাকিলেই বালকবালিকারা ভাল হইয়া থাকে।

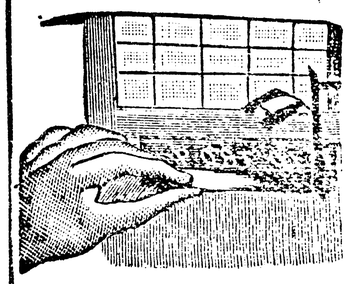

## পত্র প্রেরকদের প্রতি

শ্রীনলিনমোহন গোস্বামী, শ্রীরামপুর।—ছি! ছি! ছি! ফের ওরূপ ঠকাবার চেষ্টা করিলে অভিভাবককে জানাইব। কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের পদ্য কতটুকু এবং বালকের লেখা কতটুকু, তা কি বুঝা যায় না?

শ্রীঅ-না-ভা, কলিকাতা। নেশা হইতে বিরত করিবার জন্য যদি সভা করিয়া থাকেন, তবে তাহার বিশেষ বিবরণ আমাদিগকে পাঠান নাই কেন? এটী কি বালকদিগের না বয়ঃস্থদিগের সভা? একজন 'নস্যখোর' আপনাদের চেষ্টায় নস্য ত্যাগ করিয়াছেন, লিখিয়াছেন—ইহাতে সন্তুষ্ট হইলাম। পদ্যটী ভাল হয় নাই।

শ্রীচারুচন্দ্র বসু, কলিকাতা।—কয়েক মাস পূর্ব্বে 'সখা'তে একটী সংবাদ প্রকাশিত হয়, যে একটী ধূমপান নিবারিণী সভা শীঘ্র স্থাপিত হইতে পারে। এই কথার উল্লেখ করিয়া আমাদের পত্রপ্রেরক জানিতে চাহিয়াছেন যে এরূপ একটী হিতকরী সভা এত দিনেও কেন স্থাপিত হইল না। আমরা যতদূর শুনিয়াছি, তাহাতে আশঙ্কা হয় যে যাঁহাদের মুখ চাহিয়া আমরা এই সংবাদ সখাতে প্রকাশ করিয়াছিলাম তাঁহাদের উৎসাহ 'জল' হইয়া গিয়াছে। আমাদের পত্রপ্রেরক তাঁহার ন্যায় অন্যান্য বন্ধুদিগের সহিত মিলিত হইয়া এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করুন না? বাঙ্গালীর যাহা কিছু গুণপনা তা কি কেবল বক্তৃতাতেই থাকিয়া যাইবে নাকি? ধিক্ আমাদিগকে! আমাদিগের অনেক কাজ, সুতরাং এ কাজ অত্যন্ত ভাল হইলেও, ইহাতে প্রাণ মনের সহিত লাগিতে পারিনা। নীচে থাকিয়া পরামর্শ প্রভৃতির দ্বারা যতদূর সম্ভব সাহায্য করিতে, আমরা তখনও প্রস্তুত ছিলাম; এখনও আছি।

---

## প্রেরিত।

কি রূপে পড়িতে হয়?

[একটী ছোট বালক আমাদিগকে এই রচনাটী পাঠাইয়াছেন; আমরা অহ্লাদের সহিত রচনাটী মুদ্রিত করিলাম।—স,স।]

একদিন বৈকালে শ্রীশ বাবু তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা যোগীন্দ্রনাথকে সঙ্গে করিয়া বেড়াইতে যাইতে যাইতে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেমন, যোগীন্দ্র 'সখা' পড়িতেছ ত?" যোগীন্দ্র বলিল "হাঁ, উত্তমরূপ পড়িতেছি।" শ্রীশবাবু পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—"আচ্ছা,বল দেখি ওই যে মেঘ দেখা যাইতেছে, ওগুলি কি?" যোগীন্দ্র অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল "হাঁ, একখানা 'সখা'তে মেঘের কথা পড়িয়াছিলাম বটে, কিন্তু তাহা কি পড়িয়াছিলাম, তা' আমার কিছুই মনে নাই, কেবল ঠাকুরমার কথাটা মনে আছে—তিনি বলিয়াছিলেন 'ও হাতীগুলা শালপাতা খাইতে যাইতেছে।'"

শ্রীশ।—হ্যাঁ, তবে যে তুমি বলিলে, বেশ সখা পড়িতেছি? ছিঃ, এ বড় অন্যায়। সখায় পড়িয়াছ, কিন্তু তোমার কিছুই মনে নাই কি জন্য? তবে তুমি 'সখা' পড়িতে জান না।

যোগীন্দ্র।—কেন আমি ত বেশ পড়িতে পারি? আজ বাটী যাইয়া আপনাকে পড়িয়া শুনাইব এখন।

শ্রীশ।—সে প্রকার পড়িলে হইবে না। বলি শুন। শুদ্ধ 'সখা' কেন, সকল পড়াই এই প্রকার করিয়া পড়িবে। তাহা হইলে যাহা পড়িবে তাহা



আর ভুলিবে না।—যখন তুমি পড়িবে সে সময়ই তোমার মন যেন অন্য বিষয় না ভাবে। তুমি মুখে যাহা বলিবে তোমার মন যেন তাহা শুনিতে পায়। আর, তোমরা বালক, তোমাদের মন সর্ব্বদাই চঞ্চল; গল্প শুনিবার সময় উহা যেমন স্থির হয়, এমন আর কোন সময়েই হয় না। সেই জন্য ঠাকুরমার কথা তোমার মনে আছে। বোধ হয় তোমার এ কথাটা অনেক দিন মনে থাকিবে। সেইরূপ যখন 'সখা' কিম্বা অন্য কোন পুস্তক পড়িবে, তখন মনে করিবে যেন তোমার কাছে বসিয়া একজন গল্প করিতেছেন। তাহা হইলে দেখিবে, যাহা পড়িবে তাহা গল্প শুনার ন্যায় আর কখনও ভুলিবে না। আমি প্রতি শনিবার বাটী আসিয়া তোমাকে পরীক্ষা করিব।

যোগীন্দ্র।—আচ্ছা, দাদা। এইবার অবধি আপনার কথামত 'সখা' ও অন্যান্য পুস্তক যাহা আমাকে পড়িতে হয়, সে সমস্ত পাঠ করিব, ও যাহা পড়িব তাহা বুঝিয়া আপনার নিকট বলিব।

শ্রীশ।—আচ্ছা, বেশ! অদ্য সন্ধ্যা হইয়াছে; চল বাড়ী যাই। কিন্তু আমার কথা যেন মনে থাকে।

---

## বিশেষ বিজ্ঞাপন।

সখার বৎসর প্রায় শেষ হইয়া আসিল; কিন্তু এখনও অনেকের নিকট হইতে বার্ষিক মূল্য আদায় হইল না। আমরা বাধ্য হইয়া স্থানে স্থানে পত্রিকা পাঠান বন্ধ করিয়াছি, কিন্তু আশা করি তাঁহারা মূল্য দিয়া পুনর্ব্বার পত্রিকা গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিবেন। আমরা সঙ্কল্প করিয়াছি কোন দৈব দুর্ঘটনা না হইলে আগামী বর্ষ হইতে পত্রিকার মূল্য কলিকাতা ও মফঃস্বলে, উভয়ের জন্য ১ এক টাকা করিব। কেহ কেহ পত্রিকা খানিকে পাক্ষিক করিয়া বার্ষিক মূল্য ২ দুই টাকা স্থির করিতে পরামর্শ দিয়াছেন। আমাদের পাঠক পাঠিকাদিগের মধ্যে যদি অনেকেই এই প্রস্তাবে সম্মতি দেখাইয়া আমাদিগকে এক একখানি পোষ্টকার্ড লেখেন, তাহা হইলে আমরা আহ্লাদের সহিত আগামী বর্ষের জন্য সেইরূপ বন্দোবস্ত করিতে পারি। আর যদি মাসিক থাকাই অনেকের প্রার্থনীয় হয়, তবে আগামী বৎসরের জন্য সকলে অগ্রিম মূল্য প্রেরণ করিলে বড়ই সুবিধা হয়। পত্রিকার বিষয় নির্ব্বাচন সম্বন্ধেও আগামী বৎসর অধিক মনোযোগী হওয়া যাইবে—অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, আমাদের দেশের বড়লোকদিগের জীবনী এবং বিখ্যাত স্থান সকলের বিবরণ নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইবে।—বলা বাহুল্য, অগ্রিম মূল্য প্রেরণ না করিলে আমরা বিশেষ পরিচয় ব্যতীত কোথাও পত্রিকা দিব না।

কার্য্যাধ্যক্ষ।

---

## ধাঁধা।

গতবারের ধাঁধার উত্তর।

১। আমি বিপিনের 'মামা'।

২। বালিশ।

৩। বুড়ো বলিলেন, ১, ১২, ৯ অর্থাৎ একবার নয়। ছেলে বলিল তবে? বুড়ো বলিলেন ১+১২+৯ অর্থাৎ ২২ বার।

[স্থানাভাবে নূতন ধাঁধা দেওয়া গেল না।]

## প্রাপ্তি স্বীকার ।

(.) সংসার—নামক সাপ্তাহিক পত্র (২) মাণিকদহ ছাত্রহিতসাধিনী সভার দ্বিতীয় বার্ষিক কার্য্য বিবরণ ; (৩) মুক্তাহার—কবিতা পুস্তক ।

মাণিকদহ ছাত্রহিতসাধিনী সভার দ্বিতীয় বার্ষিক কার্য্য বিবরণ পাঠ করিয়া আমরা সুখী হইয়াছি। মাণিকদহ যেরূপ সামান্য গ্রাম সেই-রূপ অন্যান্য গ্রামে আমরা সচরাচর দলাদলি. তাস, পাশা, প্রভৃতি এবং খোলাভাঁটীর প্রসাদে মদের আমদানি যথেষ্ট দেখিতে পাই। যথার্থ কাজ করিতে কাহারই প্রবৃত্তি নাই,—বালক বা যুবকদিগের মধ্যে যদিওবা ছুই চারি জন কোমর বাঁধিয়া অগ্রসর হন, তথাপি তাঁহাদের উৎসাহ অধিক দিন থাকে না। গ্রামগুলি হইতেই যদি উন্নতির আরম্ভ হয়, তাহা হইলে শীঘ্রই যে সমস্ত দেশে সেই উন্নতির ফল দেখা যায়, তাহাতে সন্দেহ কি ? যদি উৎসাহ থাকে, যত্ন থাকে, তাহা হইলে যে অনেক কার্য্য সুসম্পন্ন করা যায়, এই মাণিকদহ গ্রাম তাহার প্রমাণ। মাণিকদহের প্রাণ-স্বরূপ জমীদার বাবু বিপীনবিহারী রায় এবং জ্বলন্ত উৎসাহে পূর্ণ ধার্ম্মিকবর বাবু শ্যামাকান্ত চট্টোপাধ্যায় এই দুই মহাত্মা, অন্যান্য বন্ধুদিগের সাহায্যে এবং প্রধানতঃ নিজেদের চেষ্টায় মাণিকদহ গ্রামটীতে যে কত কার্য্য করিয়াছেন, তাহা আমরা বলিয়া শেষ করিতে পারি না। সকল গ্রামেই যদি এইরূপ ভাল কাজের সূচনা হয়—বিশেষতঃ বালকদিগের জন্য মাণিকদহের বন্ধুদিগের যেরূপ যত্ন, যদি সকল গ্রামেই সেইরূপ যত্ন দেখা যায়, তাহা হইলে বড়ই সুখের বিষয় হয়।

শেষের লিখিত কবিতাপুস্তকখানি দেখিয়া আমরা সুখী হইয়াছি। স্থানে স্থানে যাহা পড়িয়াছি তাহা বেশ মিষ্ট লাগিয়াছে। আমাদের দেশে সদুপদেশপূর্ণ কবিতাপুস্তকের বড়ই অভাব। আর আমাদের এমনি কপাল যে, কলম ধরিয়া কবিতা লিখিতে বসিলেই লোকে এমন কবিতা লিখিয়া বসে, যাহা পিতা পুত্রে, ভ্রাতা ভগিনীতে, মায়ে ঝিয়ে এক সঙ্গে বসিয়া পড়িবার যো নাই। আমাদের গৌরবের বিষয় এই মুক্তাহার এই শ্রেণীর পুস্তকের সীমা ছাড়া। ইহাতে কুরুচির ছায়া মাত্র নাই—বরং পড়িলে উপকারেরই সম্ভাবনা। মধ্যে মধ্যে এরূপ কবিতাও আছে যাহা বালক বালিকাদিগের কণ্ঠস্থ দেখিতে ইচ্ছা করি। পুস্তকখানির মূল্য ।০ চারি আনা মাত্র, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কার্য্যালয়ে পাওয়া যায়।

---

## সখা-সংক্রান্ত নিয়মাবলী ।

১। সখার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য এক টাকা মাত্র। মফস্বলে ডাকমাশুলসহ ১।০ এক টাকা চারি আনা। প্রতি খণ্ডের নগদ মূল্য /১০ মাত্র। পোষ্টাল নোট, মণিঅর্ডার বা অর্দ্ধ আনার ডাক টিকিটে, "সখা কার্য্যাধ্যক্ষ" এই নামে সখার মূল্যাদি পাঠাইতে হইবে। ডাকটিকিটে মূল্য পাঠাইলে প্রত্যেক টাকায় কমিশন বলিয়া /০ এক আনা অধিক পাঠাইতে হইবে।

২। পত্রিকাস্থ চিত্রের সংখ্যা কিছুই নির্দ্দিষ্ট থাকিবে না, তবে প্রত্যেক সংখ্যায় যাহাতে অন্ততঃ এক খানি চিত্র থাকে আমরা সেদিকে দৃষ্টি রাখিব।

৩। বালকবালিকাদিগের রচনা উৎকৃষ্ট হইলে তাহা সাদরে গৃহীত হইবে; তবে সুদীর্ঘ হইলে প্রকাশিত হইবে না।

৪। শিক্ষক এবং অভিভাবকদিগের পরামর্শ প্রভৃতি সাদরে গৃহীত হইবে।

৫। বালক বালিকাদিগের উপকারে আসিতে পারে, কেহ এরূপ কোন রচনা বা কোন সংবাদ কিম্বা সত্য ঘটনার বিশেষ বিবরণ আমাদিগের নিকট পাঠাইলে আমরা তাহা সাদরে প্রকাশ করিব।

৬। সখা-সংক্রান্ত সমস্ত পত্রাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইতে হইবে। কেবল রচনা, পরামর্শ প্রভৃতি সম্পাদকের নামে কার্য্যালয়ের ঠিকানায় পাঠান আবশ্যক।

৭। ঠিকানার পরিবর্ত্তন, নামের গোল বা কার্য্যসম্বন্ধীয় অন্য কোন অসুবিধা হইলে মোড়কের উপরে যে নম্বর দেওয়া থাকিবে সেই নম্বরের উল্লেখ করিয়া পত্র লিখিতে হইবে।

"সখা" কার্য্যালয়,
৫০ নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট।
কলিকাতা।
} কার্য্যাধ্যক্ষ।






প্রথম ভাগ। ডিসেম্বার, ১৮৮৩। ১২শ সংখ্যা।

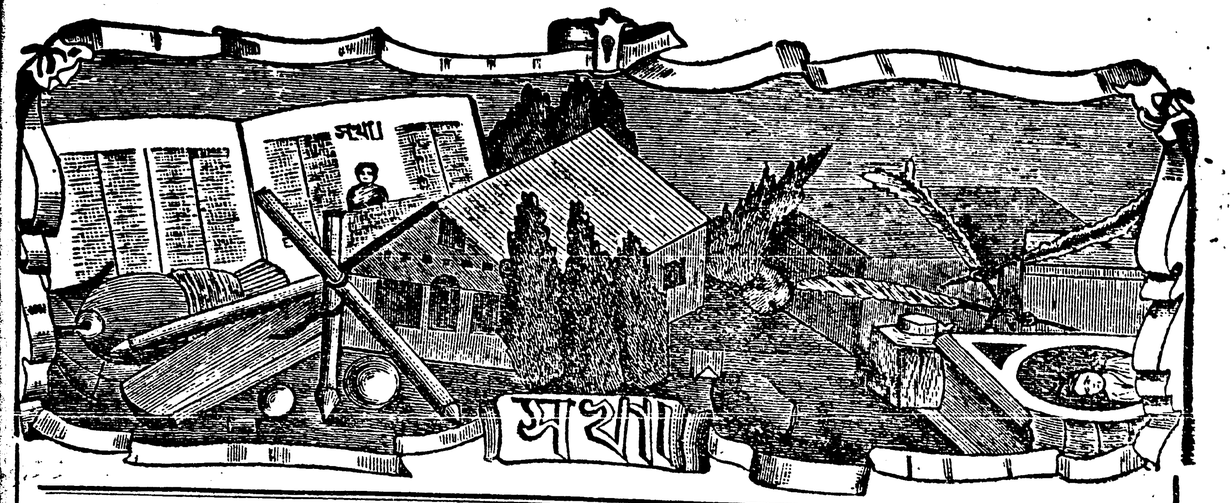

## খেলা ।

সেদিন সন্ধ্যার পর আমার একটী বালক বন্ধু আমাকে মহা আহ্লাদের সহিত বলিলেন—"—বাবু! আমরা আজ 'ব্যাটবল' খেলায় সাহেবদিগকে হারাইয়া দিয়াছি।" আমি শুনিয়া বলিলাম "বেশ!" তাহার পর ভাবিতে লাগিলাম, সাহেবদিগকে হারাইয়া এত আনন্দ কেন ? সকল দেশের ছেলেরাই খেলা করে, তবে সাহেবের ছেলেরাইবা এত উচু যায়গায় কেন, আর আমাদের ছেলেরাইবা এত নীচুতে কেন ? তাহার উত্তর এই যে, আমাদের দেশের কর্ত্তারা ছেলেদের শারীরিক পরিশ্রম 'দুচোখে' দেখিতে পারেন না। তাঁহারা চান, ছেলেরা নড়িবে না, উঠিবে না, ছুটিবে না, কেবল এক মনে পুস্তকের দিকে তাকাইয়া থাকিবে, আর পরীক্ষা দিবে। শরীরকে ভাল রাখা যে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, শরীর ভাল রাখিলে যে মন ভাল থাকে, এ কথা অনেক অভিভাবকই বুঝেন না। অপর দিকে, সাহেবদিগের মনের বিশ্বাস আর একরূপ। তাঁহারা ছেলেদিগকে লেখা পড়া শিখাইতে যেমন যত্নবান, খেলার দ্বারা শরীরের বল বৃদ্ধি করাইতেও সেইরূপ মনোযোগী। সাহেবের ছেলেরা সমস্ত বছর কোন না কোনরূপ 'জোরাল' খেলা খেলিয়া থাকে। ঘোড়ায় চড়া, দৌড়াদৌড়ি, ব্যাটবল, দাণ্ডাগুলি, ইহার একটা না একটাতে সাহেবের ছেলেরা সমস্ত বছরই লাগিয়া আছে। এইরূপ খেলা করিতে করিতে সাহেব বালকেরা কালে খুব মজপুত হইয়া উঠে; তখন তাহাদের সঙ্গে ঐ সকল খেলাতে সমান হওয়া কাহারও পক্ষে সহজ হয় না। এই জন্যই আমার সেই বালকবন্ধু, গড়ের মাঠে সাহেবদিগকে হারাইয়া দিয়া, আহ্লাদে 'আটখানা' হইয়াছিলেন।

আমাদের দেশে নানারূপ খেলা আছে কিন্তু এমন খেলা অধিক নাই, যাহাতে শরীরের চালনা, মনের স্ফূর্ত্তি এবং বুদ্ধির কৌশল এক সঙ্গে থাকে। 'কপাটী' বা 'ডুডু' খেলাতে শরীরের বেশ চালনা হয় বটে, বুদ্ধিও খাটাইতে হয় বটে, কিন্তু ইংরেজী 'ব্যাটবল' খেলা যত নির্দ্দোষ এবং তাহাতে মনের যত স্ফূর্ত্তি জন্মায়,ইহা তত নির্দ্দোষ নহে এবং ইহাতে তত স্ফূর্ত্তি জন্মায় না—আমাদের বালকপাঠকমাত্রই একথা জানেন। ইংরেজী খেলা আমাদের দেশে যত বাড়ে ততই আমাদের মঙ্গল, কারণ আমাদের দেশে শরীরে চালনা হয়, এরূপ কুস্তি, মুগুর ব্যায়াম অনেক আছে বটে, কিন্তু যেখানে দুইদল বাঁধিয়া খেলা হয়, সেখানে পরস্পরের সহিত 'আড়ি'তে যত উৎসাহ হয়, আপনার মনে একলা একলা খেলিলে কখনই সেইরূপ হইতে পারে না; ইংরাজদিগের অনেক 'জোরাল' খেলাই এইরূপ দুদলে হয় বলিয়া

তাহা বড়ই উপকারী। আমাদের দেশে যে এরূপ নাই তাহা বলিতেছি না, তবে এইরূপ খেলা যত বাড়ে ততই মঙ্গল, ইহাই বলিতে চাই। আমাদিগের দেশের কোন কোন স্থানে এইরূপ দুইদলে মিশিয়া খেলিবার রীতি দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু সকল স্থানে তাহা নাই, এই জন্য তাহার দু একটী আমরা প্রকাশ করিতেছি। ব্যাটবল, কপাটী প্রভৃতি সকলেই মোটামুটিগোছ জানেন সুতরাং তাহার কোন উল্লেখ করিলাম না ঃ—

'চী'কুৎকুৎ।*—এই খেলাতে বালকের সংখ্যার ঠিক নাই, ৮ হইতে ১৬ জন পর্য্যন্ত এক সঙ্গে খেলিতে পারে। যতগুলি বালক যুটিবে, তাহাদিগকে সমান দুইভাগ কতিে হইবে। কোন্ দল আগে খেলিবে তাহা প্রথম স্থির করিয়া লইবে। তাহার পর, যাহারা খেলিবে তাহাদের মধ্যে একজন খুব চতুর রকমের বালককে নির্দ্দিষ্ট স্থানে বসাইবে। এই বালকের নাম 'কুৎ'। 'কুৎ'কে উঠাইয়া তথা হইতে খানিকটা দূরে যে 'চড়াই' পূর্ব্বে ঠিক করা থাকিবে, (২০ হইতে ৩০ হাত দূরে হইলে চলিতে পারে) সেখানে আনিতে হইবে। খেলিবার দল আনিতে চেষ্টা করিবে, খাটিবার দল বাধা দিবে, 'কুৎ' সুযোগ দেখিবে—এ খেলার সার মর্ম্ম এই। কিরূপে খেলিবার দলের লোক চেষ্টা করিবে, তাহা বলিতেছি।—খেলিবার দলের একজন 'চড়াই' হইতে বা 'কুৎ'কে ছুঁইয়া ‡ 'চী' এই শব্দ করিতে করিতে এক নিশ্বাসে খাটিবার দলের এক জন বা সম্ভব হইলে অধিক লোককে তাড়া করিয়া যাইবে; যতক্ষণ তাহার নিশ্বাস আছে, ততক্ষণ সে যাহাকে ছুঁইবে সে মরিবে, কিন্তু নিশ্বাস লইয়া যদি সে চড়াইয়ে ফিরিয়া আসিতে না পারে এবং নিশ্বাস ছাড়িয়া দিলে যদি পথে তাহাকে খাটিবার লোক কেহ ছুঁইয়া ফেলে,তাহা হইলে সেও মরিল। এদিকে খাটিবার লোকেরা সতর্ক আছে,—যখন দেখিল খেলিবার লোক তাহাদের এক জনকে তাড়া করিয়া গেল অমনি একজন বা অনেকে কুতের মাথা ছুঁইয়া গেল, কারণ খেলিবার লোক 'চী' ধরিয়া গেলেই যদি খাটিবার লোক কুতের মাথা না ছোঁয়, তাহা হইলে 'কুৎ' সুযোগ পাইলেই উঠিয়া যাইতে পারে, কিন্তু খাটিবার লোকেরা একবার মাথা ছুঁইয়া গেলে, দ্বিতীয় খেলিবার লোক 'চী' না ধরা পর্য্যন্ত 'কুৎ'কে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে হইবে। বুদ্ধিমান 'কুৎ' সর্ব্বদা সুযোগ খোঁজে, যাই দেখিল তাহাদের দলের একজন, খাটিবার লোকদিগকে তাড়া করিয়া গিয়াছে, আর কেহ তাহার মাথা ছুঁইয়া যাইতেছে না, অথচ সকলে ব্যতিব্যস্ত, অমনি সে উঠিয়া পলাইয়া চড়াইয়েতে গেল—পথে খাটিবার লোককেহ ছুঁইয়া দিলে 'কুৎ' মরিল, এবং অন্যপক্ষের খেলিবার পালা হইল; নতুবা নিরাপদে পৌঁছিলে খাটিবার লোকদিগের উপরে এক 'বাজি' জিৎ হইল।

খেলিবার লোকের প্রতি উপদেশ।—যখন 'চী' বলিয়া কুতের মাথা ছুঁইয়া খাটিবার লোককে তাড়া করিয়া যাইবে, তখন যত দৌড়িতে পার তাহা ত যাইবেই; সঙ্গে এমন আন্দাজে নিশ্বাস ফেলিবে যাহাতে একজনকে মারিয়াও চড়াইয়েতে ফিরিয়া আসিতে পার; নতুবা যেখানে নিশ্বাস পড়িবে, প্রাণের আশা ছাড়িয়া সেখান হইতেই 'গাও হে' বলিয়া চীৎকার স্বরে সঙ্গীদিগকে খবর দিবে। ইহাতে এই ফল হইবে যে তোমাদের দলের আর এক জন 'চী' ধরিবে, কাজেই তুমি এতক্ষণ যাহাকে তাড়া করিতে ছিলে, সে তোমাকে মারিবার সুযোগ ছাড়িয়া দিয়াও 'কুৎ'কে রক্ষা করিতে সেই দিকে দৌড়িতে পারে—তাহা যদি না যায়, তা না হয় মরিলে, ভয় কি? খাটিবার লোক সকলকে মারিলে, শেষকালে এক জন আসিয়া 'চী' ধরিয়া এক নিশ্বাসে 'কুৎ'কে অনায়াসে তুলিয়া লইয়া চড়াইয়েতে যাইতে পারে।

কুতের প্রতি উপদেশ।—তুমি স্থির হইয়া বসিয়া থাকিবে, যতক্ষণ পলাইবার পথ খুব ভালরূপ বুঝিতে না পারিবে, ততক্ষণ মোটেই নড়িবে না, কারণ একবার একটু উঠিবার উদ্যোগ করিলেই তুমি মরিলে, এবং তুমি মরিলে তোমার দলের খেলা গেল। যদি কুকুরের মত দুবার উল্টা পাক দিয়া খাটিবার লোকদিগের হাত ছাড়াইতে পার, ভালই; নতুবা চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবে। একটী বিষয় যেন মনে থাকে, তোমার দলের লোক তোমার মাথা ছুঁইয়া গেলে, তখনি অর্থাৎ খাটিবার দলের লোক আসিয়া তোমার মাথা ছুঁইবার আগেই, তোমাকে প্রস্থান করিতে হইবে; অপর পক্ষের কেহ মাথা ছুঁইয়া গেলে, আর সে 'চী'তে উঠিবার যো নাই।

খাটিবার লোকের প্রতি উপদেশ।—খেলিবার লোক 'চী' ধরিয়া চলিয়া গেলেই কুতের মাথা ছুঁইবে। যাহাকে তাড়া করিয়া যাইবে, সে যখন দেখিবে, 'চী'র নিশ্বাস শেষ হইয়া আসিতেছে, তখন বেশী তাড়াতাড়ি না পলাইয়া, নিজে মারা না যাই, অথচ 'চী'এর নিশ্বাস পড়িলেই তাহাকে দৌড়িয়া ছুঁইতে পারি, এই ভাবে ছুটিতে হইবে। যাহারা 'কুৎ' এবং চড়ায়ের মাঝখানে থাকিবে, তাহাদের বিশেষ সাবধান হওয়া আবশ্যক।

এই খেলাতে দুদলের লোকই মরিতে পারে, কিন্তু অন্যান্য বাঙ্গালা খেলায় যেমন হয়, এখানে সেরূপ একের পরিবর্ত্তে আর একজন বাঁচিবে না। 'চড়াই' বলিয়া যে দাগটী কাটিবে, কুৎকে বা খেলিবার লোকদিগকে যে সেই লাইনের উপরে আসিতে হইবে তাহা নহে, তাহার সোজা সোজি যেখানে হউক, এক যায়গায় আসিলেই চলিতে পারে। যদি একদল ক্রমাগত বাজি শোধ করিতে না পারিয়া, ৭ বার হারিয়া যায়, তাহা হইলে বুঝা গেল দুই ভাগ সমান হয় নাই; তখন আবার ভাগ করিয়া লইবে।

এবার স্থানাভাবে আর কোন খেলার কথা দেওয়া গেল না।

*কোন কোন স্থানে এ খেলাকে 'বউ-বসান' বা 'বউ-তোলা' খেলা বলিয়া থাকে, কিন্তু আমরা এ নামটি পসন্দ করি না।

‡কুৎকে ছুঁইয়া নিশ্বাস লইলেই ভাল হয়।



## নিয়ম এবং অনিয়ম; বাধ্যতা এবং অবাধ্যতা।*

গ্রীষ্মকাল; সকাল বেলা একদিন বড় সুন্দর দেখ্‌তে হ'য়েছে। একটী কর্ম্মকার মৌমাছি মধু আন্‌বার জন্য বাহির হ'ল। এমন সুন্দর রোদ্! বেশ গরম বাতাস! সে উড়ে উড়ে অনেক দূরে গেল। শেষে একটী সুন্দর বাগানে এসে প'ড়্‌ল এবং সেইখানে ঘুরে ঘুরে উড়ে বেড়াতে লাগ্‌ল। আনন্দে চোঁ বোঁ শব্দ করে করে এত মধু জমাইয়া ফেলিল যে আর বেশী নিয়ে যেতে পারে না। বেলাও শেষ হয়ে এসেছে, তখন বাড়ী ফিরে আসবার কথা মনে হ'ল। তাহার আসবার পথে এক বড়লোকের বাড়ীতে জানালা খোলা ছিল, সে মনে করিল ঐ বুঝি পথ, সুতরাং তার মধ্য দিয়ে ঘরের ভিতর গেল। সেখানে ভারি খাবার ভিড়—ডাকাডাকি, হাকাহাকি, মহা গোলমাল, নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা কথা বল্‌তে কিছু বেশী চীৎকার করে ফেল্‌ছেন; দেখে শুনে বেচারা মৌমাছির মনে বড় ভয় হল—'এ কোথায় এসে প'ড়লাম রে বাবু!"—কিন্তু তা'হলে কি হয়, বাবুরা যে লাল টুক্‌টুকে রসগোল্লা পাতে নিয়েছেন, তার একটু খানি একবার চেটে না দেখ্‌লে কি চলে? মৌমাছি সেইদিকে গেল। এর মধ্যে একটা ছেলে চীৎকার করে বলিল—"ওরে! মৌমাছিটে, ধর!

*Parables from Nature নামক পুস্তকের একটি গল্প অবলম্বনে লিখিত।

ধর!"—মাছি ভাবিল, "বাবা গো! এই বেলা পালাই"।—এই ভাবিয়া বোঁ ক'রে ছুটে বাহিরের দিকে গেল, কিন্তু তাড়াতাড়িতে বস্তুজ্ঞানটা তত ছিল না; তাই বাহিরে যেতে গিয়ে জানালার সাসীতে মুখের ঘেষ্টা লাগিয়া গেল। বড় বেদনা লাগাতে, বিশেষতঃ বাহিরে যাবার আর পথ না থাকাতে, বেচারা মৌমাছি সেই সাসীর গায়ে আস্তে আস্তে হা'ট্‌তে লা'গল, ভাবিল বিশ্রাম করে গায়ে একটু বল হলেই চলে যাব।

হঠাৎ একটু একটু কাণাকাণির শব্দ তাহার কাণে গেল। চেয়ে দেখলে যে দুটী ছেলে হাঁটু গেড়ে বসে তারি দিকে চেয়ে আছে।

একটী আর একটীকে বলিল "দেখ বোন্! এটা একটা কর্ম্মকার মৌমাছি। ওর উরুতে ঐ দুটো থলে! ওতে ফুলের গুঁড়ো রাখে। ভোফা লোক! ওই কাজের লোক! কেমন সারাদিন খাট্‌ছে।"

মেয়েটী বলিল "ফুলের গুঁড়ো আর মধু কি ও নিজেই এনেছে?"

"হাঁ; ফুলের ভিতর থেকে ঐ গুলো আনে। সে দিন মৌমাছিটাকে কেমন দেখেছিলাম; হল্‌দে ফুলগুলির ভিতরে বাহিরে কেমন ব্যস্ত হয়ে বেড়াচ্ছিল। আমাদের কেমন হাসি পেয়েছিল। ক্রমাগত খাট্‌ছে,—আর কতই ব্যস্ত। হল্‌দে ফুলের গায় কালো মৌমাছিগুলি কেমন সুন্দর দেখিয়েছিল। একে আজ বোঝাই হতে দেখলে হত। কিন্তু এ আরো অনেক কাজ করে। মৌচাক তোয়ের করে; আর এ ছাড়া প্রায় অন্যান্য সকল কাজই করে। ও কর্ম্মকার মৌমাছি! গরিব বেচারা!"

"কর্ম্মকার মৌমাছিটে কি দাদা? আর ওকে 'গরিব বেচারা' কেন বল্‌লে?"

'বা! তাও কি জান না? সে দিন পুলিন কাকা বলেছেন যে সব লোক অন্যের জন্য খাটে, নিজের কাজ কর্ত্তে জানে না, তারা সবগুলো হতভাগা। আর এ ও যে ঠিক্ তাই করে। চাকে রাণী মৌমাছি আছেন, তার আর কোন কাজ নেই কেবল খাবেন আর বসে থাকবেন; হুকুম জারি করবেন, আর ডিমছানা গুলোকে দেখবেন; আর সকলে তাঁর কাছে এসে যোড় হাত করে থাকবে আর তাঁর আজ্ঞা পালন করবে। তার পর জামাই মৌমাছিরা আছেন—বাবুদের আর গড়াগড়ি করেই সময় হয় না। তার পর কর্ম্মকার মৌমাছিরা, যেমন এই একজন, তারা বেচারারা আর সকলের সব কাজ করে দেয়! পুলিন কাকা জান্‌লে কেমন হাস্‌তেন।"

"পুলিন কাকা মৌমাছির কথা জানেন না বুঝি।"

"না বুঝি। মালী আমাদের বলেছিল আর রাণী মৌমাছি না হলে এদের কাজ চলে না একথা একবার জানলে কি আর মৌমাছির গল্প বলে বলে পুলিন কাকার কথা ফুরুত? কাল শুন্‌লাম পুলিন কাকা বলছেন—রাজা রাণী ও সব স্বভাবের বিরুদ্ধ। স্বভাবতঃ তো আর কেউ রাজা কি মুচি হয়ে আসেননি, সকলেই একরকম; তাই উনি বলেন রাজা রাণী ও সব বড় অন্যায়।"

মেয়েটী চুপি চুপি বলিল "মৌমাছিদের তো আর অত বুদ্ধি নেই যে তারা ও সব জানবে।"

"তাতো নয়ই! তবে বেচারারা খেটে খেটে মারা যাচ্ছে; মালী আমাকে যা বললে সে সব যদি ওরা একবার শুনতো তা হলে ওদের কেমন রাগ হত!"

"মালী কি বল্‌লে?"

"এই যে, সে, বল্‌লে কি না যখন জন্মায় তখন কর্ম্মকার ও যা রাণী ও তা; ঠিক এক রকম; তারপর ওদের খাবার আর থাকবার যায়গা এতেই দুটীকে দুরকম করে তোলে। ধাই মৌমাছিরা ঐ কাজটা করে। একজনকে একরকম আর একজনকে অন্য রকম খেতে দিলে; দুজনের ঘর দুরকম করে দিলে, আর অমনি একজন রাণী হয়ে উঠ্‌লেন, অন্য গুলি খেটে মরুক গে। পুলিন কাকাও রাজা রাণীর কথা ঠিক্ ঐ রূপ বলেন—স্বভাব সকলকেই একরকম করে। ঐ যা! খাওয়া হয়ে গেল; চল যাই।"

"একটু দাঁড়াও দাদা; মৌমাছিটাকে বাইরে দিয়ে আসি।" এই বলিয়া সেই ছোট মেয়েটী তাহাকে আস্তে আস্তে একখানা রুমালে করিয়া লইল। তারপর একটু দয়ার ভাবে তাহার দিকে চাহিয়া বলিল "গরিব বেচারা! তারা যদি তোমাকে ভাল খাবার দিয়ে ভাল ঘরে থাক্‌তে দিত, তাহলে তুমিও রাণী হতে পার্ত্তে। আহা কেন তারা দিলে না! তা যে রকম হয়েছে বাপু! যে রকম দেখ্‌ছি, তাতে তোমার খাটুনীতেই জীবনটা যাবে। মধু আনবে আর মোম তয়ের করবে। তা এখন যাও। খেটে খেটে সুখে থাকগে!" এই কথা বলিয়া সে খোলা জানলার ভিতর দিয়া রুমাল ঝাড়িল। মৌমাছিটী পুনরায় বাতাসে ভাসিয়া চলিল।

কেমন সুন্দর সন্ধ্যাকাল! কিন্তু ঐ মৌমাছিটীর সেরূপ বোধ হইল না। সূর্য্য দেখিতে কেমন সুন্দর হইয়াছে! ফুলের গন্ধে চারিদিক আমোদিত হইয়াছে। কিন্তু সেই মৌমাছি বেচারার মনে হইতে লাগিল যেন আকাশ কাল মেঘে ঢাকা। বাস্তবিক কাল মেঘ তাহার নিজের অন্তরেই ছিল! তাহার মনে অসন্তোষ এবং দুরাশার সঞ্চার হইয়াছে। সে এখন বিদ্রোহী, জন্মাবধি যাহারা তাহার মতে তাহার উপর প্রভুত্ব করিয়া আসিতেছে তাহাদিগের উপর আজি তাহার রাগ হইয়াছে।

অবশেষে বাড়ী আসিল।—প্রাতঃকালে কেমন মনের সুখে সে বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছিল! কিন্তু মুখভার করিয়া সে বাড়ীতে ফিরিল এবং রাগের সহিত তাড়াতাড়ি হুড় মুড় করিয়া ভিতরে ঢুকিয়া, থলে ঝাড়িতে লাগিল। থলে ঝাড়িতে ঝাড়িতে বলিল "আমার মত দুঃখী আর কেউ নাই।"



একজন বৃদ্ধ আত্মীয় নিকটে কাজ করিতে ছিল,—সে জিজ্ঞাসা করিল "কেন কি হয়েছে? কি করেছ তুমি? কোন বিষাক্ত ফুলের রস খেয়েছ? না মধুখোর প্রজাপতি আমাদের চাকের কোথাও ডিম পেড়েছে, তাই দেখেছ?"

"ওগো, তা নয়, তা নয়, অনেক দূর বেড়িয়েছি, আর নিজের কথা বিস্তর শুনেছি, আগে তার কিছুই জা'ন্‌তাম না। এখন বুঝি আমরা কত দুঃখী!"

বুড়ো জিজ্ঞাসা করিল "ওরূপ উল্টো বুদ্ধি কোন্ পণ্ডিত তোমার পেটে ঢুকিয়ে দিলে?"

মৌমাছির রাগ হইয়াছে—"খাঁটি কথা! তা যেই বলুক না কেন, তাতে কি?"

"তাতো নয়ই। তা যে সে একটা বোকা জন্তু এসে বল্লে 'তুমি বড় দুঃখী', তাতেই তুমি মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লে, এ তো বেশ কথা? ঐরূপ কথা শোনবার আগে তো তোমার কোন কষ্ট ছিল না! ও নেহাত কাঁচা কথা; তা আমি আর তোমায় বেশী কিছু বল্‌ছিনে।" এই বলিয়া বৃদ্ধ আত্মীয় আপন কাজে গেলেন এবং সুখে গান করিতে লাগিলেন।

কিন্তু বুড়ো হাসিলেন বলিয়া পথিক মৌমাছির দুঃখ যাবার নয়। সে তাহার যুবা সঙ্গীদিগকে ডাকিয়া আনিল। বড় লোকের খাবার ঘরে যাহা কিছু শুনিয়া আসিয়াছে সমস্ত তাহাদিগকে বলিল। শুনিয়া সকলে অবাক্; অনেকে কথাগুলিতে বড়ই উদ্বিগ্ন হইল। তাহার কথায় ওরূপ একটা আন্দোলন উপস্থিত করিতে পারিয়াছে দেখিয়া সে মনে মনে কত খুসি হইল; তখন বুদ্ধি ক্রমেই ঠিক হইয়া আসিতে লাগিল। তার পর দীর্ঘ বক্তৃতা।—রাজারাণী ও সব থাকা বড় অন্যায়—যখন হয়, তখন সকলেই তো এক রকম?—কথা সকল এত উৎসাহের সহিত বলিতে

লাগিল যে পুলিন কাকা শুনিলে চারি হাতে পায়ে হাত তালি দিতেন।

মৌমাছি থামিলে কতক্ষণ সকলেই চুপ করিয়া থাকিল। তার পর শোঁ শোঁ করিয়া কেহ কেহ রাগ প্রকাশ করিতে লাগিল; কেহ কেহ চোঁ বোঁ করিয়া কার্য্য-প্রণালী স্থির করিতে বসিল। কিন্তু উৎপাতটা নিতান্ত নূতন; কেমন করিয়া কি করিতে হইবে তার সম্বন্ধে মতটা কাহার ও তত পরিষ্কার বোধ হইল না। কেহ কেহ বলিল "পুলিন কাকা যদি দেশের সব মৌচাকের কর্ত্তা হতেন, তা হলে তিনি সকলকেই রাণী করে দিতেন,—বাঃ তবে কি মজাই হত!" বুড়ো তখন এক কোণ হইতে উকি মারিয়া বলিল "কাজ করে দেবার লোক না থাকলে রাণী হয়ে কি মজা পেলে বাপু?" দল শুদ্ধ মৌমাছি-গুলি বুড়োর কথায় শোঁ শোঁ করিয়া উঠিল। বুড়োকে বোকা বলিয়া গালি দিতে লাগিল। বলিল, "কেন, পুলিন কাকা কি এও দেখবেন না যে যাঁরা এতদিন রাজা রাণী রাজপুত্তুর হয়ে বসে বসে মোটা হচ্ছেন তাঁরাই যত দিন বেঁচে থাকেন, অন্য সকলের কাজ করে দেবেন!"

বুড়ো হাসিয়া বলিল "তারা মরে গেলে পর?"

"শোঁ—শোঁ—শোঁ—শোঁ"।—বুড়ো চুপ মারিল।

তার পর আর এক মৌমাছি উঠিয়া বলিলেন "সকলেই রাণী হবে এটা কেমন কেমন দেখায়। তাহলে মধু আন্‌বে কে? চাক তোয়ের ক'রবে কে? বাড়ী বাঁধবে কে? ছেলে রাখবে কে!? এর চাইতে রাণী টানী কিছু না থেকে সকলেই যদি খেটে খাই তাহলে কি ভাল হয় না?"

আবার ঐ নাছোড় বুড়ো কোণ হইতে উকি মারিয়া বলিল "তাতেই বা লাভটা কি হল? এখনও তো খেটেই খাচ্ছো!" বুড়োর কাণে কতকগুলি রাগ-সূচক শোঁ শোঁ শব্দ আসিল। বুড়ো আবার আপন কাজে গেল।

অবশেষে রাত্রি আসিল। ভালই হইল। দিবসের পরিশ্রম শেষ হইয়াছে—চাকের সকলে এখন নিঃশব্দে নিদ্রা গেল। কিন্তু যেই প্রাতঃকাল ফিরিয়া আসিল অমনি সেই হতভাগা আন্দোলন। পথিক মৌমাছি এবং তাহার সঙ্গীরা মাঝে মাঝে ছোট ছোট দলে একত্রিত হইয়া তাহাদের দুঃখের প্রতীকার চিন্তা করিতে লাগিল। অন্যান্য মৌমাছিরা নিজের কাজে এত নিবিষ্ট ছিল যে তাহাদের কেহ দেখিল না। কিন্তু কতকগুলি মাথাগরম যুবক ভিন্ন ভিন্ন মত লইয়া এরূপ ঝড় তুলিলেন যে আর কাহারও বুদ্ধি ঠিক্ থাকিল না। ঝগড়া বিবাদের উপক্রম হইয়া উঠিতেছিল, এমন সময় আমাদের পথিক সেখানে উড়িয়া গেল এবং তাহাদিগকে বলিল যে সকলেই যখন বড় হইয়া উঠিয়াছে তাহাদিগের আর রাণী হওয়ার আশা বৃথা; তবে রাজা রাণী ছাড়িয়া দিয়া সমস্ত কর্ম্মকার মিলিয়া একটা সাধারণ তন্ত্রই করা যাউক না কেন? কথাটা চমৎকার বোধ হইল; সুতরাং সকলে বিনা আপত্তিতে চাক ছাড়িল। তাহারা খোলা বাতাসে আসিয়া বাগানে সকাল বেলায় বায়ু সেবন করিতে চলিল; দলটিকে দেখিতে তখন বেশ দেখা গেল। কিন্তু মৌমাছির দলে রাণী নাই পথ দেখাবে কে? সুতরাং তাহাদের দল বাঁধাই সার হইল। তার পর সকলে মন্ত্রণার জন্য আবার একত্র হইল; তখন কথা হইল 'কেমন যায়গায় বাড়ী বাঁধিতে হইবে।'

একজন বলিল "বাগানে আর কি।" আর একজন বলিল "না, মাঠে"। তৃতীয় ব্যক্তি উঠিয়া বলিল "ভাল একটা চালা ঘরের তলায়।" অন্যতম প্রস্তাব করিলেন "একটী গাছের গর্ত্ত হলে আর কিছু চাইনে।" পঞ্চম কর্ত্তার মত হইল "গাছের ডালে বেশ স্বাধীন ভাবে থাকা যায়।" সকলেরই ইচ্ছা তাঁহার নিজের মত বাহাল থাকুক। সুতরাং তাহাদের মীমাংসার সম্ভাবনা খুবই দেখা গেল!

শেষে পথিক উঠিয়া বলিলেন "তোমাদের



কারখানা দেখে বড় রাগ হয়। অর্দ্ধেকটা প্রাতঃকাল চলে গেল, এখনো যে গোলমাল নিয়ে বেরিয়েছিলাম তাতেই আছি!"

কলহকারিরা বলিল, "যে রকব বল্‌ছো, তাতে দেখছি তুমিই রাণী হয়ে উঠ্‌লে! আমাদের ইচ্ছে হয়েছে আমরা সারাদিন বসে কামড়াকামড়ি করবো, তোমার কি তাতে? তোমার কাজ তুমি করগে যাও।"

সে তাহাই করিল; সে এখন বড় লজ্জিত এবং ক্ষুব্ধ হইয়াছে। মনের কষ্ট দূর করিবার জন্য সে বাগানের ও পাশে গেল। সেখানে দেখিল অতি সুন্দর ফুলগুলি ফুটিয়া রহিয়াছে। তৎক্ষণাৎ সে ফুলের মধ্যে গিয়া বসিল,—যদি মধু সঞ্চয় করিয়া মনটা একটু শান্ত হয়। আহা সে কত সুখ পাইল! মধু সঞ্চয় আর তাহার কাছে এত ভাল লাগে নাই? তাহার দৈনিক সেই সুখের গান ধরিল। তখন অন্যান্য দিনের মত বাড়ী ফিরিয়া যাইতে একান্তই ইচ্ছা হইতে লাগিল। সে যখন একটা ফুলের ভিতর হইতে বাহির হইতেছিল, এখন সময় দেখিল তাহার বুড়ো আত্মীয় অন্য একটার ভিতর হইতে আসিতেছেন।

বুড়ো বলিলেন "কে জান্‌তো তোমাকে এখানে একা পাওয়া যাবে! সঙ্গীরা কোথা!"

"কি জানি; তাদের বাগানের বাইরে ফেলে এসেছি।"

"কি কোচ্ছে তারা?"

"·····মারামারি ·····" কথাটা কিছু বিরক্তির সহিত হইল।

বুড়ো একটু মিষ্ট মুখ করিয়া বলিল,—

"এমন সুন্দর সকাল বেলায় মৌমাছির আর কাজ কি!"

পথিক এবারে জব্দ হইয়াছেন; বলিলেন "আর হাস্‌বেন না; আমি কি করি, বলে দিন। পুলিন কাকা যে স্বভাব,স্বভাব,সাম্য,সাম্য,করেন,—শুন্‌তে তো বেশ শুনায়। কিন্তু যাই সব ভাই সমান হতে যাবো,অমনি কেমনকরে যেন ঝগড়া বাধিয়ে বসি।"

বুড়ো জিজ্ঞাসা করিল "তোমার বয়েস কত?"

"সাত দিন।"

"আমার বয়েস কি হবে?"

"সে হয়ত ক মাসইবা হয়।

"ঠিক। আমি এক প্রকার বৃদ্ধ হয়েছি। তা-বাপু! এস একবার যুদ্ধ করি।"

"তা কখনই হবে না। আমার গায় বল বেশী, মশাই কষ্ট পাবেন।"

"তোমার চাইতে অত দুর্ব্বল একটা জন্তুর উপদেশ নিতে এসেছ! বড় তাজ্জব দেখ্‌চি যে।"

"আজ্ঞে! আপনার গায় যোর নেই বলে কি আপনার জ্ঞান কম? আপনার জ্ঞান বেশী বলেই আপনার উপদেশ নিতে এসেছি। আমি বড় ন্যাকা হয়েছি, কেমন কেমন বোকা বোকা ঠেক্‌ছে।"

"বুড়ো, ছেলে——বলবান—দুর্ব্বল—চালাক বোকা—সাম্যটা কোনখানটায় বাপু? তা যাক্ এ থেকেই করে নেওয়া যাবে একটা। তা চল আমরা একত্র থাকি।"

"স্বচ্ছন্দে। কিন্তু কোথা গিয়ে থাক্‌বো?"

"আগে বল, মতের মিল না হলে মীমাংসা ক'রবে কে?

"আপনি; আপনি জ্ঞানী।"

"উত্তম! খাবার মধু আন্‌বে কে?"

"আমি আন্‌বো; আমার গায় বল আছে!"

"বেশ কথা; এই দেখ, আমাকে রাণী কর্‌লে আর তুমি কর্ম্মকার হলে! আরে বোকা, সাবেক বাড়ী আর সাবেক রাণীতে কি কাজ চলে না? এই তো দেখ্‌ছো দু জন এক সঙ্গে থাকতে হলেই একজন হুকুম দিচ্ছে আর একজন খাটছে। আপ একটা দল যখন হয় তখন কেমন হবে দেখ দেখি।"

মনের সুখে বুড়োর কথায় সায় দিয়া পথিক

আনন্দে গান গাইতে গাইতে ফুলের দলে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

শেষে সে বলিল "এখন সঙ্গীদের দেখলে হয়।" এই বলিয়া দুজনে মিলিয়া বাগানের বাহিরে কলহকারী সঙ্গীদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিল।

এখনও তাহারা বিবাদ করিতেছিল, কিন্তু আর তেমন উৎসাহ নাই। বুদ্ধির গোলমাল হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বেই অনেকে অন্যান্য দিনের মত মধু বহিয়া বাড়ী যাবে বলিয়া চলিয়া গিয়াছে।

অত্যল্পকাল পরে দেখা গেল যে একদল মৌমাছি আনন্দে বোঁ বোঁ করিতে করিতে দলপতি বৃদ্ধ এবং পথিকের পশ্চাতে গালভরা মোম লইয়া ঘরে ফিরিয়া আসিতেছে।

যেই তাহারা ঘরে যাইবে, অমনি একজন দ্বারপাল তাহাদিগকে বাধা দিয়া বলিল "দাঁড়াও; রাজ পরিবারের একটী মৃত শরীর যাচ্চে।"

বাস্তবিকও তাই। শীঘ্রই একটী মৃত রাণী-মৌমাছি দেখা দিলেন। দুধারে কর্ম্মকার মৌমাছিগণ তাঁহাকে টানিয়া আনিতেছে। তাহারা চাক হইতে তাঁহাকে কোলিয়া মৃত সৎকার করিল।

পথিকের মনে বড় দুঃখ হইয়াছে; সে জিজ্ঞাসা করিল "এ কেমন করে হল? রাণীর তো কিছু হয় নি।"

প্রহরী উত্তর করিল "না না; তবে আজ সকালে হঠাৎ চাকে একটা গোলযোগ হয়েছে। কয়েক জন আতুড়ে চৌকিদার আজ কোথা চলে গেছে। এর মধ্যে একটী ছোট রাণী মৌমাছি ঘর ভেঙ্গে বেরিয়ে পড়েছেন; ঘরটা আরো দু চার দিন বন্ধ থাকা উচিত ছিল। দুজন রাণীতে দেখা হতেই ওঁরা যুদ্ধ কর্ত্তে লাগ্‌লেন। যুদ্ধ করে করে ছেলে রাণী মারা পড়েছেন। এবারে অত শীঘ্র আমরা এক ঝাঁক পাঠিয়ে দিতে পারবো না; তা ওর আর কোন উপায় নাই।"

পথিক ভাবিল "কিন্তু এর তো উপায় হ'ত।" সেই এ সব ক্ষতির কারণ এই কথা মনে করিয়া তাহার ভয়ানক কষ্ট ও অনুতাপ উপস্থিত হইল।

বৃদ্ধ আত্মীয় তাহার গায় একটু ঠেলা দিয়া বলিলেন "দেখেছ রাণীরাও সকলে সমান নয়। রাজা একজনের বেশী একবারে হয় না।" পথিক মৌমাছি মনের দুঃখে বলিল "হাঁ"।—নিয়মেবাধ্যতা সকল সুখের মূল, অনিয়ম এবং অবাধ্যভাতে অনেক অসুখ, ইতর প্রাণীদিগের মধ্যেও এই দৃষ্টান্ত দেখা যায়, তবে মানুষের কি করা উচিত তাহা কি আর শিখাইতে হইবে?

---

## ময়ূর।

ওই যে দেয়ালের উপরে পাখিটী বসিয়া আছেন, উহাঁর সঙ্গে আমার কখনই বনিল না। আমি ছেলে বেলা হইতেই ময়ূরের উপর চটা। এখন অনেক বুঝিয়া, তবে একটু ঠাণ্ডা হইয়াছি বটে, কিন্তু ময়ূরকে ভাল বাসিতে ইচ্ছা করে না। কেমন বিশ্রী ডাক, কি রকম সাপের মত গলা উচু নীচু করে, চলা ফেরা কেমন কদর্য্য, এই সকল দেখিয়াই কার্ত্তিক ঠাকুরের বাহনের উপর আমি চটিয়াছি। দেবতা কার্ত্তিক ঠাকুর যেমন বাবু, তাঁহার বাহনটী ও তেমনি, সুন্দর পোষাক-পরা রাজার ছেলের মত, ডানাগুলি ছড়াইয়া ময়ূর যখন সূর্য্য কিরণে উচু যায়গায় গিয়া বসে, তখন দেখিতে বড়ই চমৎকার। আবার যখন মেঘের সময় ডানাগুলি ছড়াইয়া 'পাকাম' ধরে, তখন ময়ূরকে কেমন দেখায় তাহা যে দেখে নাই, তাহাকে বুঝান যায় না। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়, তবুও ময়ূরকে আমি দেখিতে পারি না। ময়ূর যেন বড় লোকের মত সর্ব্বদাই অহঙ্কারে ডগমগ হইয়া আছে—দেখিবে উচু যায়গা না হইলে তাহার বসা হয় না। খাবার খাইতে নীচু যায়গায় নামেন বটে, কিন্তু উড়িয়া বসিতে হইলে প্রায়ই চালের মটকায় বা কোটা বাড়ীর



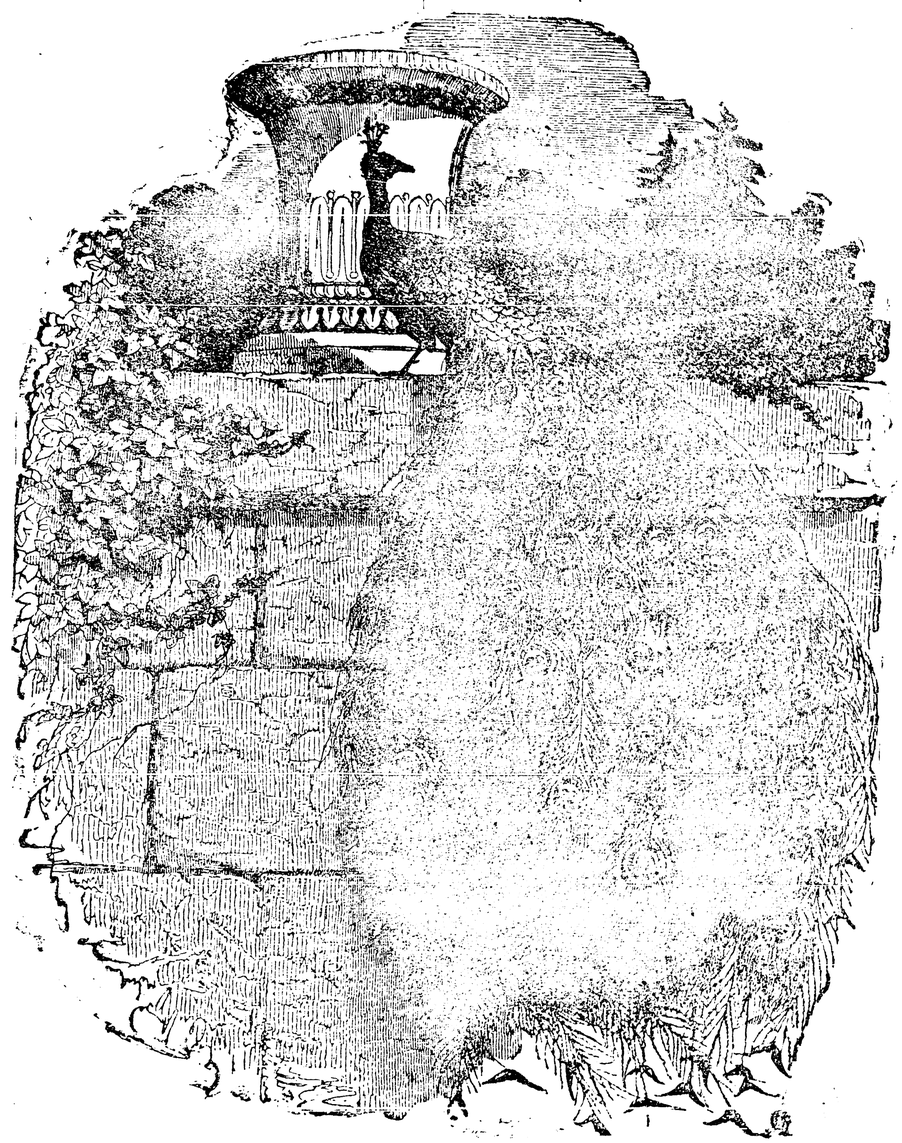

আল্‌সেতে গিয়া বসেন। তা, আবার বসিয়া কতবার গলা বাঁকান হয়, ঝুঁটি নাড়া হয়! উঃ তার ধরণ দেখিলেই গা জ্বালা করে। যাহারা জানে না, তাহারা সুন্দর পাখীটীকে দেখিয়াই মনে করে, না জানি ইহার ডাক কত সুন্দর। ওইয়া! খানিকক্ষণ বাদে পাখী ডাকিয়া উঠিল—ক্যাঁ য়্যাঁ-ক্যাঁ! ছি! ছি! ছি! এমন সুন্দর পাখীর এত খারাপ স্বর?

একবার ভাবি ভাল, ময়ূরের অপরাধ কি? তাহাকে পরমেশ্বর যেমন করিয়াছেন, সে তেমনি আছে,—পরমেশ্বর যাহা করিয়াছেন, তাহার উপর কি বলিব? কিন্তু বালক বালিকাদিগের মধ্যে যে

এইরূপ ময়ূরের দল আছে, সে দোষ কাহার? দেখিতে সুন্দর, পরিষ্কার সাজগোজ, সমস্তই ফিট্‌ফাট অথচ মাকাল ফলের মত এমন ছেলে মেয়ে অনেক আছে যাহাদের চরিত্রের দোষে তাহাদিগকে ভালবাসা যায় না। একটী সুন্দর বালক অথবা সুন্দরী বালিকা নিজের চেহারার অহঙ্কারে হয়ত কাহারও সহিত ভাল করিয়া কথা কন না, কিম্বা একজন বড় লোকের ছেলে বা মেয়ে নিজেদের টাকার অহঙ্কারে দুচোখে পথ দেখেন না, কাহাকেও অনুগ্রহ করিয়া ভাল বাসেন না, আজ যাহার সহিত কথা কহিলেন, বেশ আলাপ করিলেন, কাল তাহাকে পথে দেখিয়া চিনিলেন না, আপনার গরবে আপনি মত্ত হইয়া বিয়াল্লিশ রকম অঙ্গভঙ্গী করিতে করিতে কোটাবাড়ীর উচ্চ আল্‌সে হইতে নীচু দিকে অনুগ্রহ করিয়া এক এক বার তাকাইতে লাগিলেন—অথচ বিদ্যা, গুণপনা কিছুমাত্র নাই, থাকিলেও তাহাতে বিশেষ অধিকার নাই—এমন বালকবালিকাদিগকে ময়ূর বলিব না তো কি বলিব?

পরমেশ্বর যাহাকে রূপ দিয়াছেন, তাহাকে অহঙ্কৃত হইতে বলেন নাই; তিনি যাহাকে ধন দিয়াছেন, তাহাকে বলেন নাই দরিদ্রকে অগ্রাহ্য করিও,—তবে এমন দশা অনেক সময় দেখি কেন? এইরূপ বালক বালিকাদিগকে কেহই ভালবাসে না। ময়ূরের মত কেবল রূপ বা কেবল টাকা থাকিলেই বড় হওয়া যায় না, লোকের ভালবাসা পাওয়া যায় না। বড় হইতে হইলে নত হইতে হয়, সকলকে ভালবাসিতে হয়, গরিব দুঃখীকে দয়া করিতে হয়। আর তাহা না হইয়া, দয়াধর্ম্ম ভুলিয়া যদি কেবল অহঙ্কারে ফুলিয়া থাকি, আশ্রিত গরিব দুঃখীদিগকে কষ্টদিতে কাতর না হই, তবে আমাতে আর মাকালফলে, আমাতে আর ঐ জেঁকো ময়ূরপাখীতে তফাত কি?

---

## ভাই বোনের দোলনা।

পূরবে উঠেছে রবি, ঊষার হিঙ্গুল ছবি,
সুমুখে খেলিছে;
বকুলের তরুকোলে, চারু লতিকার দোলে,
দুজনে দুলিছে।
বকুলের ফুলগুলি, টুপ্‌টাপ্‌ খুলি খুলি,
মাথায় পড়িছে;
হেলি চলি দুইজনে, দুলিছে আপন মনে,
(আর) চাহিয়া রয়েছে।
নিকটেতে রবিকরে, ঝরণার জল ঝরে,
কি শোভা তাহার!
দিশেহারা ভাইবোনে, দুলিতেছে একমনে;
একি চমৎকার!
শিশির মুকুতা-কণা, রোদে ধরি বর্ণ নানা,
গড়ায়ে পড়িছে;
কেহবা জড়ায় দেহ, কপোলে পড়িয়া কেহ,
সোহাগ করিছে।
ক্রমে মৃদু হেলি দুলি, ওই ঊষা গেল চলি;
তবুও দুলিছে!
ক্ষুধা তৃষ্ণা হ'য়ে হারা, জগৎ পাশরে তারা;
তবুও দুলিছে!
হায়রে! কি ছেলে এরা! কেনরে এমন ধারা,
আপনা পাশরি,
প্রখর রবির করে, বিন্দু বিন্দু ঘাম ঝরে,—
তবু দোলা ধরি?
দু'একটী রবিকর, সাহসে করিয়া ভর,
ঘন পাতা ছেড়ে,
ছেলেটীর মেয়েটীর, মুখের উপরে—ধীর,
মৃদু আসি পড়ে।
কি জানি কি ভাবে ভোর, কি লেগেছে ঘুমঘোর
কথাটী না সরে;
ভুলিয়ে জগত-জনে—দোলা ধরি সযতনে,
যায় আর ফেরে।



ওই চলি গেল বেলা, সাঙ্গ নাহি হ'ল খেলা;
হবে কি জীবনে?
ওই যে পড়িল ডুবি, দেখ রে সাঁঝের রবি,
পশ্চিম গগনে!
ছাড়ায়ে অনন্ত কায়া—অর্দ্ধ আলো অর্দ্ধ ছায়া—
গোধূলি আসিছে;
পাখীগুলি কাছে এসে, গান গেয়ে হেসে হেসে,
কত কি ভাষিছে!
হেথা হোথা রাঙ্গারাঙ্গা, মেঘগুলি ভাঙ্গাভাঙ্গা,
বেড়ায় ভাসিয়া।
রাত্রি হ'ল সুগভীর, সাড়া শব্দ পৃথিবীর,
যাইল মিশিয়া।
বালার মুখের পরে, জ্যোছনার থরে, থরে,
কি শোভা ধরিছে!
নিশীথ আকাশে তারা—হইয়ে অবাক্-পারা,
তাহাই হেরিছে।
ক্রমে ফুরাইল রাতি, তারাসহ ইন্দুভাতি,
যাইল নিভিয়া;
রাঙ্গা রবি পুবাকাশে, দেখা দিল পুনঃ হেসে,
মানস মোহিয়া।
তবু একি? না ফুরায়—কি এ খেলা? একি দায়!
হারায়ে চেতনা;
ভুলিয়া ঘরের কথা, ভুলি নিজ পিতামাতা,
ক্ষুধার যাতনা?
হায়রে এ পৃথিবীতে, জীবনের এ দোলাতে,
কত ছেলে মেয়ে,
ভুলে ঘর পরিজন, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, বিচেতন—
দুলিছে পড়িয়ে!
দিন যায় রাতি আসে, নবারুণ পুনঃ হাসে,
চেতনা না হয়;
মায়েরে পাশরি সবে, না জানি কেমন ভাবে,
মাতিছে খেলায়?
যেতে হবে পরলোকে—আরাম মায়ের বুকে;
নাই তাহা মনে!
হেথা এসে ভুলে গিয়ে, কি ছার খেলানা নিয়ে,
আছি রেতে দিনে।
জানি নাক কবে, হায়! জীবনের এদোলায়,
দোলা ফুরাইবে;
জগৎজননী কোলে—লুকাইব 'মা' 'মা' বলে—
হেন দিন কবে!

---

## কে বড় লোক?

একজন ধনীর বাড়ীতে অনেক ভদ্র লোকের নিমন্ত্রণ হইয়াছে, এবং তাঁহাদের ছোট ছেলে মেয়েরাও তাঁহাদের সঙ্গে আসিয়াছে। যাঁহার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ, তিনি পূর্ব্বে অতি সামান্য অবস্থায় ছিলেন, তাঁহার পিতা বড় গরিব ছিলেন। কিন্তু পিতা নিজে কষ্ট করিয়াও ছেলেকে স্কুলে দিয়াছিলেন; ছেলের নিজেরও বেশ চেষ্টা, যত্ন ছিল। তাই সেই ছেলে আজ বড় লোক। ইনি কেবল টাকায় বড় লোক তাহা নহে, ইহাঁর যেমন বুদ্ধি, গরিবের প্রতি দয়াও তেমনি।

যে সকল ছেলে মেয়ে তাহাদের পিতা মাতার সঙ্গে আসিয়াছে, তাহারা সকলে মিলিয়া প্রাণ খুলিয়া গল্প করিতে আরম্ভ করিল। তাহাদের মধ্যে নীরজা নামে একটী ছোট মেয়ে দেখিতে অতি সুন্দর; কিন্তু রূপ থাকিলে কি হয়, সে বড় দেমাকে। এ শিক্ষা সে দাস দাসীর নিকট হইতে পাইয়াছিল, পিতা মাতার নিকট নয়। তাহার পিতা আদালতের জজ তাহা সে জানিত, তাই বলিল "আমি জজের মেয়ে, আমি খুব বড় ঘরের মেয়ে, যারা বড় ঘরে হয় না, তারা কখনও বড় লোক হ'তে পারে না। আমি বড় ঘরে হয়েছি, আমি তাই বড় লোক হব—বড় ঘরের বউ হব, বড় লোকের স্ত্রী হব। যাদের বড় মানুষের ঘরে জন্ম হয় না, তারা হাজার পরিশ্রম করে লেখা পড়া শিখুক, তবুও বড় লোক হতে পারবে না। আর যাদের

নামের শেষে 'শ' আছে, তারা কোন কর্ম্মেরই নয়; এই দেখনা পুঁটীর বাবার নাম গণে'শ' তারা কত দুঃখী, ওপাড়ার জগদী'শ' বাবুরা কত কষ্টে দিন চালায়, হাবোলের কাকা সতী'শ' বাবুর কেরাণী গিরি করেই প্রাণ গেল। এদের কিছু হবে না, কিছু হবে না, কিছু হবে না!" এই বলিয়া সে সুন্দর হাত দুখানি ছড়াইয়া দেখাইল কেমন করিয়া এই 'শ'-যুক্ত লোকদিগকে দূরে রাখিতে হয়। এই কথা শুনিয়া ও এই হাত ঘুরান দেখিয়া সরলার (যে বাড়ীতে নিমন্ত্রণ হইয়াছিল, সেই বাড়ীর কর্ত্তার মেয়ের) বড় রাগ হইল, কারণ তাহার বাবার নাম পরে'শ'; সে বলিল—"আমার বাবা ১০০ টাকার খেলনা কিনে দিতে পারেন, তোমার বাবা কি পারেন?"

সুষমা বলিল—"আমার বাবাও পারেন।" এই মেয়েটীর পিতা একখানি কাগজের সম্পাদক ছিলেন। সুষমা আবার বলিল "আমার বাবা,—তোমার বাবার, ওঁর বাবার সকলের নামেই ইচ্ছা করিলে কাগজে লিখিতে পারেন। মা বলেছেন বাবা কাগজে যা' ইচ্ছা তাই লিখিতে পারেন; সকলে বাবাকে ভয় করে।" এই বলিয়া জাঁক করিতে করিতে বালিকা এমনি ঘাড় বাঁকাইয়া বসিল যেন তিনি রাজার মেয়ে আর কি!

যখন এইরূপ গল্প হইতেছিল, তখন একটী দুঃখীর ছেলে দাঁড়াইয়া এই সকল কথা শুনিতেছিল, সে ছেলেটীর নাম রমেশ। রমেশ বেচারা একপাশে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তার সাধ্য কি এই সকল ভাগ্যবতী বড় লোকদের সঙ্গে কথা বলে; সে তাহাদের সুন্দর পোষাকের দিকে চাহিয়া ভাবিতেছিল 'আহা! আমি যদি এদের মত হ'তাম!' কিন্তু 'শ'-যুক্ত নামের কথা শুনিয়া তাহার মনে বড় দুঃখ হইল। "আমার নামের শেষে ত 'শ' আছে; তবেত আমি কখন বড় লোক কি বড় মানুষ হ'তে পার'ব না"—এই ভাবনায় রমেশ বড়ই কষ্ট পাইতে লাগিল।

এই দিবসের লিখিত ঘটনার পর অনেক বৎসর চলিয়া গেল। পাঠক পাঠিকা! আসুন আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত বালক বালিকারা কে কোথায় গেল, খুঁজিয়া দেখি। ঐ দেখুন নীরজা দরিদ্রের ঘরে বড় ঘরের অহঙ্কার লইয়া গিয়া, শ্বাশুড়ী, ননদিনীর সহিত কি ভয়ানক ঝগড়া বাধাইয়াছে, শরীর শুকাইয়া গিয়াছে, সে হাসি নাই, এবং সে স্ফূর্ত্তি নাই! সুষমা মধ্যবিত্তের ঘরে পড়িয়াছে, সে ঝগড়া করে না বটে, কিন্তু নিজের অদৃষ্টকে নিন্দা করিয়া এবং দুবেলা কাঁদিয়া কাঁদিয়া হাড় সার হইয়াছে। আর সরলা—তাহার কথা কি বলিব ওই যে বিধবা দুটী ছোট ছেলেকে পাশে করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িতেছেন, উহাঁকে চেনেন, উনিই সরলা। সে জাঁক নাই, পরের অধীন হইয়া কতক দুঃখে কতক সুখে দিন কাটাইতেছেন! আর সে গরিবের ছেলে রমেশ কোথায় গেল? ওই যে সুন্দর বাড়ীটী দেখিতেছেন, আসুন উহার মধ্যে যাই। ওই যে পুরুষটী যাঁহার নিকট অনেকে নানারূপ পরামর্শের জন্য আসিয়াছে, এবং যাঁহার হাসিমুখ দেখিয়া আপনাদিগকে সুখী মনে করিতেছে, উহাঁকে চেনেন? কে জানিত যে, যে দুঃখীর ছেলে, একদিন বড় লোকের মেয়েদের সহিত সাহস করিয়া কথা বলিতে পারে নাই, আজ সে বড় লোক হইবে? কিন্তু ফলে তাহাই হইল। ভয়ানক চেষ্টায়, ভয়ানক পরিশ্রমে, নিজের বুদ্ধি বলে রমেশ পৃথিবীতে বড় লোক হইল। বৃথা গল্প যে করে, পোষাকের জাঁক করিয়া, বড় গাড়ী ঘোড়া চড়িয়া বাপের টাকা নষ্ট করিয়া যে বেড়ায় সেই বড় লোক, কি নিজের উন্নতির জন্য যে গরিবের মত থাকিয়াও প্রাণপণে পরিশ্রম করে সেই বড় লোক? কে বড় লোক তাহা আর বলিতে হইবে না। *

* এই প্রাপ্ত প্রবন্ধের স্থানে স্থানে আমরা পরিবর্ত্তন করিয়াছি।

সখা-সম্পাদক।



# হাবা গঙ্গারাম।

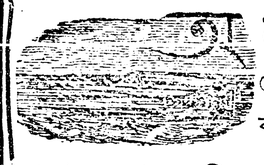

"নেকেই" শুনিয়া থাকিবেন কেহ কোন নির্ব্বোধের কার্য্য করিলে তাহাকে অন্যান্য গালাগালির মধ্যে "হাবাগঙ্গারাম" এবং "বোকা রামমোহন" বলিয়া গালি দেওয়া হইয়া থাকে। গঙ্গারাম কে ছিল, কোথায় তাহার বাড়ী ছিল, তাহা আমরা কিছুই জানি না, তবে তাহার 'হাবা' নাম কেন হইল তাহার কতকগুলি গল্প আমরা শুনিয়াছি, তাহাই আজ পাঠক পাঠিকাদিগকে উপহার দিব। যাঁহাদের অধিক বয়স, তাঁহারা হয়ত এই গল্পের দুই একটী বা সমস্তগুলিই জানেন, কিন্তু আশা করি অল্পবয়স্ক পাঠক পাঠিকাদিগের নিকট ইহার প্রায় সমস্তগুলিই নূতন হইবে। আজ গঙ্গারামের কথা বলিলাম, পরে রামমোহনের কথা বলিব।

১। গঙ্গারাম যে বাড়ীতে চাকর ছিল, সেই বাড়ীর কর্ত্তা একজন বড় পুলিশ-দারগা ছিলেন, সাহেবসুবোর সহিত তাঁহার ভাব ছিল। গঙ্গারাম অনেক দিন ধরিয়া দেখিয়াছিল যে সাহেবরা বাড়ীতে আসিলেই তাহার বাবু মাথায় টুপি দিয়া নিকটে গিয়া সাহেবের হাত ধরিয়া নাড়েন; গঙ্গারামের বিশ্বাস হইল সাহেব বাড়ীতে আসিলেই বুঝি এইরূপ করিতে হয়। একবার বাবু বাড়ীতে গেছেন, কিন্তু গঙ্গারাম বাসায় আছে, এমন সময় এক সাহেব একদিন বাবুর সহিত দেখা করিতে আসিল। গঙ্গারামের বিশ্বাস ছিল সাহেবসুবো বাড়ীতে আসিলে যদি 'দস্তুরমত' ব্যবহার না হয়, তাহা হইলে বাবুর বড় ক্ষতি। এই বিশ্বাস ছিল বলিয়া গঙ্গারাম যখনি দেখিল যে সাহেব আসিতেছে অমনি রান্নাঘরের কাজ রাখিয়া ছুটিয়া আসিল, এবং বাবুর একটা টুপি মাথায় পরিয়া একটা কোট গায়ে জড়াইয়া বাহিরে গিয়াই সাহেবের হাত দুইহাতে ধরিয়া বিলক্ষণ ঝাঁকিয়া দিল। কিছু না বলিয়াও ছাড়িল না। বলিল "ফ্যাট্‌ফুট্ গাইড্—বাবু বাড়ীতে গেছে"!! এই "দস্তুরমত" ব্যবহারে সাহেব অবাক হইয়া বাড়ীতে ফিরিয়া গেল,—একমাস তাহার হাতে বেদনা রহিল। এদিকে রান্নাঘরে আসিয়া গঙ্গারাম বলিতেছে "হ্যাদাদাঠাকুর! বাবুর মান রেখেছি। সাহেবকে এমন আদব কায়দা দেখিয়েছি, যে আর কথা নাই।"

২। একবার একদল ডাকাত ধরিতে গিয়া গঙ্গারামের মনিবকে বড় বিপদে পড়িতে হইয়াছিল। ডাকাতেরা তাঁহাকে একলা পাইয়া এমন প্রহার করিয়াছিল যে বাবুটীর অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত জ্ঞান ছিল না। গঙ্গারাম এতক্ষণ মার না খাইয়াও চীৎপাৎ হইয়া পড়িয়া চক্ষু বুজিয়া গোঁ গোঁ করিতেছিল, বাবু চৈতন্য পাইয়া ডাকিলেন 'গঙ্গারাম'! গঙ্গারাম চক্ষু না খুলিয়াই বলিল "দোহাই বাবা! আমার কেবলার আমি বই কেউ নাই।"—বাবু বিরক্ত হইয়া বলিলেন—"কেন গোঁ গোঁ কর—ডাকাত নাই, চোখ খোল।" গঙ্গারাম কাঁপিতে কাঁপিতে চক্ষু খুলিলে বাবু বলিলেন—"কোথায় কবিরাজ বাড়ী আছে যাও, এক চোঙ্গা ওষুধ তেল নিয়ে এস—বেদনায় প্রাণ গেল।"—সেই ঘরে এক পোয়া ওজনের একটী বাঁশের চোঙ্গা ছিল। গঙ্গারাম সেইটী লইয়া তেল আনিতে গেল। কবিরাজবাড়ী খুঁজিয়া বাহির করিতে গঙ্গারাম যে সকল কাণ্ড করিল, তাহা বলার নয়।—যাক্, কবিরাজবাড়ীতে গিয়াই সে মনিবের জন্য ঔষধ চাহিল। কবিরাজের লোক চোঙ্গা পূরিয়া ঔষধ দিল। পাড়াগেঁয়ে চাষালোকের কেমন দর করা অভ্যাস—গঙ্গারাম বলিল "একটু ফাউ দেবে না?" কবিরাজের লোক বলিল "কোথায় নেবে?" গঙ্গারাম আস্তে চোঙ্গাটী উল্‌টাইয়া ধরিল, বলিল "এইখানে দাও।" কবিরাজ বলিলেন "সব পড়িয়া গেল যে।" গঙ্গারাম দেখিয়াও সে কথা বিশ্বাস করে না, বলিল "অ্যাঃ, আর

যেতে হয় না, ওটুকু খারাপ ; ভালটুকু ভিতরে আছে।" কবিরাজ হাসিয়া অপর দিকের ফাঁপা যায়গাটা ঔষধে পূরিয়া দিলেন। গঙ্গারাম 'বড় জিতিয়াছি' ভাবিয়া মনিবের নিকটে আসিল। মনিব বলিলেন "আর কোথা ? মোটে এইটুকু ?" গঙ্গারাম বলিল "ওদিকে আছে।" মনিব বলিলেন "যা যা ! আর চালাকী করতে হ'বে না।" গঙ্গারাম বলিল "এমনি বোকা পেয়েছেন আর কি ? এই দেখুন।"—এই বলিয়া চোঙ্গাটী উল্‌টিয়া ধরিতে, যেটুকু ছিল তাহাও পড়িয়া গেল। বাবু তাহাই কোন মতে আঙ্গুলে টানিয়া লইয়া মাখিলেন। সে দিন শনিবার ছিল—গঙ্গারাম চিরকাল বিশ্বাস করিত যে তাহার দোষে নয়, কিন্তু শনির দোষে অন্য দিকের তেল উড়িয়া গিয়াছিল।

৩। একবার গঙ্গারাম মনিবের সহিত নৌকায় চড়িয়া কোন দূরস্থানে যাইতেছিল, অনেক জিনিষ—বিছানাপত্রে নৌকা বোঝাই। খানিক দূরে গিয়া একটা বড় নদীতে পড়িয়া নৌকা ঢেউএর বেগে ভয়ানক টলিতে লাগিল। মাঝিরা বলিল "কর্ত্তা ! নৌকা বড় বোঝাই হইয়াছে, তাই এত টলিতেছে।" গঙ্গারাম এতক্ষণ কর্ত্তার পশ্চাতে চুপ করিয়া বসিয়াছিল, ভাবিতেছিল নৌকা ডুবিলে কর্ত্তাকে ধরিয়া বাঁচিবে,—মাঝির এই কথায় তাহার মনে একটা বুদ্ধি হইল। সে বলিল "বাবু ! এক কাজ করলে হয় না ? বোঝাটা একটু কমিয়ে ফেলি !" বাবু বলিলেন "কেমন করে ?" গঙ্গারাম বলিল "ইঃ—এমনি বোকা পেয়েছেন আর কি ? এই দেখুন" ; এই বলিয়া কতকগুলি বিছানা বালিশ, ইত্যাদি এক সঙ্গে বাঁধিয়া মাথায় করিয়া বসিল। বাবু বলিলেন "ও কিহে ?" গঙ্গারাম বলিল "এখন আমার মাথায় বোঝা, নৌকার মাথায় ত আর নয় ? তবেই নৌকা পাত্‌লা হল।" সেই সময় ভাগ্যক্রমে ঢেউ কমিয়া আসিয়াছিল, দেখিয়া গঙ্গারাম বলিল—"দেখুন বাবু—বোঝা কমে গেছে ; কৈ আর তো নৌকা টল্‌ছে না। হাঁ ! কেমন বুদ্ধি খেলেছি।"

৪। গঙ্গারাম একবার দুমাসের ছুটি লইয়া বাড়ী গিয়াছিল। এক বুড়োমা এবং কেবলা নামে একটী ছোটছেলে ভিন্ন গঙ্গারামের আর কেহ নাই। গঙ্গারাম বাড়ীতে আসিয়াই খুব ঘটা করিয়া বড়লোকের মত বেড়াইতে লাগিল; কারণ সে বড় লোকের চাকর। সে প্রাতঃকালে খাইয়াই তাস পাশা খেলে, ছেলেকে আদর করে, এবং পাড়ার দশজনের সঙ্গে নানারূপ গল্প করে,—বৈকালে বেড়ায় ; হাটবারে হাট করিয়া বাড়ীতে আসে। রাত্রিতে বুড়োমাকে সাহেবের গল্প, ডাকাতের গল্প প্রভৃতি নানারূপ গল্প বলে। এইরূপে অনেক দিন যায়, একদিন হাটবারে গঙ্গারাম একটী টাকা লইয়া হাটে লবণ কিনিতে গেল। পথে খানিক দূরে গিয়া দেখিল ৪ ক্রোশ দূরে যে জমীদারের বাড়ীছ… সেখানকার হাতী মাহুতকে পিঠে করিয়া স… লইতে আসিয়াছে ! হাতী দেখিয়াই গঙ্গার… "বড়লোকের চাল"টা বাড়িয়া গেল। সে মাহু… ডাকিল, "ও মাহুত, মাহুত ! আমায় হাতী চড়াবি" মাহুত বলিল "কত দেবে ?" গঙ্গারাম লবণ কি… বার টাকাটী বাহির করিয়া বলিল "একটী টাক… মাহুত বলিল "এস।" গঙ্গারাম বলিল "আমা… কিন্তু সমস্ত গ্রাম ঘূরাইয়া বাড়ীর কাছে পৌঁছাই… দিতে হইবে।" মাহুত তাহাতেই রাজি হইলে… গঙ্গারাম হাতীর পিঠে উঠিল। উঠিয়া গঙ্গারামের বাহার দেখে কে ! হাতীর চলিবার ঝাঁকুনির সঙ্গে সঙ্গে হেলিয়া দুলিয়া গঙ্গারাম "হ্যাইও ! হ্যাইও !" করে, এবং যাহাকে পথে দেখিতে পায়, তাহাকেই বলে "কিহে খবর কি ! বাড়ী যাচ্ছি !" যখন মাহুত গঙ্গারামকে বাড়ীর কাছে নামাইয়া দিল, তখন গঙ্গারামের মা সেখানে ছিলেন না ; ছেলের এমন বাহার মা দেখিলেন না, ইহাতে গঙ্গারামের বড়ই কষ্ট হইল। যাক্‌, কি হবে ? গঙ্গারাম বুক ফুলাইয়া বাড়ীর মধ্যে গিয়া বসিল। মা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কি গঙ্গা ! নুন কোথায় ?" গঙ্গারাম গম্ভীরভাবে বলিল—"আনিনি !" মা বলিলেন "তবে টাকা ?" গঙ্গারাম খানিকক্ষণ মুখ ফুলাইয়া বসিয়া থাকিল, কোন উত্তরই দিল না। পরে বারবার জিজ্ঞাসা করাতে উত্তর করিল "যাও …ও ! যা কোন পুরুষে হয় নাই, তাই হয়ে গেছে …ন টাকায় !" মা বলিলেন "ওমা সেকি ?" গঙ্গা…াম বলিল "হা ! হা ! হা ! বাদশার মত হাতী চড়ে …সেছি ! তার কাছে আর নুন" ?

ছেলেমেয়েদের মধ্যে এমন "হাবাগঙ্গারাম" কেউ আছ ?

---

# কলিকাতার অন্তর্জাতিক প্রদর্শনী।

…সেদিন পাড়াগেঁয়ে দুটী লোক কলিকাতায় আসিয়া গড়ের মাঠে বেড়াইতে গিয়াছিল। তাহারা গিয়া দেখে যাদুঘরের কাছে রাস্তার এপাশ হইতে ওপাশ পর্য্যন্ত একটী পোল প্রস্তুত হইয়াছে, এবং গড়ের মাঠের মধ্যে সুন্দর সুন্দর বাড়ী তোলা হইয়াছে। ইহা দেখিয়া দুই জনে খানিকক্ষণ হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। প্রথম ব্যক্তি বলিল—"…দেখ ! এখানে কি হবে, বল্‌তে পার ?" …বলিল—"কে জানে বাপ ? …



পর্য্যন্ত তিনমাস ধরিয়া গড়ের মাঠে মহা ধুমধামের সহিত এই মেলা বসিবে।

পৃথিবীতে যে কোন দেশে যে কিছু উৎকৃষ্ট দ্রব্য সামগ্রী আছে সমস্তই এই মেলায় আসিয়াছে। এই সকল দ্রব্য সামগ্রী রাখিবার নিমিত্ত আমাদের ছোট লাটসাহেব বাহাদুরের হুকুমে যাদুঘরের দক্ষিণে ও গড়ের মাঠে আজ কয়মাস ধরিয়া গৃহাদি প্রস্তুত হইয়াছে। বিলাত ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশের যত প্রকার কল, শিল্প কর্ম্ম, ও যন্ত্রাদি প্রস্তুত হয়, সমস্ত দ্রব্যই এই মেলায় আনীত হইয়াছে। বঙ্গদেশ ও ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানে যত প্রকার মহামূল্য ও উৎকৃষ্ট দ্রব্য আছে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত কর্ম্মচারীদিগের দ্বারা সে সমুদায়ও যোগাড় করা হইয়াছে। ভারতের গৌরব ও লক্ষ্মীশ্রী দেখিবার নিমিত্ত পৃথিবীর নানা দেশ হইতে লোকের ভিড় হইয়া পড়িতেছে। ভারতবাসীরাও পৃথিবীর পূর্ব্ব ও পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ সকল দেশেরই আনীত চমৎকার দ্রব্য সকল দেখিতে পাইবেন। ইহার ফল এই হইবে যে বিদেশীয় নূতন নূতন শিল্প কর্ম্ম দেখিলে ভারতবাসীরাও সেই সকল শিল্প কর্ম্ম করিতে শিখিবেন, তাহাতে বাণিজ্যের উন্নতি হইবে, ও এই সমস্ত দ্রব্য সস্তা হইয়া আসিবে।

উপরে যে সকল দ্রব্যের কথা লিখিত হইল.

মনোরঞ্জনের নিমিত্ত নানারূপ কৌতুক ও তামাসা দেখান হইবে—যথা গীত, বাদ্য ও ভোজ বাজীর মত অতি আশ্চর্য্য বৈজ্ঞানিক বাজী।

মেলার ভিতর যাইতে হইলে টিকিট কিনিয়া যাইতে হইবে। কি ধনী, কি দরিদ্র, সকলেই বিনা কষ্টে যতবার ইচ্ছা ততবার গিয়া মেলা দেখিতে পাইবেন বলিয়া রবিবারও বুধবার ছাড়া অপর সকল দিনে দশটা হইতে সাড়ে সাতটা পর্য্যন্ত টিকিটের মূল্য চারি আনা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ঐ সকল দিনে সন্ধ্যার পর দেখিতে চাহিলে আট আনা করিয়া দিতে হইবে। যাঁহারা অধিক ভিড়ের ভিতর যাইয়া দেখিতে না ইচ্ছা করেন, তাঁহারা বুধবার দিন এক টাকা মূল্যের টিকিট ক্রয় করিয়া বেশ দেখিতে পারেন।

আমাদের দেশের স্ত্রীলোকেরা যাহাতে নির্জ্জনে ও সম্ভ্রমের সহিত মেলা দেখিতে পান, এ জন্য তাঁহাদিগের নিমিত্ত স্বতন্ত্র দিন নির্দ্দিষ্ট হইবে। সে দিন কেবল স্ত্রীলোকেরাই যাইতে পাইবেন, পুরুষেরা যাইতে পাইবেন না; বোধ হয় বিবিরা সঙ্গে করিয়া দেখাইয়া লইয়া বেড়াইবেন।

এইরূপ আশ্চর্য্য চমৎকার ও মনোহর দ্রব্যাদি

সেই দিন স্বয়ং বড়লাট সাহেব উপস্থিত থাকিবেন। এই সভায় আমাদিগের মহারাণীর পুত্র রাজকুমার ডিউক্ অভ কনাট, ভারতবর্ষের নানা প্রদেশের ছোট লাট সাহেবেরা, এবং অনেক রাজা ও প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ উপস্থিত থাকিবেন। সেই দিন যাঁহারা ভাল যায়গায় পৃথক বসিবেন, তাঁহাদিগকে দশ টাকা মূল্যের টিকিট লইতে হইবে। যাঁহারা সাধারণের সঙ্গে বসিবেন তাঁহাদিগের পাঁচ টাকা লাগিবে।

রবিবার মেলা বন্ধ থাকিবে, বুধবার টিকিটের মূল্য ১৲ এক টাকা। এই দুই দিনছাড়া আর সমস্ত দিন সন্ধ্যা পর্য্যন্ত।০, এবং সন্ধ্যার পর ৷৷০ দিতে হইবে। আমরা আশা করি সকলেই আসিয়া এক একবার এই মহামেলা দেখিয়া যাইবেন।

## বিজ্ঞাপন।

শিশুস্বাস্থ্যরক্ষা, তাজমহল, ঠাকুরদাদার গল্প কে মজা ক'র্‌বে, ধাঁধা প্রভৃতি অনেক বিষয় স্থানাভাবে গেল না।

## বিশেষ বিজ্ঞাপন।

সখার বৎসর শেষ হইল। এইসঙ্গে যে সূচীপত্র